১৯৯০ : সংবাদ শিরোনামে কারা ছিলেন?

আলোকপাত

ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ● মূল্য ৭·০০

অপারেশন বজরং : অসমে শান্তি আনতে পারবে?

স্বামী অভেদানন্দ : প্রেতলোকের পথে

জ্যোতিবসুর জেলখানায়:

কংগ্রেস, নকশাল, ঝাড়খণ্ড ও আনন্দমার্গ রাজবন্দীদের দিনলিপি

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পঞ্চম বর্ষ * দ্বাদশ সংখ্যা * ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: অলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রুদ্রপ্রসাদ ঘোষাল
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরাবাদ: শাহজের খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী ঘোষণ
লন্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান মঞ্জি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
চিত্রশিল্পী/ডিজাইনার: শ্যামল চক্রবর্তী

দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি-১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০, ৩৩১৩৭৪৯, ৩৩১৭৪১৬
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমবাসি সেন্টার
নরীমান পয়েন্ট
বম্বে-৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬, ২৪৪৮৪৭
টেলেক্স: ০১১ ২৩৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি-১০৩, সোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ-২২৬০০১
দূরভাষ: ২৪৮৮৭৮/২৪৬৩০০
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট-৫ এ (পঞ্চতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯৯০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮৯, ৫১০৫২, ৫৫৮২৫, ৫৩৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪-২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ,
এলাহাবাদ-২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে
অলোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট
লিমিটেড, এলাহাবাদ-এর একটি ইউনিট-
মুদ্রণী অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

সরজমিন পৃষ্ঠা-২৬

'অপারেশন বজরং' চালু করে কেন্দ্রিয় সরকার কি অসমে শান্তি আনতে পারবেন? অসমের রাজনৈতিক নেতারা কি বলছেন?

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা-১০

পশ্চিমবঙ্গের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী আজ এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন। একসময়ের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের দৃপ্ত নেতা হয়েও তাঁর সরকারের জেলখানায় রাজবন্দীদের ছড়াছড়ি কেন? কেন তাঁদের পাশাপাশি সাধারণ বন্দী এবং নিরপরাধ বন্দিনীরা এক অমানুষিক পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন? এব্যাপারে বন্দীরা কি বলেন? আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের মতামত সহ কারা-অন্তরালের অত্যাচার এবং প্রশাসনিক অরাজকতার তথ্যসমৃদ্ধ দলিল এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন।

বিশেষ রচনা পৃষ্ঠা-৮৫

১৯৯০-এ যাঁরা ছিলেন সংবাদ শিরোনামে ১৯৯১-এও কি তাঁরা তেমনি সাড়া জাগাবেন? নাকি বছর বদলের হাওয়ায় কমবেশী পরিবর্তিত হবেন তাঁরাও? ফেলে আসা বছরের সেইসব খবর-চরিত্রদের নিয়েই এই বিশেষ রচনা।

দেশ-দশ-বিশ্ব রাজনীতিতে এ বছর শুরু থেকেই উৎকণ্ঠা। ইরাক অধিকৃত কুয়েতকে ঘিরে গত বছরে যে সংকটের শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে তা ক্লাইমেক্স-এ পর্যবসিত। আমেরিকান পররাষ্ট্র–মন্ত্রী জেমস বেকার ও ইরাকী বিদেশমন্ত্রীর আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। 'তেলের খনি' দেশগুলির পক্ষ থেকে ইরাকের এ হেন আচরণ নিতান্তই অমানবিক। সমরাঙ্গণে যুদ্ধাস্ত্রই যদি একমাত্র সমাধান হয় সেক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রজন্ম ইরাককেই দুষবে। যুদ্ধকামী দেশগুলির শুভবুদ্ধির উদয় হোক-এ আশা নিয়েই এবারের কলম লিখতে বসা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য আন্দোলনের শিকার কৃষ্ণকায় সম্প্রদায়। তাদের ওপর কায়েমী শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব নস্যাৎ করতে দীর্ঘ সাতাশটা বছর কারাগারের অন্তরালে কাটাতে হয়েছে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে। বিনা বিচারে আটকে থাকা রাজবন্দীদের এখন মুক্ত করার জন্য বদ্ধ পরিকর নেলসন। এই সেদিন কলকাতার বুকেও বলে গেলেন তেমন কিছু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সংগ্রামের কথা। একই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের দৃপ্ত তারকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও একই সুরে সুর মেলালেন। কিন্তু তাহলে দীর্ঘ বাম-জমানায় পশ্চিমবঙ্গের জেল-খানায় কেন অমানুষিক নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আছেন রাজবন্দী, সাধারণ বন্দী ও নিরপরাধ বন্দিনীরা? আলোকপাত-এর এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে সেজন্যই গ্রথিত হলো সরকারি জেলখানার অভ্যন্তরে অত্যাচার ও প্রশাসনিক অরাজকতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং ও বাম নেতাদের এক রাস্তায় চলার নীতি দেখে শুরুতে অনেকে বিস্ময়াপ্লুত হলেও আজ আর বুঝতে বাকি নেই বাম দলের দূরভিসন্ধি। ভি পি কে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে সি পি এম যেমন সমগ্র উত্তর ভারতের 'সিংহভাগ' স্ব-বাম অঞ্চলগুলিতে আসর জমাতে চাইছে তেমনি ভি পি সিংও সি পি এম এর সঙ্গে গাঁটছড়ায় সর্বভারতীয় স্তরে পুনরায় ফিরে আসতে বদ্ধ পরিকর। সম্ভাব্য পরিণতির দিকে তাকিয়ে সি পি এম-এর এ জাতীয় রুট বদলের প্রেক্ষাপটে এবারে পরিবেশিত হল তথ্যনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণী এক প্রতিবেদন।

গত বছরটি যেমন এই দশকের সংবাদ শিরোনামে নিজের আসনটি পাকা করে নিয়েছে তেমনি দেশ-দশ-বিশ্বের নিরিখেও অনেক 'তারকা' গত বছরের সঙ্গে সঙ্গে এবছরেও 'সংবাদ শিরোনামে' থাকবেন বলে আশা করা যায়। আলোকপাত-এর দূরদর্শী চোখে এবারে ধরা পড়েছে তেমন কিছু মানুষের প্রোফাইল।

ভারত থেকে অসমকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আলফার উদ্যোগ নিয়ে পূর্ব ভারতের সঙ্গে সারা দেশের ঘুম নেই। চন্দ্রশেখর সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে কেন্দ্রিয় সেনা মোতায়েনে যে 'অপারেশন বজরং' চালু করেছেন তা কি অসমে শান্তি আনার অনুকূল? আলোকপাতের সরজমিন রিপোর্টে আলোচিত হল অসম-শান্তির প্রেক্ষাপট।

জন্মমৃত্যুর প্রহেলিকাকে কাটিয়ে ওঠা মানুষের দুঃসাধ্য। মরণের পর এই জীবনের সবটুকুই কি চিরতরে শেষ হয়ে যায়? প্রেতলোকের সাধন নিয়ে তাই অনেকেই এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্রোহী সন্ন্যাসী স্বামী অভেদানন্দ সন্ধান এনেছিলেন 'মরণের পারে'-র অতিলৌকিক জগতের। এবারের রিয়েল লাইফে তাই পরিবেশিত হল প্রেতলোকের পথ সন্ধানী সাধকের কৌতূহলোদ্দীপক জীবন কাহিনী।

বিশ্ব পরিস্থিতির নিরিখেই নয় এদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও রাজনৈতিক গতিবিধির জন্যও ক্যালেন্ডারের পাতায় ফেব্রুয়ারি মাসটির গুরুত্ব অনেক। দেশের রাজনৈতিক 'হাওয়া' বদল ঘটে যাওয়া যেমন অসম্ভব নয়, তেমনি যুদ্ধ শান্তির তুলাদণ্ডে বর্তমান বিশ্বকে পরীক্ষা দিতে হবে। সময়ের পরতে জমে থাকা রহস্যটুকু বেরিয়ে আসবে সময়ের সঙ্গেই। এখন শুধু তারই অপেক্ষা।

আলোক মিত্র

পুলিশ রক্ষক নাকি ভক্ষক

আলোকপাত' ডিসেম্বর '৯০-এর প্রধান প্রতিবেদন 'পুলিশ রক্ষক নাকি ভক্ষক' এই প্রশ্নে আমি বলতে চাই পুলিশ বর্তমানে পুরোপুরি 'ভক্ষক'। তারা সাধারণ মানুষের ডাকে সাহায্য করতে যায় না বললেই চলে। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে চন্দন বসুর হারিয়ে যাওয়া 'অ্যাটাচিকেস', রাজ্যপালের 'রামছাগল' ইত্যাদি ইত্যাদি ঘন্টা কয়েকের মধ্যে হাজির করার নজির ভূরি আছে।

আমি চাঁদা আদায়ের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে গত ৬·১০·৯০ 'আনন্দবাজার' এবং 'মহাকরণে' দুটি পোস্টকার্ড পাঠাই। কিন্তু তাতে তারা রক্ষকের ভূমিকা নেন নি।

এরপর পুলিশকে 'ভক্ষক' বলা কি অন্যায় হবে? - দেবাশিস দত্ত
ঠাকুরপুকুর
কলকাতা

বাংলা ছবির হাল-কালচার

আলোকপাত, নভেম্বর ১৯৯০ সংখ্যায় স্টারডম বিভাগে 'কাহিনী চুরির নেপথ্যে' শীর্ষক বাংলা ছবির অন্ধকার অন্তরালের সংবাদ পড়লাম। এটি খুবই সময়োপযোগী। এই প্রসঙ্গে বাংলা ছবির একজন রুচিশীল দর্শক হিসেবে কিছু বলতে চাই।

এক সময় আমরা বাংলা ছবির সুদিন ফিরে আসছে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল বাংলা ছবির সুদিন বুঝি ফিরে এল। উত্তমকুমার নেই, সুচিত্রা সেন অবসর নিয়েছেন। ইদানিং বাংলা ছবির ফুসফুসের ভিতরে পুরনো ঘা-টি দেখা দিয়েছে। অজীর্ণ রোগীর মত বাংলা ছবির বিষয়বস্তু এখন অম্বল রোগাক্রান্ত। বোম্বাই এর ছবিকে নকল করতে এগিয়ে এসেছে একশ্রেণীর পুঁজিবাদী প্রযোজকরা। তারা বাংলার সুস্থ সংস্কৃতির আঙিনাকে অপসংস্কৃতির দূষণে ভরিয়ে তুলেছেন। ফলে একদিকে বাংলা ছবির ঐতিহ্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে বাংলা ছবি একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। অযথা মারদাঙ্গা বাধিয়ে যুব সমাজকে কলংকিত করছে অশ্লীল ছবির মাধ্যমে। সাম্প্রতিককালের বাংলা ছবি ব্যর্থ বোম্বাইকে নকল করতে গিয়েও অবনতির দিকে এগোচ্ছে।

- মানব বিশ্বাস
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

মন্দির মসজিদ বিতর্কের অবসান হোক

রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে টাল মাটাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। লড়াইয়ের ময়দানে যে যার শক্তি প্রদর্শনে এতটুকু কার্পণ্য বা ত্রুটি করেন নি বা করছেন না। প্রতিটি রাজনৈতিক দল যে যার নিজেদের দিকটি ঠিক রেখে যার যার বক্তব্য, ব্যাখ্যা, আলোচনা ও সমালোচনা করে চলেছেন পরিস্থিতির। মুসলিম ভাইদের অনুরোধ জানাই, গোটা ভারতে তো কম মসজিদ নেই। আপনারা সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করুন না। একটা সামান্য মসজিদকে প্রেস্টিজ ইস্যু করে অহেতুক অশান্তি জিইয়ে রেখে লাভ কি? আপনারা এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করে ইসলাম ধর্মের অর্থ ও ঐতিহ্য যে 'শান্তি' তার মর্যাদা রক্ষা করুন। এদেশের মুসলিমরা যে শান্তি, শৃংখলা উন্নতি ও প্রগতির পক্ষে এটা প্রমাণ করে সামান্য বাবরি মসজিদ ইস্যুকে আঁকড়ে ধরে না রেখে সমস্যার সত্যিকারের সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠুন। ভারতে যাতে সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা হয় সে বিষয়েই আমাদের হিন্দু মুসলিম দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেককেই সচেতন ও সক্রিয় হওয়া দরকার।

—নকুলচন্দ্র দাস
বিরাটী
কলকাতা-৫১

অযোধ্যা কাণ্ডের আসল রামায়ণ

আলোকপাত ডিসেম্বর সংখ্যায় 'অযোধ্যা কাণ্ডে আসল রামায়ণ কি?' শিরোনামের রচনাটি অনেকটাই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখেছেন প্রতিবেদক।

এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিবেদক সত্যাসত্য যাচাই করার কথাও ভুলে গিয়ে কল্পনাবিলাসী হয়ে প্রতিবেদন পেশ করেছেন। এক জায়গায় প্রতিবেদক লিখেছেন, 'এই যুবা সন্তানদের লোভ দেখানো হয় এদেশে হিন্দুরাষ্ট্র হলে তাদের চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে। বেকারদের পলিটিক্যাল পেনশান দেবার ব্যবস্থা করা হবে···। এই বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্য—বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ থেকে এসেছিল। এর মধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, আর এস এস, শিবসেনা ও বজরং দলের সদস্যরা ছিলেন।'

প্রতিবেদক হয়তো জানেন না যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও কয়েক হাজার করসেবক অযোধ্যায় গেছিল। তাই যা খুশি লিখলে চলবে এই ভেবে তিনি এতদূর পর্যন্ত লিখলেন যে বেকারদের চাকুরি ও পলিটিক্যাল পেনশান দেওয়ার লোভ দেখানো হয়েছে।

একটু খবর নিলেই আপনারা পার্শ্ববর্তী কাউকে পেয়ে যাবেন যিনি অযোধ্যায় করসেবায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, কিসের জন্য তাঁরা ছুটে গিয়েছিলেন এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও? এবং প্রতিবেদক হয়তো এটাও জানেন না যে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস-এ যোগ দিলে কেবল দিতেই হয় পাওয়ার প্রশ্ন সেখানে নেই।

সুহৃদ মিত্র
কলকাতা-৫৪

মহামিলনের বাণী আর কতদিন

'আলোকপাত' ডিসেম্বর '৯০ সংখ্যায় অযোধ্যা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবং রোহন কুদ্দুস ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত দুটি চিঠি যথাক্রমে 'সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে' এবং 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান' পড়লাম। প্রগতিশীল হতে হলে হিন্দু বিরোধী হতে হবে, হিন্দু ধর্মকে অস্বীকার বা হেয় জ্ঞান করতে হবে বলে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একাংশের এক বদ্ধমূল ধারণা আছে। অযোধ্যা নিয়ে প্রতিবেদনটি পড়লে অনেকের মনেই লেখক সম্বন্ধে এই ধারণার সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করি।

রোহন কুদ্দুস তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—'ভারতবর্ষের ঐতিহ্য—নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।' গানটি লিখেছেন সম্ভবতঃ কবি অতুলপ্রসাদ সেন দেশ বিভাগের বহু পূর্বে। ভারতবর্ষ বলতে তখন এবং দেশ বিভাগের পূর্বে চিরকালই অখণ্ড ভারতবর্ষই বোঝাত। অর্থাৎ পাকিস্তান ও বাংলাদেশও সেই ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং এমন কি এই খণ্ডিত হতশ্রী ভারতবর্ষের কাশ্মীরেও কি হিন্দু মুসলমানের 'মহান মিলন' ঘটেছে এবং 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' ফুটেছে কি! যে সব স্থান থেকে হিন্দু মন্দির ধ্বংসে। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রতিদিনই হিন্দু নিহত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবীরা নির্বিকার। তাঁরা মাঝে মাঝে মহা মিলনের বাণী শোনাচ্ছেন। এই মহামিলনের বাণী এই পাক ভারত উপমহাদেশে শুধু হিন্দুদেরই শোনান হচ্ছে এবং হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকছে। যে অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাচ্ছে সে অঞ্চলে আর এই মহামিলনের বাণী শোনান যাচ্ছে না। যেভাবে হিন্দুর সংখ্যার হার দ্রুত কমছে এবং মুসলমানদের বাড়ছে তাতে পঞ্চাশ বা একশত বছর পর মহামিলনের বাণী আর শোনান যাবে না। আসলে ধর্ম বা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ করে মহামিলনের গাছটির গোড়াটাই যে কেটে দেওয়া হয়েছে। তাই নয় কি?

- নিশিকান্ত মজুমদার
কলকাতা-৭৫

জুয়া-পর্ব

'আলোকপাত'—এর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এর প্রতিটি প্রতিবেদন আমাকে টানে। ভালো লাগে বাস্তবধর্মী লেখাগুলির বাস্তবতা উপলব্ধি করে। আমি ইদানিং কালের একটি বিশেষ সমস্যার কথা, আলোকপাতের মাধ্যমে আলোকপাতের হাজারো পাঠক ও শুভানুধ্যায়িদের জানাতে চাই।

কাজের প্রয়োজনে আমাকে ট্রেনেই যাতায়াত করতে হয়, যেমন লক্ষ লক্ষ যাত্রীরা করে থাকেন। সকলেরই নজরে আসবে ট্রেনের মধ্যে নিত্যযাত্রীরা কেউ কেউ তাস খেলছেন। প্রতিটি কমপার্টমেন্টেই এই চেহারা দেখা যাবে। নিতান্ত সময় কাটানোর অজুহাতে কিছু মানুষ তাসের মাধ্যমে জুয়া খেলেন। কিছু কিছু ভ্যাণ্ডারদের মধ্যে এই প্রবণতা ইদানিং বেশি দেখা যাচ্ছে। কিছু ফুলওয়ালা মেছেদা, কোলাঘাট, দেউলটি প্রভৃতি স্টেশন থেকে চড়ে হাওড়া পর্যন্ত জুয়া খেলতে খেলতে যায়। এমনকি অন্যকেও তারা উৎসাহিত করে জুয়া খেলতে। অথচ এ বিষয়ে কারো কোনো প্রতিবাদ নেই। ঘর থেকে কাজের প্রয়োজনে বেরিয়ে গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই কেউ কেউ সামান্য হাত খরচটুকুও হারিয়ে হাওড়া স্টেশনের বাইরে আসেন। জীবনশুরুর মত এই দিনশুরুর সূচনায় জুয়া-পর্ব কি প্রশাসন বা সৎ জনসাধারণ বন্ধ করতে পারেন না?

-জয়দেব চক্রবর্তী। কোলাঘাট
মেদিনীপুর

তাঁর বক্তৃতা শুনতে। এভাবেই একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হল জগৎ বিখ্যাত আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টমাস এ এডিসনের।

এখানে টমাস আলভা এডিসনের (১৮৪৭-১৯৩১) কথাটি একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক এগার শ'-এর বেশি জিনিস আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে ফোনোগ্রাম বা গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন ১৮৭৭ সালে, বৈদ্যুতিক আলো, বিশেষ করে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কার করেন ১৮৭৯ সালে, স্টেনসিল ডুপ্লিকেটিং যন্ত্র আবিষ্কার করেন ১৮৮৭ সালে এবং সিনেমা প্রজেক্টর আবিষ্কার করেন ১৮৮৯ সালে। এরকম বিভিন্ন আবিষ্কারের ফলে এই ঐশ্বরিক প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক সে যুগের আমেরিকায় বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী-মনীষী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজি লিখিত 'মন ও মানুষ' গ্রন্থে (প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৭২) স্বামী অভেদানন্দজী কথিত টমাস এ এডিসন প্রসঙ্গটি আছে। অভেদানন্দজী বলছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমনকে: 'আমি আমেরিকায় থাকতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস এডিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। একবার নয়—দু'বার।… দেখলাম তিনি ধ্যানমগ্ন যোগীর মতই সর্বদা আত্মসমাহিত হয়ে আছেন। খাওয়ার ও স্নান করার এতটুকু সময় নেই, সর্বদাই আত্মসমাহিত।…তিনি আমাকে দেখে একটু মাথা নিচু করে নমস্কার জানালেন। আমি আমার পরিচয় দিতে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন: 'ওঃ, ইউ আর কামিং ফ্রম ইণ্ডিয়া?' আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক শুনতে পেলেন কিনা জানি না, কারণ তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন।…আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হল লিখে।…সেদিন 'বেদান্ত' সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হল। সবই কিন্তু লিখে। তিনি উদগ্রীব হয়ে আরও একদিন অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। পরে লিখে জানালেন যে, 'বেদান্ত' সম্বন্ধে আরও কিছু তিনি জানতে চান।'

স্বামী অভেদানন্দজী বললেন, 'আর একদিন আমি শ্রদ্ধেয় এডিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।…তিনি বেদান্তের অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শকে অন্তরের সঙ্গে স্বাগত জানালেন। পরিশেষে তাঁর উদ্ভাবিত একটি গ্রামোফোন যন্ত্র তিনি আমাকে উপহার দিলেন।…আমি ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতে ফেরার সময়ে গ্রামোফোন যন্ত্রটিকে সঙ্গে নিয়ে আসি।…টমাস এডিসনের দানরূপে এখনও আমার কাছে ওই গ্রামোফোন যন্ত্রটি রক্ষিত আছে।'

এই প্রতিবেদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর কৃপায় ১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সেই ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নটি দর্শন করে ধন্য হয়েছেন। এটি আমাদের জাতীয় গৌরব।

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য

উত্তরসুরী হিসেবে তিনি যে আমেরিকার হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেটা টমাস এ এডিসনের মত বিখ্যাত মানুষের প্রেম ও প্রীতির নিদর্শনেই প্রমাণিত।

এখানে আরেকটি ঘটনাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বুকে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিলেন এবং সেই ঝড়ের দোলায় যখন গোটা মার্কিন দেশ আন্দোলিত, ঠিক তখনই সে দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। অভেদানন্দজী যখন ওয়াশিংটনে, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবার দেখা করার বাসনা হয় তাঁর।

সেই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন উইলিয়াম ম্যাককিনলি। তিনি ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। তিনি যখন ওহিও প্রদেশের গভর্নর ছিলেন, তখন বেকারদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবেই তিনি প্রেসিডেন্ট হন। কিউবা সেইসময় স্পেনীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্পেন সেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য হিংস্র হয়ে ওঠে, তখন প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলির অনুরোধে মার্কিন কংগ্রেস স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে আমেরিকা জয়লাভ করে এবং কিউবা চলে আসে মার্কিন সামরিক শাসনের অধীনে। ১৯০০ সালে এই গৌরবটীকা মাথায় নিয়ে ম্যাককিনলি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে, ১৯০১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।

অভেদানন্দজী যাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নেপথ্য থেকে সেই ব্যবস্থাও করেদিলেন। অভেদানন্দজীর খুবই পরিচিত ছিলেন মার্কিন আইন সভার সদস্য মিঃ আর্গিস। মিঃ আর্গিসের উদ্যোগেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সব ব্যবস্থা হল।

এখানে দু'টি ঘটনা স্মরণীয়। প্রথমত, স্বামী অভেদানন্দজীর আগে অন্য কোন ভারতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, সে যুগে একজন নিঃসম্বল ভারতীয় সন্ন্যাসীর পক্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দেখা পাওয়াটাও ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু সেই অসম্ভবই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল। দিনটা ছিল ১৮৯৮ সালের ১৯ মে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন স্পেন ও কিউবা নিয়ে দারুণ বিব্রত। স্বামী অভেদানন্দ যখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে গেলেন তখন তিনি ওই যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই দারুণ ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি পরম সমাদরে ভারতীয় সন্ন্যাসীকে বরণ করে নিলেন। প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের আলোচনাকে বন্ধ রেখে আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলন এবং ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। তিনি বেদান্ত আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। (আমার জীবনকথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২)।

(দুই)

আমেরিকায় যিনি এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন, তিনি কেন শেষ পর্যন্ত প্রেততত্ত্ব নিয়ে এতটা আত্মময় হলেন? সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে একবার তাঁর পুণ্য জীবনকথা স্মরণ করা যাক।

স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র। তাঁর পিতা রসিকলাল 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' স্কুলের নামকরা ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। তিনি উত্তর কলকাতার ২১ নম্বর নিমু গোস্বামী লেনে বাস করতেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লোকান্তরিতা হওয়ায় তিনি নয়নতারা দেবীকে বিয়ে করেন এবং এই নয়নতারা দেবী ব্যাকুল হয়ে মা কালীর কাছে একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন। তবে কি মা কালীই তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন?

১৮৬৬ সালের ২ অক্টোবর মা কালীর আশীর্বাদে নয়নতারা যে পুত্রসন্তান লাভ করেন, তাঁর নাম হল কালীপ্রসাদ। পরবর্তীকালে তিনি 'কালী তপস্বী' নামেও পরিচিত হয়েছেন।

১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে একদিন যুবক কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের টানে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন: আপনি আমায় যোগশিক্ষা দেবেন কি? উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ

বলেছিলেন : তোমার এই অল্প বয়সেই যোগশিক্ষার ইচ্ছা হয়েছে। এ অতি ভালো লক্ষণ। তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে, কিন্তু তোমার একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম। আমি তোমায় যোগ শিক্ষা দেব।'

সেই শুরু। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় কালীপ্রসাদ গ্রহণ করলেন অন্যতম প্রধান পার্ষদের ভূমিকা। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তারই সন্ন্যাসী সন্তানরূপে বৃহত্তর কর্তব্যের ডাকে তিনি দেশে এবং বিদেশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর নেতা এবং পথ প্রদর্শক। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব-বিজয় করে যখন লন্ডনে অবস্থান করছিলেন সে সময় তিনি মূলত বেদান্ত প্রচারের জন্য স্বামী অভেদানন্দকে লন্ডনে ডেকে পাঠান। সেটা ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাস। তাই লন্ডনেই শুরু হয় তাঁর বেদান্ত প্রচারের কাজ। ১৮৯৭ সালের ৩১ জুলাই তিনি লন্ডন থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন জাহাজে। সে বছর ২৯ অক্টোবর তিনি নিউইয়র্কে যে প্রথম বক্তৃতা করেন, তাতেই আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করে নেন তিনি।

তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার ফলে তিনি আমেরিকার অনেক কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক, চিত্রকর প্রমুখের শ্রদ্ধাভাজন ও আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর পরিচয় ছিল, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাতা। ওই সময় স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে গোটা আমেরিকা ছিল মুখরিত।

১৮৯৮ সালের শেষ দিকে তিনি আমেরিকায় বিভিন্ন শ্রোতার আগ্রহে 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেইজন্য জনৈক শ্রোতা ওই বক্তৃতাগুলি নিজের ব্যয়ে ছেপে ২০০০ কপি বই স্বামী অভেদানন্দকে উপহার দেন।

১৮৯৯ সালে নিউইয়র্কের 'লিলি ডেলে' এক আধ্যাত্মিক সম্মেলনে স্বামী অভেদানন্দকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি 'হিন্দুধর্ম ও পুনর্জন্মবাদ' সম্পর্কে এক সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। ওই সভায় টিকিট কেটে বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন প্রায় সাত হাজার শ্রোতা। এদের মধ্যে অনেক প্রেততত্ত্ববিদ ছিলেন, ছিলেন অনেক মিডিয়াম। মিডিয়াম মানে যাঁরা প্লানচেট বা অন্য পদ্ধতিতে বিদেহী প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

আমেরিকায় সে সময় প্রেততত্ত্ব নিয়ে চর্চা এবং গবেষণা খুব হত। একদিন প্রেতাত্মা নামাবার এক উপবেশনে (সিটিং) স্বামী অভেদানন্দ গেছেন, সেখানে গিয়ে দেখেন, একটা টাইপরাইটারে আপনা আপনি টাইপ রাইটিং হয়ে যাচ্ছে। উপস্থিত অনেকেই সেখানে তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের নাম দিচ্ছেন। তাই দেখে স্বামী অভেদানন্দও তার গুরুভাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্য পরলোকগত স্বামী যোগানন্দের নাম দিলেন। একটু

এডিসন প্রদত্ত গ্রামোফোন

পরেই নীল পেন্সিলে লেখা স্বামী যোগানন্দের (যোগেন মহারাজ) নাম দেখা গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্বামী যোগানন্দ ১৮৯৯ সালের ২৮ মার্চ বিকেল তিনটে দশ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। আর নীল পেন্সিলে তার নাম লেখাটা স্বামী অভেদানন্দ দেখেছিলেন ১৮৯৯ সালের ৪ আগস্ট।

এই ঘটনার পরদিনই তিনি সে যুগের বিখ্যাত মিডিয়াম মিঃ কিলারের নেমতন্ন রক্ষা করতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মিঃ কিলার ছিলেন প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ সাধনে স্লেট লিখনে দক্ষ। সেখানে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর স্বামী অভেদানন্দ এবং মিঃ কিলার স্লেট দু'টিকে জোড়া করে ধরে বসেছিলেন। দু'জন দু'দিকে স্লেট দু'টি ধরে বসে আছেন। কিছুক্ষণ সময় পার হতে না হতেই তাঁরা যেন হাতে বৈদ্যুতিক শক্ খেলেন। তারপরই শুনলেন, স্লেটের ভিতর থেকে পেন্সিলের খসখসানি শব্দ—যেন কেউ স্লেটে পেন্সিল দিয়ে লিখছেন।

একটু পরে সেই আওয়াজ থেমে গেল। স্লেট দু'টি জোড়া ছিল, খুলতেই দেখা গেল, স্লেটে সংস্কৃত, গ্রীক, ইংরেজি ও বাংলায় লেখা। মিঃ কিলার তো দেখে অবাক। এ সব ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরেজি ছাড়া আর কোনটাই তিনি জানেন না। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'লিলি ডেলে' এক আমি ছাড়া কেউ সংস্কৃত কি বাংলা লেখা বা পড়ার লোক ছিল না। হাতের লেখাটি আমার বন্ধু যোগেনের লেখার মত দেখে আমিও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

স্বামী অভেদানন্দ এরকম প্রেতাত্মা আনার এক বৈঠকে যোগেন মহারাজকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন। বিদেহী স্বামী যোগানন্দ নাকি তাতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তবে অভেদানন্দজী লিখেছেন, 'তবে লিলি ডেলের মিসেস মসের এক উপবেশনে (সিটিং) আমি ৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রিটের বলরাম বসুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। জীবিত অবস্থার মতই তিনি ঠিক তাঁর সাদা পাগড়িটি পরেছিলেন। তবে তাঁর পাগড়িটি আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে ছোট ছোট ইলেকট্রিক বাল্‌ব জ্বলছে। শ্মশ্রুগুম্ফিত গম্ভীর বদন আর জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আমার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। তিনি অবশ্য কোন কথা বলেন নি, তবে মাথা নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমার মাথার উপর ডান হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। মিডিয়াম মিসেস মসকে দেখেছিলাম তখন দোলক চেয়ারে বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় বসে থাকতে। বলরামবাবু আমায় আশীর্বাদ করার পর কুয়াশার মত মিলিয়ে গেলেন।

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মরণের পারে' গ্রন্থে বলেছেন (পৃঃ ১৫০) 'আমেরিকায় আমি অশরীরি আত্মার অদৃশ্য হস্তে আমার সামনে মূর্তি অংকনও দেখেছি।'

অশরীরি আত্মার 'মূর্তি অংকন' প্রসঙ্গে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ পরিহাস করে একটা গল্প বলতেন। সম্ভবত তিনি এইসব প্রেতাত্মা বা প্লানচেট তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক স্তরে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। সেই গল্পটি হচ্ছে এইরকম: এক ভদ্রলোক তার মায়ের একটা ছবি আঁকার জন্য জনৈক শিল্পীর দ্বারস্থ হলেন। অথচ তার মায়ের কোন ছবি তার কাছে ছিল না। তাহলে উপায়? শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, একজন প্লানচেটওয়ালার সাহায্য নিয়ে তার মাকে দর্শন করা হবে। তারপর সেই অশরীরি মূর্তি দেখে শিল্পী ছবিটি আঁকলেন। যথাসময়ে প্লানচেটের মাধ্যমে এক নারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। সেই মাতৃমূর্তির দিকে তাকিয়ে পুত্র সবিস্ময়ে বলে উঠল: 'মা-গো মৃত্যুর পর তুমি পুরোপুরি বদলে গেছ।' অর্থাৎ যে নারী মূর্তিটিকে সেখানে প্রেতাত্মা সাজিয়ে আনা হয়েছিল, তার সঙ্গে ওই পুত্রের মৃত মাতার কিছুমাত্র মিল ছিল না।

সে যা-ই হোক, এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হলেও স্বামী অভেদানন্দ প্রেততত্ত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই 'মরণের পারে' গ্রন্থের সম্পাদক বলেছেন: 'আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছ থেকে শুনেছি যে, শ্রী শ্রী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ (লাটু মহারাজ), নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা বিদেহী অবস্থায় স্বামী অভেদানন্দকে দেখা দিয়েছেন ঠিক তাঁদের মৃত্যুর পরক্ষণেই। আশ্চর্য এই যে, দেখা দেবার পরে ভারতবর্ষ থেকে তিনি তাঁদের দেহত্যাগের দুঃসংবাদও কেবল তার প্রায়ে পেয়েছেন।'

'মরণের পারে' গ্রন্থের সম্পাদক আরও সংযোজন করেছেন (পৃ। ১৫০): স্বামী অভেদানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, একবার আমেরিকায় থাকাকালে একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি দেখলেন, কেবল একটা মুখ শূন্যে ভাসছে—মুখে দুঃখ-কষ্ট মাখানো—মলিন, একটা কাতর শব্দ এল—'আমায় সাহায্য করো, আমায় সাহায্য করো। আমি বড়

আপনার আদরযত্নের
সঙ্গে সঙ্গে ওকে দিন
কমপ্লান !
Complan
বাচ্চার সুস্থসবল থাকা খুবই দরকার, বিশেষ করে লেখাপড়া
শেখার সময়। কমপ্লানে ২০% প্রোটিন আছে – যা ওদের
সেরা দুধের প্রোটিন যোগায়।
এছাড়া আছে, ২২ রকমের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ –
যেমন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, রকমারি ভিটামিন আর
খনিজ পদার্থ – বাড়তি পুষ্টির জন্যে এসবই ওদের দরকার।
আপনার বাচ্চাদেরও কমপ্লান খাওয়াতে শুরু করুন –
দিনে দুবার প্রতিদিন।
Complan
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
কমপ্লান®
সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার।

কষ্ট পাচ্ছি! আমি আত্মহত্যা করেছি।' স্বামী অভেদানন্দ তাকে আশীর্বাদ করলেন এই বলে, যদি তুমি মনে করো যে আমার আশীর্বাদ ও সদিচ্ছায় তোমার কল্যাণ হবে, তবে আমি এই প্রার্থনা করছি, 'তুমি শান্তি লাভ করো'। সত্যই প্রেতাত্মার মুখ তখন হঠাৎ যেন আলোকিত হয়ে উঠল, সে শান্তির ভাব নিয়ে বাতাসে মিশে গেল।

আরেকবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন নাবিক সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছিল। তার আত্মাও স্বামী অভেদানন্দের সামনে এসে অন্ধকারের মধ্যে যেন হাতড়াচ্ছিল। অভেদানন্দজী জানতে চাইলেন, তোমার কি হয়েছে? প্রেতাত্মা বলল, 'আমি ঠিক জানি না, তবে আমি সমুদ্রে ডুবে মরেছি। আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমি শান্তি চাই। তিনি তাকে আশীর্বাদ করলেন। সেও হাসিমুখে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এরকম অনেক অভিজ্ঞতার কথা স্বামী অভেদানন্দজী শুনিয়েছেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও দেখি, একবার এক বাগানে তাঁর পবিত্র উপস্থিতি কিছু প্রেতাত্মার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণ ভারতে পরিব্রাজক, সে সময় কয়েকটি অতৃপ্ত প্রেতাত্মার ফিসফিসানি তিনি শুনেছিলেন এবং সেই প্রেতাত্মাদের জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ প্রেতাত্মা সংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁদের মুখে তেমন বিশেষ কিছু শোনা যায় নি।

অন্যদিকে দেখি, স্বামী অভেদানন্দজী বিদেশে এবং দেশে এ ব্যাপারে অনেক বক্তৃতা করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর লেখা 'মরণের পারে' বইটি এবং এই বইয়ের মূল ইংরেজি গ্রন্থটি এই বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বিশেষ করে মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায় কিভাবে থাকে, কোথায় হারিয়ে যায় প্রিয় আত্ম-পরিজন, এসব বিষয়ে মানুষের অদম্য আগ্রহ অনন্তকালের, অথচ এ প্রসঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বা প্রমাণ সাধারণ মানুষ পান না। সেদিক থেকে স্বামী অভেদানন্দজীর মূল ইংরেজি বইটি সাধারণ মানুষকে এক অদৃশ্য এবং রহস্যাবৃত জগতের সন্ধান দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে এই বইটিকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে কয়েকটি অনিবার্য প্রশ্ন। শুধু আজ নয়, বহুদিন ধরেই এই প্রশ্নগুলি উচ্চারিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হচ্ছে: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনে এভাবে ভূত-প্রেতের তত্ত্ব আমদানি করাটা কি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ সম্পর্কে আগ্রহ ছিল বলেই কি এ ব্যাপারে নজর দেওয়াটা ঠিক হয়েছে? তাছাড়া ভূত-প্রেত প্রসঙ্গগুলি কি আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নয়?

এই প্রসঙ্গের উল্লেখ পাই 'মরণের পারে' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। বাংলা অনুবাদের সেই ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'সত্যকারের কথা যে,

'মরণের পারে' গ্রন্থে প্রেতাত্মা এবং মিডিয়াম

প্রেততত্ত্বের আলোচনায় রহস্যময় মরণরাজ্যের কোন কোন তথ্যের সন্ধান হয়ত আমরা করতে পারি, কিন্তু তাই দিয়ে অধ্যাত্ম রাজ্যের কোন রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে না।…ইংরাজি 'লাইফ বিয়ণ্ড ডেথ' বা বাংলা 'মরণের পারে' গ্রন্থটির আলোচনায় ইহজীবনের পরেও আত্মার তথা জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং সেই সেই আত্মার নিরাবরণ সত্যকারের রূপ যে সর্ববন্ধনহীন স্বয়ং জ্যোতিষ্মান পরম চৈতন্য, এটাই তিনি (স্বামী অভেদানন্দ) প্রমাণ করতে চেয়েছেন আর তারই জন্য বস্তুতন্ত্রবাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা মরণের পারে নিজেদের সত্তা অস্বীকার করেন ও আত্মাকে বলেন জড়বস্তুর পরিণতি, তাদের মতবাদকেই তিনি বিশেষভাবে খণ্ডন করেছেন শাস্ত্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারের অবতারণা করে।'

কিন্তু তাই বলে কতকগুলি ভুতুড়ে আলোকচিত্র সংযোজন করাটা কি সঠিক হয়েছে? এটা কি অত্যন্ত দীন কৌশলে মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস নয়? অথবা বলা যায়, ভুতুড়ে বিদ্যা প্রচারের একটা নিন্দনীয় উদ্যোগ। এরকম কিছু প্রশ্ন ইদানিং উত্থাপন করেছেন কিছু 'যুক্তিবাদী' বন্ধু।

এইসব প্রশ্নের উত্তরও বাংলা 'মরণের পারে' গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে। হয়ত একই প্রশ্ন আগেও উত্থাপিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হওয়ার অর্থই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশ্নগুলি উচ্চারিত হয়েছিল।

প্রকাশকের বক্তব্য হল: প্রেতাত্মাদের আলোকচিত্রের সন্নিবেশ নিয়ে কিছু কিছু মতবিরোধ কোন কোন দিক থেকে দেখা গেছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য জানানো কর্তব্য যে, ভৌতিক সাহিত্য ও ভুতুড়ে বিদ্যা প্রচার করার কোনদিনই আমরা পক্ষপাতী নই। বরং সর্বতোভাবে বিরোধীই। তবে সত্য ঘটনা এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ ও তথ্য যা, তার বিলোপ সাধন করার বা প্রকাশবিরোধী হওয়ার আমরা পক্ষপাতী নই। সকল সময়েই অসংলগ্ন ভুতুড়েবিদ্যা প্রচারের একান্ত বিরোধী ছিলেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজে…।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা–৬) থেকে প্রকাশিত 'মরণের পারে' গ্রন্থে মোট চারটি আর্ট প্লেটে গোটা আটেক বিদেহী আত্মা বা তাদের কীর্তির ছবি ছাপা হয়েছে। এগুলি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মনে এক রহস্য ও রোমাঞ্চের ভাব সৃষ্টি করে মানুষকে পৌঁছে দেয় এক অজানা জগতের দরজায়। কিন্তু কোন কোন মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই ছবিগুলি কি বিশ্বাসযোগ্য? কারণ, বইটির প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছে, 'বি ভি শ্রেনেক নটজিং রচিত 'ফেনোমেনস অব মেটিরিয়ালাইজিং' ও অন্যান্য ইংরেজি বই থেকে প্রেতাত্মাদের আরও কতকগুলি আলোকচিত্র এই বাংলা সংস্করণে সংযোজিত হল। অর্থাৎ এই আলোকচিত্রগুলি নিছকই অন্যের ফসল। কিন্তু এগুলি যে নির্ভরযোগ্য এবং সত্য, তার কি কোন গ্যারান্টি আছে? অথচ সাধারণ মানুষ তো এগুলিকেই সত্য বলে শিরোধার্য করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে সংযোজিত থাকলে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা কমে যেত।

স্বামী অভেদানন্দজীর আত্মজীবনীমূলক রচনা আমার জীবন কথা (২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬) অনুসরণে জানতে পারি: আমেরিকায় অবস্থান-কালে তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করার জন্য বিভিন্ন সিয়ান্সে বা প্রেততত্ত্ব বৈঠকে যোগদান করতেন। আমেরিকায় গঠিত প্রেততত্ত্ব অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। তিনি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈঠকেও বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব যে মৃত্যুর পরে থাকে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন।…তিনি বিশ্বাস করতেন, বিদেহী আত্মারা উপযুক্ত পরিবেশে স্থূলদেহ ধারণ করে ক্ষণিকের জন্য আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দজী বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা ও ব্যাখ্যাকার, আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনাসম্পন্ন যুগপুরুষ, অসাধারণ বাগ্মী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণ সমর্পিত শিষ্য ও স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত প্রিয় ও অনুগত গুরুভাই। তিনি দেশে এবং বিদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ বেদনার বিষয়, আজকের সুধী মহলেও তাঁর নাম উচ্চারিত হলেই প্রেততত্ত্ব সম্পর্কিত প্রসঙ্গেই তাঁর নামকে যুক্ত করা হয়। এটা কি তাঁর খণ্ডিত পরিচয় নয়?

– প্রণবেশ চক্রবর্তী।

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গের বন্দীমুক্তি আন্দোলনের দপ্তারকা জ্যোতি বসুর সরকারের জেলখানায় কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড, নকশাল রাজবন্দীদের পাশাপাশি সাধারণ বন্দী এবং নিরপরাধ বন্দিনীরা এক অমানুষিক নারকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আছেন কেন? বন্দীরা কি বলেন? আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট জেলখানাকে চূড়ান্ত মানবতাবিরোধী বলে চিহ্নিত করে কেন? সরকারি জেলখানার অভ্যন্তরে অত্যাচার ও প্রশাসনিক অরাজকতার তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন।

জ্যোতি বসুর জেলখানা

সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে রাজবন্দীরাও অমানবিকতার শিকার

বন্দী মুক্তি আজও কানামাছি খেলা?
অথবা লটারী? কপালে জুটলো বাজী
ছাড়বেন তাকে কাজী।

পোড়া কপালের মেঘে মেঘে বাড়ে বেলা-
জেলের গরাদ সমানে ভেংচি কাটে!
বক্তৃতা দেন হুজুর গড়ের মাঠে,

'হবে, সব হবে, একদিন সব হবে '।
কবে? মহাশয়? কবে!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু

আলিপুর জেল
রাজবন্দীদের আটককেন্দ্র

এ রাজ্যে তখন কংগ্রেস জমানা। তুমুল কংগ্রেস বিরোধীতার ১৯৭৪ সালের ১৬ জানুয়ারি বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সি পি আই (এম) তথা অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে দাবী তুললেন 'দু'বছরের বেশি কোন বিচারাধীন বন্দীকে জেলে আটক রাখা যাবে না।' মিছিল, সভা সমাবেশ, নাগরিক সম্মেলন ভর করে '৭৭ সাল অবধি জ্যোতি বসু, প্রয়াত স্নেহাংশু আচার্য, সাধন গুপ্ত সহ এখনকার তারকা কমুনিস্টরা পশ্চিমবাংলা তুলকালাম করে ছেড়েছিলেন। তাঁদের প্রাণ সেদিন বন্দীদের স্বার্থে হাহাকার করে উঠেছিল। তারপর—

'৭৭-এ ভেঙে পড়ল কংগ্রেস জমানার। ক্ষমতায় এল বন্দীদের দুর্দশায় 'হৃদয়-উদ্বেল' বামফ্রন্ট। তার মুকুটমণি হয়ে মন্ত্রিসভা উজ্জ্বল করে বসলেন এতদিনের বন্দীমুক্তিকামী স্বয়ং জ্যোতি বসু রাজনৈতিক বন্দীরা এবার মুক্তির স্বপ্ন দেখলেন 'জনশত্রু' কংগ্রেসকে হটিয়ে 'জনগণের বন্ধু' বামফ্রন্ট এবার নিশ্চয়ই তাঁদের প্রস্তাবিত নীতি লাইন মেনে বন্দীদেরপ্রতি সহৃদয় হবেন। কিন্তু সেই অলীক স্বপ্ন গড়ালো তের বছর, ৯৮ জুন '৯০ হাইকোর্টে রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য

অনুযায়ী আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, বহরমপুর, মেদিনীপুর, কোচবিহার ও মালদা জেলে বিচারাধীন অবস্থায় ১১ বছরেরও অধিক সময় ধরে এখনও জেল-বন্দী আছেন ২৬ জন নকশালপন্থী, ৬ জন ঝাড়খণ্ডী ও কংগ্রেসী রাজনৈতিক বন্দীরা অকল্পনীয় দুর্দশা ও প্রশাসনিক ববতার শিকার হয়ে তাঁরা কারাগারের অন্ধকূপে অনিশ্চিত বেঁচে আছেন বছরের পর বছর অধিকাংশের বিরুদ্ধে দেওয়া আছে গড়ে ৮ ১০টি মামলা তার মধ্যে ৩.৪টি মামলায় ৫ ৬ বছর ধরে কোন চার্জশিট দেওয়া হয় নি। আটক রাখা হয়েছে 'কেস কানেকশন' অধিকাংশের ক্ষেত্রে ৮ থেকে ১১ বছর পরও কোন বিচারই শুরু হয় নি। বিচারাধীন বন্দী গৌতম চক্রবর্তী, কেলটি মুর্মু, যোগেন রায় ও সুনীল বর্মন অসুস্থ ও আশংকাজনক অবস্থায় রয়েছেন অথচ জেলে তাঁদের যথাযথ চিকিৎসাও হচ্ছে না ১৯৮৩ সালে পুলিশের গুলি গৌতম চক্রবর্তীর বাঁ-চোখ ভেদ করে মাথায় ঢোকে। আশ্চর্যের ব্যাপার তা আজও বের করা হয় নি পুলিশের অত্যাচারে কেলটি মুর্মুর মেরুদণ্ডে যে আঘাতজনিত ব্যথা আছে, তারও কোন চিকিৎসা হয় নি '৮৩ থেকে কেলটি মুর্মু রয়েছেন বহরমপুর জেলে। '৮৩ সালে পুলিশি অত্যাচারের ফলে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। সেই থেকে অসম্ভব ব্যথায় তিনি জেলবন্দী অবস্থায় ছটফট করছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন রেকর্ড জেল কর্তৃপক্ষ গত ৬ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত পর্যবেক্ষক ডাঃ শিশির কুমার মণ্ডলকে দেখাতে পারেন নি। শুধু '৮৮ সালের একটি প্রেসক্রিপশন দেখানো হয়েছে, যাতে দাদ সারাবার মলম ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে মাত্র

অথচ এই সরকার বহির্ভারতে নিজের ভাবমূর্তির স্বার্থে নেলসন ম্যান্ডেলাকে ঘটা করে সংবর্ধনা দেন। 'জেল মুক্তি'র প্রতীক হিসেবে ম্যান্ডেলাকে রাষ্ট্রনেতার সম্মান দেন তাঁকে 'ভগবানে'র আসনে বসিয়ে রাস্তায় রাস্তায় দেখান ফেস্টুন, তোরণ। লক্ষ লক্ষ টাকা ওড়ান বক্তৃতা দেন। ছড়া কাটেন। হাতে হাত ধরে রাজনৈতিক জেলবন্দীদের উদ্দেশে 'মানবিকতার বাণী' ছড়ান। অথচ এই সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৩০ জানুয়ারি '৯০ বিবৃতি দিয়েছিলেন 'নকশালপন্থীদের ছাড়া হবে না, কারণ তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আছে।' নকশালপন্থীরা যদি রাজনৈতিক বন্দী না হয় তবে আজিজুল হককে মুক্তি দেওয়া হল কেন? আজিজুল হককে মুক্তি দেওয়ার কারণে বুদ্ধদেববাবুর নীতিগত স্ব-বিরোধিতা কি স্পষ্ট হয় না? বুদ্ধদেববাবু কি জানেন না যে অতীতে, এমন কি প্রাক স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের ফৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার করাই ছিল আইনানুগ রীতি। ভারতীয় প্রচলিত আইনে শুধু রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক মামলায় কাউকে বন্দী করে রাখার কোন বন্দোবস্তই নেই

এমন আইনবিধির অজুহাতে রাজনৈতিক বন্দীকে ক্রিমিনাল সম প্রশাসনিক বর্বরতার শিকার করা কি 'হাল বাম জমানা'র নয়া নীতি বলে ধরে নিতে হবে? যেহেতু নকশাল নেতা আজিজুল হককে মুক্তি দিয়ে নকশালপন্থী বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দী হিসেবেই পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন বাম-প্রশাসক। আর 'হাল বাম জমানার নীতি' এ জন্যই যে ৭০ দশকে কংগ্রেস আমলে এখনকার হর্তাকর্তা বামনেতারা বন্দীমুক্তির জন্য বাংলা দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসকে 'জনশত্রু' হিসেবে তুলে ধরে জনমত গড়ে তুলেছিলেন। এমন কি গৌতম ঘোষের ডকুমেন্টারি 'হাংরী অটাম'এ স্বয়ং জ্যোতি বসুই বন্দী মুক্তিদের কারাগার ভেঙে ফেলার ডাক দিয়েছিলেন। ডাক দিয়েছিলেন নিঃশর্ত মুক্তির। ভাবতে অবাক লাগে এই জ্যোতি বসুর আমলে ২৬ জন প্রথিতযশা রাজনৈতিক বন্দী ৬টি জেলগরাদের অন্তরালে ১৩ বছর কাটিয়ে দিলেন

আত্মীয়স্বজন, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে জেলহাজতের ট্রপিক্যাল দুনিয়ায় কিভাবে এইসব মানুষেরা অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন আরও কতদিন কাটাবেন তা শুধু তাঁরাই জা... তাই তাঁরা একরকম বাধ্য হয়েই গড়ে তুলেছেন কারাগারের ট্রপিক্যাল কালচার। সে দমদম সেন্ট্রাল জেলই হোক কিংবা প্রেসিডেন্সি জেল। মালদা জেল কিংবা বহরমপুর জেলই হোক সেই ট্রপিক্যাল বৃটিশ প্যাটার্নে তৈরি খোলসটার কি কোন বিকৃতি হয়েছে। যেমন প্রায় অবিকৃত তার অফিস, চৌকি, আইনকানুন

প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকতেই বিশাল লৌহ কপাট। বন্দুকধারী দারোয়ানের শকুন দৃষ্টি। ডান দিকে ঘেরা একটি টেবিল চেয়ার। পাশে সাজানো লাল সবুজ-সাদা পতাকা। দেয়ালে অ্যালার্ম সিগন্যাল

কারাবন্দী অবস্থায় আজিজুল হক

টেবিলের পাশের দরজা দিয়ে গেলে প্রশস্ত হল ঘর। পরপর চেয়ার টেবিল। প্রয়োজনীয় নথিপত্রে ঠাসা। একের পর এক আলমারি। হল ঘরের ডান দিকে সবুজ পর্দা ঝোলানো 'জেলার' এর চৌকাঠ

অফিস ঘর থেকে প্রায় ৮০ পা এগুলেই আরেকটা লোহার গেট। তার পাশে ছোট কাঠের দরজা। আর দরজার ওপারেই বন্দীদের দিনযাপন। দা ছমছম অন্ধকার। ঘরগুলির মধ্যে টিমটিমে আলো। কোথাও বা সময় কাটানোর জন্য থালা পিটিয়ে বন্দীদের গানের মহড়া চলে সামনে শান বাঁধানো পুকুর। বাঁ-দিকে ঘুরলেই লোহার রেলিং। ল্যাপোয়া গেট। গেটের মধ্যে বিভিন্ন ওয়ার্ড, ব্লক যে যেমন দরের তার তেমন ওয়ার্ড, তেমন ব্লক। কারাগারের কথ্য ভাষায় ব্লকগুলিকে বলে 'খাতা'। যেমন ৯ খাতা—কনভিক্টদের জন্য প্রত্যেকটি খাতা প্রায় দেড় মানুষ-সমান ঘেরা হলুদ রঙের প্রাচীর আর এর মধ্যেই বন্দীদের ওঠাবসা—যা কিছু নিত্য কাজ। খোলা ড্রেন ল্যাট্রেনের পা ঘষি করা গন্ধ, কোথাও বা ঝাঁঝালো ব্লিচিং পাউডারে, ফিনাইলের গন্ধ

মেইন গেটের বিপরীত দিকে খোলা মাঠ। মাঠটা আড়াআড়ি পার হলেই বাঁধানো ঘাট। বসার রক। কাছেই ওয়েলফেয়ার অফিস। মোরামের রাস্তাটা চওড়া হয়ে মূল রাস্তার মিশে যাওয়ার সংযোগ স্থলে ছোট্ট ফুলের বাগান আর রেলিং দিয়ে ঘেরা অরবিন্দের মূর্তি। আরো কিছুটা এগিয়ে একটা রেলিং গেট পার হলেই ছোট অন্ধকার খুপরি ঘর। সামনে অরবিন্দের মূর্তি এখানেই জনমানবশূন্য সেলে বন্দী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ খুপচি ঘরে একটাই দরজা, তাও আবার ঘন জাল দিয়ে আটকানো এখন তা জেল কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত স্থান

বন্দীর শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী খাবার দাবারের রকমফের বেশ। সাধারণ বন্দীদের খাবার-ডাব্বু মাপা ভাত, কালো জলের মত ডাল, তরিতরকারির খোসা দিয়ে ঘাঁটি ব্যস। অবশ্য উঁচু দরের রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষেত্রে এর ছবিটা আকাশজমিন ফারাক।

এই জেলখানাদের অন্তরালে চলে বন্দীদের মর্মান্তিক জীবনযাত্রা চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল। পৃথিবীর অপ্রতিহত আলোবাতাস বিবর্জিত এই দৈত্যাকার ঘেরাটোপের মাঝখানে তাদের বন্দী-পৃথিবী গুমোট পরিবেশ। জেল-রক্ষীদের পিটুনি। কারো হাত ওঠে না, কারো পা চলে না, ক্লান্ত মস্তিষ্ক—কেউবা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অত্যাচার সইতে সইতে এখন পঙ্গু প্রায় বোধবুদ্ধিহীন নকশাল নেতা আজিজুল হকের ডায়রি থেকে জানা যায় "আগে পুলিশের অত্যাচারে মাথা ফাটত হাত ভাঙত, এখন হচ্ছে লাং পাংচার, ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ। সব কিছুই চলছে সায়েন্টিফিক্যালি।" অথচ মার্কসবাদীদের গুরু কমরেড লেনিন বলেছিলেন, 'কারাগার

প্যাট্রিসিয়া মাণ্ডে : রিট পিটিশনে মুক্তি

আমেরিকাবাসী প্যাট্রিসিয়া মাণ্ডে আনন্দমার্গীয় মতবাদে বিশ্বাসী। ১৯৯০-র গোড়ার দিকে তিনি এদেশে আসেন রাষ্ট্রসংঘের মানবতাবাদী কমিশনের সদস্য প্যাট্রিসিয়া ও তার বিদেশি বন্ধু পুরুলিয়ার আনন্দমার্গ আশ্রম থেকে বেরোবার যাওয়ার পথে সি পি এম-এর তাণ্ডব বাহিনীর হাতে অযথা হয়রান হন। ঘটনাসূত্রে জানা যায়, ১৯৯০-র ২৪ জানুয়ারি পুরুলিয়ার আনন্দনগরের কাছাকাছি চোকিবেড়া গ্রামে পুনদাগ হাইস্কুলের শিক্ষক কোয়ার্টারে একদল আততায়ী গুলি চালায়। এতে দুজন মারা যান। এই ঘটনার পর পুলিশ ৪৬ জনকে গ্রেপ্তারও করে। ঘটনার দুদিন পর একটি স্কুটারে চেপে প্যাট্রিসিয়া ই মাণ্ডে ও আরও একজন নাকি পালাবার চেষ্টা করেন। ওইসময় স্থানীয় লোকজন ওঁদের আক্রমণ করলে ওরা মারাত্মক ভাবে আহত হন। পরে ওঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই একই দিনে পুরুলিয়ায় হানা দিয়ে পুলিশ প্যাট্রিসিয়াসহ পাঁচজন বিদেশিকে গ্রেপ্তার করে। অন্তরীণ অবস্থাতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন প্যাট্রিসিয়া। কিন্তু পুলিশ বাইরে চিকিৎসা করতে দিতে রাজী হয়নি। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ১৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ প্যাট্রিসিয়া মাণ্ডেকে চিকিৎসার জন্য বেলভিউ নার্সিং হোমে ভর্তি করে প্যাট্রিসিয়ার বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযোগটা কি তা জানান হয়নি তাঁকে। অথচ তাঁর চলাফেরা ও লোকজনের সঙ্গে দেখা করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্যাট্রিসিয়া নিজেই জানিয়েছেন যে "আমার কাছে গ্রেফতার ও আটকের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়। কারণ পুলিশের তরফ থেকে আমাকে বারবার জানানো হয়েছে যে আমাকে নাকি গ্রেফতার করা হয়নি, আটক করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমি-শনের সদস্য হিসেবে বহু দেশে মানবাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত আমরা করেছি দেশীয় সরকারের কাছে কোথাও কোনরকম বাধা পাই নি অথচ ভারতের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এ কি নিদর্শন।' তাঁর নিজের ভাষায়—'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, কিভাবে আটকে রেখেছে আমায়। আনন্দমার্গীদের সংগঠন কি এই দেশে বেআইনি ঘোষিত হয়েছে? কোনরকম অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কারুর ইচ্ছের

বিরুদ্ধে এভাবে কাউকে বন্দী করে রাখা এবং অত্যাচার করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কি চরমতম নিদর্শন নয়?'

প্রথমে আহত প্যাট্রিসিয়াকে কোনরকম কারণ না দেখিয়ে পুলিশ কিড স্ট্রিটের সরকারি অতিথিশালায় গৃহবন্দী রাখে এ অবস্থায় আহত প্যাট্রিসিয়া তাঁর চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট তা মঞ্জুর করায় তাকে বেলভিউ নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেও তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় ও বাইরের লোকেদের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ার যোগাযোগের উপর অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। প্যাট্রিসিয়ার অপর সঙ্গীটিকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হলেও প্যাট্রিসিয়াকে ওইভাবে বিনা দোষে আটক করে রাখায় আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের তরফ থেকে হাইকোর্টে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের আবেদন করা হয়। সম্পূর্ণ অবৈধ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে প্যাট্রিসিয়া ই মাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন করেন তাঁর বক্তব্য রাজ্য সরকার প্রথমে তাঁকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেন ও পরে অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করে আটক রাখেন প্রায় মাস খানেক প্যাট্রিসিয়াকে বন্দী অবস্থায় থাকতে হয়

প্যাট্রিসিয়া ছাড়াও আনন্দমূর্তিজীর তিরো-ধান অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছুক বহু বিদেশি নাগরিককে পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি দেওয়া হয় নি অনেককেই দমদমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার স্বদেশ অভিমুখে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। কয়েক-জনকে দমদম এয়ারপোর্ট হোটেল কিংবা রেস্ট হাউসে আটকে রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য জন্মসূত্রে ভারতীয় অস্ট্রেলিয় নাগরিক আনন্দমার্গী সুভাষ দত্ত ও পশ্চিম জার্মানির নাগরিক মিস উডবাই ওয়েমান। শেষ পর্যন্ত এদের আনন্দমূর্তিজির অনুষ্ঠানে যোগ-দানে অনুমতি দেওয়া হয় নি।

— আলো চৌধুরী।

বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়'।

"এ রাজ্যের মার্কসবাদীদের দৌলতে সেই কারাগার শুধু শারীরিক অত্যাচারে থেমে থাকে নি, ক্ষুধার্ত বন্দীদের মুখের গ্রাস কেড়ে চোরা মার্কেটে পাচার হচ্ছে চাল-ডাল-তরিতরকারি। অসুস্থ বন্দীদের প্রাপ্য দুধ চলে যাচ্ছে জেলরক্ষীদের ঘরে ঘরে। এতেও সওদা হচ্ছে। অসুস্থ বন্দীদের ওষুধের টাকা চলে যাচ্ছে জেলরক্ষীদের পকেটে আর মরণাপন্ন বন্দীরা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিন গুনছে জমাদার রয়েছে জনা কতক। অথচ জঞ্জালের পাহাড় জমে রয়েছে মাসের পর মাস মশামাছি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেদিকে কারুর হুঁশ নেই, বলবে কে? 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'রা যে যার নিজের চরকায় তেল দিতেই ব্যস্ত।" —কথাগুলি আলিপুর জেলের জনৈক রাজবন্দীর।

আর তাঁদের খামখেয়ালি বদমেজাজ এসে পড়ে বন্দীদের ওপর। অকারণে জেরা, প্রহার পেটানো, মূর্ছা যাওয়া, শরীরটি মরা মানুষের মত টানতে টানতে ফেলে যায় যে যার খাঁচায়। এভাবেই জেলরক্ষীদের হাতে তাদের বিচার চলে। কারণ সাংবিধানিক নিয়ম মেনে আদালতে বিচার চালালে পুলিশরা নিজেদের সাফাই গাওয়ার সুযোগ পাবেন কী করে। শুধু রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক বন্দীদের মামলা চালানোর ভারতীয় ফৌজদারী আইনে তেমন কোন গাইড লাইন নেই। এই কারণেই সরকারি অনুমোদনে পুলিশ বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের 'কেস ক্যানেকশন' দিয়ে বছরের পর বছর জেল হাজতে আটক রাখে। আর নিজেদের প্রগতিশীল মুখোশটি টিকিয়ে রাখার অজুহাতে এঁরা বলে যান 'বন্দীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ফৌজদারী অভিযোগ আছে।'

ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক বন্দীদের যেমন নিতান্ত ক্রিমিন্যাল হিসেবে দেখা হত এখনও কি তার হেরফের হয়েছে? প্রমাণযোগ্য তথ্য না পেয়েও চলছে তাঁদের বিনা বিচারে আটকে রাখার রীতি। কারণ একটাই, ক্রিমিন্যাল বা হত্যাকারীর অভিযোগ তুলে বহুদিন বন্দীকে আটকে রাখা যাবে আর তাতে বিরোধী পক্ষের শক্তিক্ষয় হবে, সক্রিয়তা কমবে।

অথচ 'জনগণের সঙ্গে' বইটিতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখছেন: '…বন্দী মুক্তির দাবীতে এক স্মারকলিপি নিয়ে আমরা কয়েকজন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর সঙ্গে দেখা করি এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি ও ভূপেশ গুপ্ত আমরা স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিলাম স্মারক-লিপিতে বলা হয়েছিল, এই রাজনৈতিক বন্দীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন তবুও তাদের আটক রাখা হচ্ছে। তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। সুরাবর্দী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইংরেজ অফিসার পোর্টারকে ডেকে পাঠালেন। সুরাবর্দী তাঁকে আমাদের স্মারকলিপির একাংশ পড়ে শোনালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এ

জেলবন্দী চারু মজুমদার

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মার্কসবাদীদের পরিচালিত এ জেল দেখলে লেনিন কোনো সময়েই বলতেন না, 'এটা বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়!' উৎপল দত্তকেও দশ বার হোঁচট খেয়ে বলতে হত, 'ক্ষুদিকের স্মৃতিধন্য কারাগার।…'

সম্পর্কে পোর্টারের কি বলার আছে পোর্টার উত্তরে বললেন, স্যার এঁরা (অর্থাৎ বন্দীরা) সব হত্যাকারী। তখন পোর্টারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল সুরাবর্দী বললেন, তিনি দেখছেন, কি করা যায় আমরা বুঝেছিলাম সুরাবর্দী বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারপর ২৪ জুলাই ১৯৪৬ বন্দী মুক্তির ঘোষণা করেন।'

আর সেদিন যাঁদেরকে ইংরেজ পুলিশ অফিসার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদের হত্যাকারী বলেছিলেন, ৪৫ বছর বাদে তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী তাঁর বিরোধী রাজনৈতিক দলের মানুষদের বললেন ক্রিমিনাল

বদলে যাওয়া মানসিকতায় সি পি এম জ্যোতি বসুকে কার্নান্ডেজের চিঠি

Yours sincerely,

সরকারের কাছে রাজনৈতিক বন্দীর সংজ্ঞা বদলে গেছে, কিন্তু কংগ্রেস আমলে থাকা অত্যাচারী-বিভীষিকাময় জেলখানাগুলি এই আমলে কেমন হয়েছে? সেকথা শোনা যাক ১৮ বছরের জেলবন্দী আজিজুল হকের কলম থেকে; কেননা তিনি স্বাধীনোত্তর ভারতে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই সরকারের জেলখানায় থেকেছেন বছরের পর বছর—'জেলের চারদিকে বিশ ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে পৃথিবীর গতি স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভয়াবহ গুমোট আবহাওয়া, চাপা কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে এদের। আর বুকচেরা নিঃশ্বাসের সাথে ঘুমোতে যায় এরা। সমাজসংসার এদের ত্যাগ করেছে। এরা কিন্তু ভাবে তাদের কথা। স্নেহ-ভালবাসা এখানকার অধিবাসীরা পায় নি, কিন্তু দিতে চায়। এরা কিছু দিতে চায়, কিছু করতে চায়, কিন্তু এদের 'হাত'কে করে দেওয়া হয়েছে অকেজো, মস্তিষ্ককে অলস, এটা করা হয়েছে কখনো বা বড় বড় বুলির আড়ালে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে।…

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মার্কসবাদীদের পরিচালিত এ জেল দেখলে লেনিন কোনো সময়েই বলতেন না, 'এটা বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়।' উৎপল দত্তকেও দশ বার হোঁচট খেয়ে বলতে হত, 'ক্ষুদিকের স্মৃতিধন্য কারাগার'

জেল আমার জীবনে নতুন নয়। যাদের সঙ্গে জেল খেটেছি এখন তাদের হাতে জেল খাটছি। কিছুই কি পালটায় নি? পালটেছে বই কি? এই যেমন বাঁশের লাঠির জায়গায় বেতের ছড়ি। আগে অত্যাচারে মাথা ফাটত, হাত ভাঙত, লোকে দেখতে পেত, এখন থার্ড ডিগ্রি, আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। আগে বন্দীরা খেতে পেত। চুরি তখনও ছিল, কিন্তু সেটা হত গোপনে, বড় জোর দুটো ডিম কিংবা হাফ কিলো তেল। এখন চুরিটা আইন-সিদ্ধ।

সেপাই-বাবুদের ইউনিয়নের কল্যাণে জেলের সুপার ঠুঁটো জগন্নাথ। ডাক্তার থরহরিকম্প। মন্ত্রীদের নামে 'জিন্দাবাদ' দিয়ে সকাল নটায় তেনারা ব্যাগ হাতে জেলে ঢোকেন, জেলের ভেতর থেকে বিনি পয়সায় বাজার করে বেরোন, 'তেনারা' মানে সকলে নন কিন্তু, খুবই সামান্য অংশ চুরির বহর শুনলে বোফর্সের দালালরাও এদের গুরু বলে মেনে নেবেন

যখন দমদম জেলে ছিলাম দেখেছি 'এক ইউনিয়নে'র একজন সভাপতি 'এঁড়ে' (পুরুষ গোরু) পুষে দৈনিক বিশ কিলো দুধ বিক্রি করত। অসুস্থ বন্দীদের জন্য ওই জেলে প্রায় ৬০০ লিটার দুধ আসত। দুধের গাড়ি এলেই 'সভাপতিজী' বা 'পাঁচাল-বোতল' চলে যেত। সেই দুধে তাঁর চলত তালাও কারবার সেই টাকাই জেলের শ্রমিকদের মাসে ১০ টাকা হার সুদে চক্রবৃদ্ধিতে খাটান তিনি। 'এঁড়ে'টা ধরা পড়েছে এখন কারবার চলছে বিনা গরুতে। তাঁর আরও এক মহান কারবার আছে। খাটিয়া ভাড়া দেওয়া 'জেসপ' এবং পার্শ্ববর্তী শ্রমিক

জেলে মহিলা ওয়ার্ডের ভয়ংকর অবস্থা

আদালত নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার শিবশংকর চক্রবর্তীর প্রেসিডেন্সি জেলের মহিলা ওয়ার্ডের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট।

জনস্বার্থ সম্পর্কিত একটা মামলা ক্রিমিনাল আপিল নং ২৯৮, ১৯৭৯। মহামান্য বিচারপতি দিলীপ বসু আমাকে তাঁর আদালতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ৭ ৯'৯০ তারিখে তিনি আমাকে, সঙ্গে আরও কয়েকজনকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং জেল জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিপোর্ট সাবমিট করতে বলেন তার মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে ফিমেল নন ক্রিমিনাল লুনাটিক্স অবস্থা সম্পর্কে

এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ড এর মধ্যে একটি ঘর আছে যেখানে এন সি এল-দের চিকিৎসা করা হয়, এবং এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ড-এর মেয়েরা যাকে হাসপাতাল বলে উল্লেখ করে থাকে। এই তথাকথিত হাসপাতালে যা কয়েকটি খাট দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এ ছাড়া গোটা এন সি এল (এফ) ওয়ার্ড-এ আর কোনও খাট নেই। এই হাসপাতালে দশটি থেকে বারটি খাটের ব্যবস্থা আছে। অতএব ২২০ জন মেয়ের মধ্যে ১২ জন মেয়ে ছাড়া বাকি সবাই সিমেন্ট এর মেঝেতে শুয়ে থাকে

ওই হাসপাতালে কোনও নার্স নেই কোনো ফুল টাইম ডাক্তারও নেই। এই স্পেশাল অফিসার গিয়ে জনৈকা এডেল ক্যানির দেখা পান, যে অসুস্থ এন-সি-এল (এফ) দের হসপিটালে দেখাশোনা করে। এই এডেল ক্যানি বস্তুতঃ একজন কনভিক্ট। সে নার্সও নয়, এমনকি জেল কর্মচারিও নয় এই মহিলাই অসুস্থ এন-সি এল (এফ) দের ওষুধ এবং খাবার দাবার দিয়ে থাকে। মিস ক্যানি জানায়, আর এক দেড় মাসের মধ্যেই সে জেল থেকে ছাড়া পাবে এবং তারপর কে যে এই অসুস্থ এন-সি এল (এফ) দের দেখাশুনা করবে তা সে জানে না এই স্পেশাল অফিসার যখন তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহিলা কারারক্ষীরা কেন এই কাজ করে না? সে উত্তরে জানায়, 'মহিলা কারারক্ষীরা শুধু পাহারা দেয়। যেহেতু তারা নার্স নয়, অথবা তাদের কোন মেডিকেল ডিগ্রি নেই, তারা এসব কাজ করে না ' মিস ক্যানির আগে জনৈক দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলা এই কাজটি করত মিস ক্যানি চলে যাওয়ার পরেও অন্য কোন দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলাকে এই কাজের জন্য নিয়োগ করা হবে। গোটা এন-সি-এল (এফ) ওয়ার্ডে যেখানে বেশির ভাগ মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ, সেখানে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল, একজনও নার্স নেই তাদের সর্বজনের দেখাশোনার জন্যে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে

একজন সাইকিয়াট্রিক, নাম রঞ্জন সেন, মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্যে আসেন তবে ধরা-বাঁধা কোন রুটিন নেই। তিনি সপ্তাহে ক'দিন আসবেন অথবা কবে আসবেন এডেল ক্যানি জানায়, এই রঞ্জন সেন সাধারণত সপ্তাহে দু'বার আসেন এবং ঘন্টা দু'য়েক থেকেই চলে যান অসুস্থ এন সি-এল (এফ) দের কি খাবার এবং কি ওষুধ দেওয়া হবে, তিনি মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়ে যান সেই নির্দেশ এডেল ক্যানি পালন করার চেষ্টা করে।

উল্লেখ থাকে যে, এই রঞ্জন সেন একমাত্র সাইকিয়াট্রিস্ট যিনি প্রেসিডেন্সি জেল-এর এন সি এল (এফ ওয়ার্ড-এর ২২০ জন + মেল ওয়ার্ড-এর ৫০ জন, ইন্সটিটিউট অফ মেন্টাল হেল্থ-এর ১৬০ জন এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেল-এর প্রায় ৫০ জন অসুস্থ লোকের দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। উপরোক্ত তথ্য থেকে যেটা বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, ৫০০ জন এন সি এল-এর জন্যে মাত্র একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এভাবে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে যদি ৫০০ জন রুগী দেখতে হয়, সেক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে কিছু গাফিলতি থাকবে খুবই স্বাভাবিক। এবং একজন সাইকিয়াট্রিস্টের পক্ষে ৫০০ রুগীকে নিয়মিত দেখাশুনা করা সত্যি অসম্ভব। এর থেকে প্রমাণিত হয় কারা কর্তৃপক্ষ এন সি-এল-দের পক্ষে কতটা অমানবিক। এবং এটা যে একটা বিরাট গাফিলতি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই

এই গাফিলতির প্রমাণ হিসেবে জেল কর্তৃপক্ষের দু'টো পরিসংখ্যান উল্লেখ করা খুবই জরুরি

জেল কর্তৃপক্ষকে ১৯৮৯ সালে মৃত এন সি এল (এফ)-এর তালিকা দিতে বলা হয়েছিল এবং যে তালিকা থেকে দেখা যায় ১'১ ৮৯ থেকে ৩১ ১২ ৮৯ পর্যন্ত ১২ জন হতভাগিনী এন-সি-এল (এফ) দের মৃত্যু ঘটেছে। ১৯৯০ সালে কতজন মারা গেছে জানতে চাইলে, কারা-কর্তৃপক্ষ যে তালিকা সরবরাহ করেন তাতে দেখা যায় ১'১'৯০ থেকে ১১ ১০ ৯০ পর্যন্ত ১৪ জন এন সি এল (এফ) মারা গিয়েছেন

স্পেশাল অফিসার এন সি-এল (এফ) দের হসপিটালে গিয়ে এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ড-এর অংশবিশেষ দেখেছেন মোট ৪টি ঘরে এন-সি এল (এফ)-দের দেখতে পেয়েছেন। চারটি ঘরের মধ্যে একটি ঘরকে বলা হয় এন সি এল (এফ) দের 'হাসপাতাল' অন্যান্য ঘর থেকে এই ঘরের পার্থক্য খুবই সামান্য। এই তথাকথিত হাসপাতালে যেমন কয়েকটি খাট ছিল, তেমনি ছিল কয়েকটি হাতকড়া। আপাতদৃষ্টিতে অফিসার হিসেবে যে ক'দিন হাসপাতালে গিয়েছি, একদিনও আমার নজরে ওষুধপত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন কিছুই পড়েনি এগুলির পরিবর্তে নজরে পড়েছিল বেশ কয়েকটি হাতকড়া ওই হাতকড়াগুলি হাসপাতালে কেন আছে, এর কোন সদুত্তর যারা পাহারা দেয় সেইসব ফিমেল ওয়ার্ডাররা দিতে পারেনি যদিও এই হাসপাতালে রুগী হিসেবে শুয়ে থাকা দু'একজন মহিলা জানিয়েছেন, ওই হাতকড়াগুলি দিয়ে তাদেরকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। স্পেশাল অফিসারেরা ওই নির্দিষ্ট দিনে পরিদর্শনে যাবেন বলেই তাদের হাতকড়াগুলি খুলে রাখা হয়েছে। এই তথাকথিত হাসপাতালে যতবার পরিদর্শনে গিয়েছি প্রত্যেকবারই দেখেছি, এখানে যতগুলি খাট আছে, তার চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। ফলে প্রত্যেকবারই নজরে এসেছে, বেশ কিছু মেয়ে সিমেন্টের মেঝেতে, ছেঁড়া এবং মলিন এক খণ্ড বস্ত্র পেতে শুয়ে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, এই মেয়েদের শোয়ার জন্যে যেমন কোন উপকরণ সরবরাহ করা হয়নি তেমনি এদের পরিধেয় এক খণ্ড বস্ত্র ছাড়া আর কোনও পোশাকও সরবরাহ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ ব্লাউজ।

এখানে অন্য যে তিনটি ঘর আছে তার মধ্যে একটি ঘরকে জেল কর্তৃপক্ষ বলেছিল, (আইডেন্টিফায়েড অ্যাক্ট-এ) এটি চূড়ান্ত উন্মাদের

থাকার জন্য এ ধরনের একটা ঘর কোনও সভ্য সমাজে কোন সরকার মেয়েদের থাকার জন্যে ব্যবহার করতে পারে তা অকল্পনীয়। এই ঘরটি বেশ বড় দিনের কোন সময় সূর্যের আলো ঢোকে না। ঘরের এক পাশে ৭/৮টি ছোট ছোট খাঁচা। খাঁচার মাপ ৬ × ৬'। মোটা মোটা রড দিয়ে তৈরি এই কাঠামোগুলি আগাগোড়া লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা চূড়ান্ত উন্মাদদের জন্যে নির্দিষ্ট এই ঘরের মধ্যে এই খাঁচাটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে চাইলে জেল কর্তৃপক্ষ জানান, যে সব উন্মাদ বিপদজনক, তাদের এই খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখা হয় প্রথম যেদিন এই ঘরটিতে স্পেশাল অফিসার ঢুকেছিলেন, সেদিন তিনি হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ ওই ঘরের মধ্যে প্রায় ৪০ জন মেয়েদের মধ্যে ২০ জন

রূপা মুখার্জী

রুকু সিং

দীপালি দাস

ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন ৪টি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল ৩টি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় ওই ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছিল, একটা খাঁচা দরজা বন্ধ কিন্তু তালা লাগানো ছিল না তার মধ্যে তিনটি নগ্ন মেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল এই তিনটি মেয়ের শোয়া দেখে মনে হয়েছিল শীতকালের রাত্রিতে তিন-চারটি কুকুর এইভাবেই কুণ্ডলী পাকিয়ে রাস্তার ধারে শুয়ে থাকে

এর পাশের খাঁচাটিতে একটি মেয়ে নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, যদিও দরজাটা খোলা। তার পরের খাঁচাটায় একজন এবং তার পরের খাঁচাটিতেও একজন সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে ছিল। পরের খাঁচাটিতে দু'টি সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে বসেছিল, তারও পরের খাঁচাটিতে একটি মেয়ে স্পেশাল অফিসারের দিকে পেছন ফিরে কাঁদছিল পাশে আরেকটি খাঁচার মধ্যে স্তূপাকার করা ছিল কিছু কাপড় এবং কিছু কম্বল। এটির দরজায় তালা লাগানো ছিল। এই ঘরটির পরিবেশ এতই অস্বাস্থ্যকর এবং মেয়েদেরকে রাখা হয়েছিল এমনই অমানবিক-ভাবে যে স্বভাবতই এই স্পেশাল অফিসারের মনে হয়েছিল নাৎসী বন্দী শিবিরে যারা আটক ছিল তারাও বুঝি এর চাইতে ভাল ছিল

প্রথম যে খাঁচার বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি মেয়ে ছিল, তার মেঝেটা ছিল সম্পূর্ণ ভেজা এবং জলসিক্ত। ওই জলের মধ্যেই তারা শুয়েছিল অন্যান্য খাঁচা এবং ওই ঘরটার বিভিন্ন স্থানে ভেজা এবং জলসিক্ত ছিল যার মধ্যে অন্যান্য মেয়েরা শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিল ওই ঘরটার মধ্যে ৪০ জন মেয়ে ছিল। কিন্তু ওই ঘরের মধ্যে ওই মেয়েগুলিকে দেখাশোনা করার জন্যে একজনও ছিল না ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল বন্ধ দরজার পাশে একজন মহিলা কারারক্ষী বসেছিল। ওই ঘরে যেভাবে মেয়েরা জলে ভেজা মেঝেতে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে ছিল তাতে যে কোন সুস্থ লোক অসুস্থই হবে না, মৃত্যুরও সম্ভাবনা থাকে

এই ঘরটিতে যখনই ঢুকলাম দু'তিন জন নগ্ন মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘরের এক কোনায় আশ্রয় নিল। তাদের যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা এভাবে সরে এল কেন, উত্তরে ওই মেয়েরা জানিয়েছিল যে তাদের লজ্জা করছে যেহেতু তারা নগ্ন এবং তাদের কাপড় দেওয়া হয় না বলেই তাদের নগ্ন থাকতে বাধ্য হতে হয় খাঁচার মধ্যে যে মেয়েটি কাঁদছিল তাকে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে জানায়, তার প্রচণ্ড শীত করছে সে বারবার কাপড় চাওয়ার জন্য মহিলা কারারক্ষীরা তাকে মারধোর করেছে এবং খাঁচায় আটকে রেখেছে।

খাঁচাগুলি এতই ছোট তার মধ্যে একটা লোক ভালভাবে শুতেও পারে না। উন্মাদদের লজ্জাবোধ আছে এটা স্পেশাল অফিসারের জানা ছিল না এবং এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ওরা আসলে উন্মাদ নয়। এর পরে যেদিন ওই ঘরে আবার গিয়েছিলাম, সেদিন ওই ঘরে সম্পূর্ণ নগ্ন ১৫টি মেয়ে ছিল। প্রথমদিন ৫টি নগ্ন মেয়ে যারা খাঁচায় আটকানো ছিল, দ্বিতীয় দিন তাদের কাপড় পরা অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। একটি খাঁচা বাদে সেদিন সবকটি খাঁচার দরজা খোলা থাকতে দেখা গেল। বন্ধ খাঁচার মধ্যে দু'টো মেয়ে বসেছিল, মেঝে ছিল সম্পূর্ণ ভেজা। মেয়েগুলোর গায়ে বা খাঁচার মধ্যে এক টুকরো কাপড়ও ছিল না। অসহায় দৃষ্টিতে তারা খাঁচার মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

অন্যান্য নগ্ন মেয়েরা ইচ্ছেমত খাঁচায় ঢুকছিল এবং বেরিয়ে আসছিল এবং স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছিল যারা নগ্ন ছিল না তাদের পরনে ছিল একটাই কাপড় সেটাই তারা গায়ে জড়িয়ে বসেছিল। এই মেয়েদের মধ্যে দু'তিনজন বসে বসে কাঁদছিল এবং আমাকে বলেছিল, তাদেরকে মারধোর করা হয়। প্রয়োজনীয় কাপড় এবং খাবার দেওয়া হয় না, তাদের জন্যে বরাদ্দ সবকিছুই, এমন কি কাপড় চোপড় পর্যন্ত, মহিলা কারারক্ষীরা বাড়ি নিয়ে যায়।

এই ঘরের বেশ কিছু মেয়ের গায়ে মারধোরের রক্তাক্ত চিহ্ন এবং গায়ে চর্ম রোগের চিহ্ন দেখা গেল একটা মেয়ে যে মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসেছিল, তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় সে যখন মুখ তুলে আমার দিকে তাকায় তখন তার চোখের আশেপাশে ঘা এবং তার জন্যে সে ভালোমত তাকাতে পারছিল না। জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে, চোখ মুখ ধোওয়ার জন্যে যথেষ্ট জল তারা পায় না এবং বলা সত্ত্বেও তাদের ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করা হয় না। যাদের চর্মরোগ আছে তারা জানায় তাদের এ জন্য কোন ওষুধও দেওয়া হয় না, অথবা ডাক্তার দেখে না। এবং তারা স্নান করার জন্য জল পর্যন্ত পায় না বলেই এই চর্মরোগ

যে ঘরটাকে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং যে ঘরটায় বেশ কিছু সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়ে ছিল এই দুটো ঘর ছাড়াও এন-সি-এল এফ) ওয়ার্ড—এ আরও দু'টো ঘর ছিল। সেই ঘর দু'টোতে যতবার গিয়েছি, দেখেছি, মেয়েরা লাইন দিয়ে মেঝেতে বসে আছে তাদের প্রত্যেকের সামনে ছিল একটা থালা। কয়েকটা মেয়ের সামনে ছিল একটা করে কম্বল এই কম্বলগুলি সামনে ভাঁজ করে রেখে তার ওপর থালা রেখে তারা আমাদের জন্য বসে থাকত কয়েকজনের মাত্র কম্বল ছিল বেশিরভাগ মেয়েরই কম্বল ছিল না। এর কারণ জানতে চাইলে মহিলা কারারক্ষীরা জানায়, কম্বলগুলি অন্য জায়গায় রাখা আছে। যে জায়গায় কম্বলগুলি রাখা আছে, সেখানে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কয়েকটা ছেঁড়া কম্বল জড়ো করে রাখা হয়েছে। একটা কম্বল হাতে নিতেই দেখা গেল, তার মধ্যে এক ধরনের বড় বড় পোকা তারপরে এন সি এল

(এফ)-এর যারা বসেছিল তারা বলল, ওই শতচ্ছিন্ন কম্বল ব্যবহার করলে গায়ে ঘা হয় তারা চাইলেও ভাল কম্বল দেওয়া হয় না। সমস্ত কম্বল ফিমেল ওয়ার্ডাররা বাড়িতে নিয়ে যায় ৫ জন এন সি এল (এফ) গায়ের কাপড় সরিয়ে দেখাল, তাদের গায়ে ঘা ১ জন এন সি-এল (এফ) দেখাল তার মাথায় ঘা কাউকেই এজন্য কোন ওষুধপত্র দেওয়া হয় না। এই ঘরেও এইসব এন-সি এল (এফ দের দেখাশোনা করার জন্য একজন দণ্ডপ্রাপ্ত কিশোরীকে রাখা হয়েছে পাশের ঘরেও এন-সি এল (এফ) দের দেখাশোনা করার জন্য একজন দণ্ডপ্রাপ্ত কিশোরীকে রাখা হয়েছে প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে এন-সি এল (এফ) দের একটা তালিকা দেয় এই তালিকা থেকে দেখা যায় ১৩ ৯ ৯০ তে প্রেসিডেন্সি জেলের এন-সি-এল (এফ) ওয়ার্ডে ২২০ জন মেয়ে ছিল। এই তালিকার ক্রমিক নং ১৪, ১৫, ২২, ৯৪, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, মেয়েরা কবে জেলে এসেছে সে তথ্য তালিকায় দেওয়া নেই, এ ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা বলেন— অনেকদিন ধরে এইসব মেয়েরা জেলে আছে, তাই তাদের কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং এজন্য তাদের পক্ষে এইসব মেয়েরা কবে জেলে এসেছে সে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। যদিও জেল কর্তৃপক্ষ সাতটি মেয়ের জেলে ঢোকার তারিখ আমাকে সরবরাহ করেনি তথাপি জনৈক কারা-কর্মচারি আমাকে জানায় যে উক্ত সাতজন মেয়ে ৩০ বছর বা তার বেশিদিন ধরে জেলে আছে। স্পেশাল অফিসার হিসেবে আমি তখন অনুসন্ধান শুরু করি সর্বাধিক বেশিদিন কোন মেয়েটি এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ডে আটকে আছে সে বিষয়ে জানতে। জনৈক কারা কর্মচারি জানায় সর্বাধিক বেশিদিন জেলে আটকে আছে ক্রমিক নং ১৪। বাসন্তী কাহার বাসন্তী কাহার জেলে আছে ২৫ ৬ ৫৬ থেকে। মানে প্রায় ৩৫ বছর সে জেলখানায় আছে আরও একটি মেয়ে জেলে আছে, তার ক্রমিক নং ৫৫ এবং সেও ৩৫ বছর জেলে আটক আছে প্রায় পঁচিশ বছর জেলে আটকে আছে ৯ জন। এদের ক্রমিক নং ২৫, ৪২, ৬১, ৮৩, ৯২, ১১৭, ১৫০, ২১০, ২১৯ ২০ বছর বা তার বেশি দিন জেলে আছে ৯ জন মেয়ে ক্রমিক সংখ্যা-- ১১, ১৮, ২৪, ৪৫, ৫৯, ৬১, ৬৩, ২০৮, ২১৮।

এদের প্রত্যেককেই ১৩ ১৪ নং ইন্ডিয়ান লুনাসি অ্যাক্ট-এ আটকে রাখা হয়েছে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ১৩/১৪ নং লুনাসি অ্যাক্টে মেয়েদের আইনত জেলে রাখা যায় না। আর কোন আইনেই সরকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটি মেয়েকে জেলে আটকে রাখতে পারে না আমাদের মনে রাখতে হবে, এরা কেউ অপরাধী নয়। তবুও দেখা যাচ্ছে খুনের আসামীও মেয়াদ শেষে মুক্তি পাচ্ছে কিন্তু এইসব নিরপরাধ মেয়েরা বছরের পর বছর জেলখানায় পড়ে থাকছে এটা নারীর অধিকারের নয়, এটা মানবাধিকারের প্রশ্ন এবং একই সঙ্গে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন সরকার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে এই মেয়েদের জেলখানায় আটকে রেখেছে। এই মেয়েদের নিয়তি একমাত্র মৃত্যু কেউ জীবিত অবস্থায় এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। এই জেলখানাগুলো আসলে কসাইখানা, যেখানে প্রতিনিয়ত মেয়েদের জবাই করা হচ্ছে কোন সভ্যসমাজে মেয়েদেরকে এভাবে জেলখানায় আটকে রেখে ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার বর্বর প্রথা চালু থাকতে পারে তা বিশ্বাস করা শক্ত সংবিধান যখন তৈরি হয়েছিল তখন বিচার বিভাগকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছিল যাতে কেউ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে না পারে প্রয়োজনে বিচার বিভাগ এ ধরনের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে পশ্চিমবঙ্গে জেলে যেভাবে তথাকথিত উন্মাদ আইনের দোহাই দিয়ে সরকার মেয়েদের জবাই করছে এটা ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে আদালতের হস্তক্ষেপের একটা যথার্থ ক্ষেত্র এই সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মৌলিক অধিকার খর্বের দায়ে এখনই অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

এই স্পেশাল অফিসারকে জেলকর্তৃপক্ষ ১৯৮৯ এবং ১৯৯০-এর মৃতাদের যে তালিকা দিয়েছিল তার মধ্যে সুস্পষ্ট কারচুপি রয়েছে। এই দুই বছরে অনেকগুলি মেয়ের মৃত্যু ঘটেছে যেখানে ডাক্তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'অপুষ্টিজনিত মৃত্যু' এই স্পেশাল অফিসারকে যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তাতে কোথাও অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর কথা উল্লেখ ছিল না কিন্তু অরিজিনাল ডেথ সার্টিফিকেট যখন দেখতে চাওয়া হয়েছিল তখন এই স্পেশাল অফিসার অবাক হয়ে দেখেন ১৯৮৯ সালে মৃতাদের তালিকায় ক্রমিক নং-১ বীনা ঘোষের মৃত্যুর কারণ 'লো জেনারেল কণ্ডিশন' ক্রমিক নং ৩ শুক্লা বালা-'ডেথ ডিউ টু ম্যালনিউট্রিশন' ক্রমিক নং ৮ পদ্মা ভক্ত-'ডেথ ডিউ টু অ্যানিমিয়া' ক্রমিক নং-১০-'ডেথ ডিউ টু লো জেনারেল কণ্ডিশন', ক্রমিক নং-৯ রশিদা-'ডেথ ডিউ টু লো জেনারেল কণ্ডিশন' লেখা আছে।

১৯৯০ সালে মৃতাদের তালিকায় ক্রমিক নং ১ ইন্দ্রাণী দাস---'ডেথ ডিউ টু ম্যালনিউট্রিশন' ক্রমিক নং-৫ গীতা রানী কুণ্ডু 'ডেথ ডিউ টু লো জেনারেল কণ্ডিশন' ক্রমিক নং ১৩ পার্বতী দেবী 'ডেথ ডিউ টু লো জেনারেল কণ্ডিশন' লেখা আছে।

এটা জেল কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মনে করার কারণ নেই। জেল কর্তৃপক্ষ অরিজিনাল ডেথ সার্টিফিকেটকে বিকৃত করে স্পেশাল অফিসারকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা লিখিত তথ্য সরবরাহ করেছিল যাতে তাদের গাফিলতি স্পেশাল অফিসারদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এই স্পেশাল অফিসার এর আগে ডাঃ কোশি মিত্র, চিত্রা সেনগুপ্ত, একজন প্রধান শিক্ষিকা এবং ইলা পাল বলে তিনজন সুস্থ মহিলাকে, যাদের পাগল বলে আটকে রাখা হয়েছিল, তাদের মুক্ত করেছে। প্রেসিডেন্সি জেলের কর্মী জনৈক রামদুলারীর বিরুদ্ধে জেলস্থিত নিরাপরাধ বন্দিনী চাম্পুয়াকে অসৎ উদ্দেশ্যে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে বিচারাধীন যার এজাহার করেছিলেন, এই স্পেশাল অফিসার তাকে প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ কখনোই সহযোগিতা করবে না এটা প্রত্যাশিত তাই প্রথমদিন জেলার এই স্পেশাল অফিসারকে বলেছিলেন "আপনি ভেতরে গেলে আমরা নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারব না।"

এই স্পেশাল অফিসার এন-সি এল (এফ) ওয়ার্ড দেখতে গেলে তার নজরে পড়েছে অন্তত ২৫ জন মেয়ের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক এবং যে কোন মুহূর্তে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। এরা প্রত্যেকেই মাটিতে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিল, কাতরাচ্ছিল এবং স্পেশাল অফিসার-এর কোন প্রশ্নের উত্তর এরা দিতে পারেনি। মহিলা কারারক্ষীদের জিজ্ঞাসা করায় তারা যে নাম সরবরাহ করে তা নিম্নরূপ :--

১) সবিতা বর্মা
২) শিউলি রানী চন্দ্র
৩) বাসন্তী কাহার
৪) বীনাপানি দাস
৫) তাপসী দেব
৬) পারুল রানী চন্দ্র
৭) গীতা রানী শর্মা
৮) মুগল রানী সাহা
৯) সীমা পাল
১০) নমিতা মণ্ডল
১১) সন্ধ্যা বিশ্বাস
১২) সুখজান বিবি
১৩) সতী রানী
১৪) গীতা চৌধুরী
১৫) শৈল মাণিক
১৬) ইন্দুমতী দত্ত
১৭) প্রভাবতী
১৮) চিঙ্কু দাস
১৯) যামিনী পাল
২০) সন্ধ্যা গাঙ্গুলি
২১) আমানি
২২) রানী
২৩) বরূপ বিবি
২৪) নলিনী বালা সা
২৫) কমলা

এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধের অভাবে ইতিমধ্যেই টি-বি- রোগে আক্রান্ত

আপনার শিশুর বাড়বৃদ্ধির জন্যে স্বাদভরা ফল।
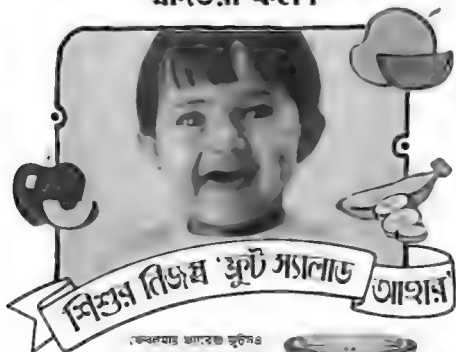
কেবলমাত্র ফ্যারেক্স ফ্রুটস-এ
রয়েছে আপেল, আম ও কলার
যাবতীয় গুণ – সেইসঙ্গে আছে সুজানা ও
দুধ। [illegible]
আহার যা বাচ্চারা ভীষণ ভালবাসে।

নিয়মিত প্যাকের চেয়ে
১০০ গ্রাম বেশী।

ফ্যারেক্স-ফ্রুটস
বেড়ে ওঠার স্বাদভরা উপায়।

অঞ্চলের যে সমস্ত শ্রমিকদের থাকার জায়গা নেই, তাঁদের দৈনিক দু টাকায় ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করা কে কি বলবে? যারা বলবে তারা তো ডাকাত। চোরের বিচারক ডাকাত। তাই ইউনিয়ন নির্বাচনে যখন দুপক্ষ আমার কাছে এলেন, দু তরফই দাবি করলেন, তাঁরা 'দুনম্বরী' বন্ধ করে দেবেন। আমি তাঁদের বললাম, 'না, এতে আমি নেই, যে পক্ষ পোস্টার দেবে সকলের চুরি করার সমান অধিকার আছে তাদের পক্ষে আমি' প্রত্যেকের চুরি করার অধিকার স্বীকার করলেই যদি নিজেরা মারামারি করে চুরি বন্ধ করে। এরকম ঘটনাও মাঝে মাঝে যে ঘটে না, তা নয়, ঘটে ··

বামফ্রন্ট এখানে এক অদ্ভুত রাজনীতি চালাচ্ছে। ইন্দিরা ওপর থেকে এমার্জেন্সি চালু করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল। বামফ্রন্ট সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করছে যে জনগণের মধ্যে থেকেই দাবি উঠুক—এর চেয়ে এমার্জেন্সি ভাল। এমার্জেন্সির গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে ইন্দিরা মানুষকে সংগঠিত হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ঘৃণাই কুড়িয়েছে, এঁরা সংগঠনের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না করে অধিকার দিয়েছে, সংগঠিতভাবে লুট কর, ফলে কর্মচারীদের বেশির ভাগ অংশই দাবি তুলছে, ইউনিয়ন ভেঙে দাও! ইউনিয়ন বা সংগঠন হল দুনম্বরীদের আখড়া ইন্দিরা শত চেষ্টা করেও যেটা পারে নি, এরা কৃতকার্যতার সঙ্গে সেটা করছে।

'শম্ভু-রূপে' ইন্দিরা-ধন্য এঁরা!

অসুস্থ কয়েদীদের দুধ-চিনি-চা-ডিমে চলছে রমরমা সিপাহী ক্যান্টিন অথচ বন্দীরা যখন বলেন 'আমাদের ডায়েট কেটে বন্যাত্রাণ তহবিলে পাঠানো হোক' তখন আসে আইনের কথা! শিবঠাকুরের 'একুশে আইনের দেশে' সবই সবমেনে ব্যাপার!

জেলে বসে তাই ভাবছি, 'কে চোর? কে অপরাধী? কে বেশি মানুষ? যাঁরা নিজেদের খাবার কেটে বন্যাত্রাণে টাকা দিতে চান তাঁরা, না যাঁরা সেগুলো ঘুরিয়ে সুদে টাকা খাটান, ব্যবসা করেন এবং যাঁরা তাঁদের মদত দেন, তাঁরা? শেষ বিচারের বিচারকরা কি বলেন দেখি! জেল-বিবর্তনের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে জেলকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে—

প্রথম যুগে বলা হতো প্রতিশোধাগার,
তারপর হলো প্রায়শ্চিত্তাগার
তারপর হলো কারাগার
এখন আবার সংশোধনাগার!

পুরনো-পচা জামায় নতুন কাপড়ের তালি মারতে গিয়ে সবসুদ্ধ খসে পড়ছে! যে নামেই ডাক না কেন, জেল আছে জেলখানাতেই!

এরকম অবস্থাতে আমার জেলে আসাটাই যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই যারা 'ভয়ে' অথবা 'সততা'র জন্য জেলখানার এই 'জেল চুরি' বন্ধ করতে চান তাঁরা উৎফুল্ল। 'এখন যদি ওরা একটু সমঝে চলে' এঁরা সংখ্যায় বেশি যাঁরা সরাসরি যুক্ত তাঁদের ভাবখানা—'এই রে শালা, না মরে আবার জ্বালাতে এলো! একটু এড়িয়ে চলাই ভালো!' এই এড়াতে গিয়ে একজন ধরিয়ে দিলেন আর একজনের ওষুধের প্রেসক্রিপশন—প্রায় ৬০০ টাকার ওষুধ।

প্রত্যেকেরই দাবি 'এর একটা বিহিত করুন!'

ওদের বোঝালাম, 'ডাকাত ধরতে ব্যর্থ হয়ে শেষে চোরের পেছনে কাঠি দিতে হবে? ওর মধ্যে আমি নেই' ৩৮০ কোটি টাকা যেখানে তছরূপ হচ্ছে সেখানে ৩৮০ টাকা তো কোন ছার!'

নরেন হাঁসদা

> বামফ্রন্ট এখানে এক অদ্ভুত রাজনীতি চালাচ্ছে। ইন্দিরা ওপর থেকে এমার্জেন্সি চালু করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল। বামফ্রন্ট সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এমন অবস্থা তৈরি করছে যে জনগণের মধ্যে থেকেই দাবি উঠুক-এর চেয়ে এমার্জেন্সি ভাল! এমার্জেন্সির গণতন্ত্রীকরণ হচ্ছে।

এই ওষুধ ব্যাপারটা জেলখানায় একটা সমস্যা জেল হাসপাতাল বন্দীদের জন্য, না, স্টাফদের জন্য এ প্রশ্ন সমাধান না হলে অসুস্থ বন্দীরা মরতে থাকবেই, কোনো ডাক্তারই জেলে টিকতে পারবে না, ওষুধের দোকানগুলোর কন্ট্রাক্ট থাকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র জেল—স্টাফরাই সপরিবারে বিনা খরচে চিকিৎসা পাবার সুবিধা পেয়ে থাকেন, এবং এর কোনো উচ্চ সীমা বাঁধা নেই। জেল-স্টাফরা এ সুযোগ গ্রহণ করেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। ওরা ডাক্তারবাবুকে নির্দেশ দিয়ে ওষুধ লেখান সেই প্রেসক্রিপশন জেলনির্দিষ্ট দোকানে জমা দিয়ে (শতকরা বিশ টাকা কমিশন ছাড়া) নগদ টাকা নিয়ে আসেন। ডাক্তারের ঘাড়ের ওপর বাড়তি মাথা তো নেই যে তাঁরা স্টাফদের মর্জি-মাফিক ওষুধ লিখবেন না। এই যন্ত্রণায় কেউ আর জেল হাসপাতালে চাকরি নিতে চান না। মস্তানির হুমকি, আর অপমানের ভয়ে তাঁদের অবিবাহিত যুবক স্টাফের জন্যও একেবারে বিশটা ই-পি-ফোর্ট লিখে দিতে হয়। ই-পি-ফোর্ট হচ্ছে গর্ভসঞ্চার সংক্রান্ত ট্যাবলেট বাজারে নাকি খলাকে বিক্রি হচ্ছে। ভাবতে পারা যায় একই প্রেসক্রিপশনে ডুরাবলিন, ডেকাডুরাবলিন, কাইমোরাল ফোর্ট? কিম্বা হেপাটাইটিসের জন্য কিলো কিলো গ্লুকোজের সাথে দশ-দশ 'কামপোজ'? কোনো ডাক্তারই হেপাটাইটিসে 'কামপোজ' দিতে চাইবেন না, ওটা 'ধর্মীয় নিষিদ্ধ'। কিন্তু এখানে না দিয়ে উপায় আছে? তাঁরা ডেভিড্‌সন সাহেবকে মাথায় তুলে রেখে শুধু লিখে যান, তাঁরা ডাক্তার নন, ইউনিয়নের দাদাদের অর্ডার ক্যারিয়ার কেরানি মাত্র। তাঁকে এক সিপাইবাবুর মায়ের জন্য (৬২ বৎসর বয়স্কা) ফার্টাইল ট্যাবলেট লিখতেই হবে, কারণ তিনি 'দাদা' কে ডাক্তারি করবে। মনক্ষুণ্ণ ডাক্তার বড়জোর হেসে বলতে পারেন, 'আপনার মায়ের কি এখনও সন্তান দরকার!'

'এর ফলে জেলারের ভাষ্য অনুযায়ী গত মাসে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা ওষুধের বিল হয়েছে! তাই বন্দীরা ওষুধ পাবেন না। জেলারকে চালেঞ্জ জানালাম এর কতটা সিপাহীদের জন্য ব্যয় হয়েছে জানান। উনি বলেন, এক লক্ষ পনেরো হাজার। বাকি পনেরো হাজার টাকা, এক হাজার বন্দীর জন্য খরচ। মানে দৈনিক ৫০ পয়সা, এর মধ্যে আবার আমার মত প্রিভিলেজড় বন্দীও আছেন, তাহলে প্রায় সাড়ে ন'শ বন্দীর জন্য মাথা পিছু বরাদ্দ ২৫-৩০ পয়সারও কম! জেলর থতমত খেয়ে বললেন, কি করব বলুন, আমরা তো কতবার বলেছি, স্টাফদের পুলিশ হাসপাতালের সাথে যুক্ত করা হোক। তা কর্তারা শুনছেন কোথায়? কর্তারা শুনছেন না—সুতরাং বন্দীগুলোই মরুক! অদ্ভুত রাজনীতি মুখ্যমন্ত্রী শিউরে উঠছেন, না, মুচকি হাসছেন, তারাপদ লাহিড়ির (জেল উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কয়েক বছর আগে তারাপদ লাহিড়ি কমিশন গঠন করেছিলেন) চিতাভস্ম দিয়ে চিকিৎসা চলুক বন্দীদের।

হতভাগ্য বন্দী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ৭০ থেকে ৮৯, ১৮ বছরেরও বেশি সময় অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে জেল খেটেছি, ডাণ্ডাবেড়ী পরে পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা লক-আপে থেকেছি, তার ওপর ছিল প্রতিটি স্মৃতি বিজড়িত দিনে পাঁচ-হাতি-ডাক্তার ঝাড়। ১ মে (মে দিবস), পয়লা অক্টোবর (চীনা-বিপ্লব দিবস), ৭ নভেম্বর (অক্টোবর-বিপ্লব দিবস), ২২ এপ্রিল (লেনিন জন্ম দিবস), এ সমস্ত দিনগুলো এলেই জেল হাসপাতাল খালি করে দেওয়া হত। হাত-পা ভাঙা,

মাথা ফাটা 'নকশাল' বন্দীতে হাসপাতাল ভর্তি হয়ে যেত। এত নির্যাতন সত্ত্বেও জেলকে কোনো সময় খাঁচা মনে হয়নি কারণ দুটো। আমরাও তো আর হাত তুলে মার খেতাম না, হাতের কাছে যা পেতাম তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নিজেরা জেলে এসেছি বলে তো আর হাত আর মাথাটা স্টেট ব্যাংকে সুদে জমা দিয়ে আসি নি। আমাদের এই অদৃশ্যপূর্ব লড়াই শত্রুপক্ষেরও শ্রদ্ধা কেড়ে নিয়েছিল। শত্রুপক্ষেও ছিল 'বীর পুজো'র দল। তাঁরা 'ত্যাগে'র এবং 'দৃঢ়তা'র প্রতি সম্মান জানাতে জানত। কারণ তারা ছিল যথার্থই যোদ্ধা একজন যোদ্ধা, অন্য যোদ্ধাকে সাধারণত সম্মানই করে থাকে. লড়াইয়ের ময়দানে শত্রুকে পরাজিত করতে হবে কিন্তু তার বীরত্বের জন্য প্রাপ্য সম্মান দিতে তারা কুণ্ঠিত হত না। তারা চরিত্রহনন, ব্ল্যাক-মেল, এগুলোকে ঘেন্না করত। আমাদের ব্যাপারগুলো আমরা লড়াইয়ের ময়দানেই ফয়সালা করে নিতাম, এটাই ছিল সে যুগের এথিক্স। অনেকেই ভাবতে পারেন এ তো মধ্যযুগীয় শিভালরি। হ্যাঁ

> **এত নির্যাতন সত্ত্বেও জেলকে কোনো সময় খাঁচা মনে হয়নি। কারণ দুটো। আমরাও তো আর হাত তুলে মার খেতাম না, হাতের কাছে যা পেতাম তাই নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নিজেরা জেলে এসেছি বলে তো আর হাত আর মাথাটা স্টেট ব্যাংকে সুদে জমা দিয়ে আসি নি।**

এই 'শিভালরি' ছিল বলেই সে যুগ অমন মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের জন্ম দিতে পেরেছিল। সেটা ছিল বলা যায় শাসক শ্রেণীর কাছে ব্রিটিশ এথিক্স মেনে চলার সময়

এখন এসেছে আমেরিকান এথিক্স মেনে চলার সময়। হাতে মারার জায়গা নিয়েছে ভাতে মারা, লড়াইয়ের ময়দানে ফয়সালা করার জায়গা নিয়েছে ষড়যন্ত্র বুদ্ধির লড়াইয়ের বদলে এসেছে কুৎসা, চরিত্রহনন, ব্ল্যাক মেইলিং। অদ্ভুত এক সন্দেহ-বাতিক মানসিকতা। প্রত্যেকে, প্রত্যেককে সন্দেহ করছে এবং এটা ছড়ানো হচ্ছে ওপর থেকে। তার ফলে তারা নিজেরাও সন্দেহের শিকার হয়ে পড়ছে। অসুস্থ আবহাওয়া, অসুস্থ পরিবেশ, দম বন্ধ হয়ে আসা বাতাবরণ। মন্ত্রীরা সরাসরি ইউনিয়নের মাধ্যমে ফরমান জারি করছেন। ফলে জেলর-সুপার বন্দীদের কথা ভাববেন কখন? ইউনিয়নের আর্জি এবং দাবি শুনতেই তাঁদের সময় চলে যায়।

'দরবারে হেরে বউকে ধরে মারে' জেলর-ইউনিয়নের সাথে না পেরে উঠে যত কড়াকড়ি

গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের সাক্ষাৎকার

আলোকপাত: পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্তে মুক্তির দাবীতে একটি ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এই ফোরামের নেতৃত্বে কারা আছেন?

সুজাত ভদ্র: গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) এই আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছে এবং আমিই এই সমিতির সম্পাদকের দায়িত্বে গত চার বছর আছি এ পি ডি আর-কে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবি ও কয়েকটি প্রগ্রেসিভ রাজনৈতিক দল।

আলোকপাত: গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ পি ডি আর) কবে এবং কোন উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছিল?

সুজাত ভদ্র এ পি ডি আর ১৯৭২ সালে গঠিত হয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্দী মুক্তি আন্দোলন ও পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াই-এর মূল বিষয় ছিল ভারতের গণতন্ত্রের স্বরূপ ও পুলিশি অত্যাচারে জেলের ভিতর মৃত্যু ইত্যাদি ইস্যুকে কেন্দ্র করে. কিন্তু ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা কালে কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য সরকার আমাদের এই আন্দোলনকে নিষিদ্ধ করে কিন্তু সাতাত্তরে জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পর আমাদের কাজের পরিধি বেড়ে গেল তখন সামাজিক নানা সমস্যার কথা ভাবতে লাগলাম

আলোকপাত: আপনাদের অর্থাৎ এ পি ডি আর-এর কাজের পদ্ধতি কি শুরু থেকে একই

সুজাত ভদ্র

Association for Protection of Democratic Rights

ম্যান্ডেলাকে সুজাত ভদ্রের চিঠি

ভাবে এগিয়ে চলেছে?

সুজাত ভদ্র - না। বিরাশি থেকে লাগাতার ভাবে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাই। এবং তখনই সেকেণ্ড, সি সি, ক্র্যাকসান ধরা পড়ে। মূলত রঞ্জিত মজুমদারের নির্দেশে আমাদেরই সহযোদ্ধা নদীয়ার অর্জুন রাজয়াকে প্রকাশ্যে গাছে বেঁধে অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং সে মারা যায় তৎক্ষণাৎ। অষ্টাশিতে ওই নদীয়াতেই তিনজনকে গুলি করে মারা হয়। এদের অন্যতম দুজনের নাম বরকত ও জয়দেব সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল কোন কিছুই নিষিদ্ধ ঘোষণা না করেই মারা হল কোন যুক্তিতে আমরা আজও তা ভেবে পাই না।
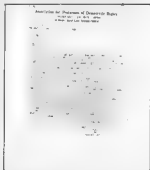
আলোকপাত: এই বাংলায় বৃটিশ আমলের জেল কংগ্রেস জামানার জেল এবং আজকের বামফ্রন্টের জেলের মধ্যে কোন কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করছেন কি?

সুজাত ভদ্র: না, তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। জেলের চেহারা একই রকম আছে। শুধু যা রকমফের। জেলের মধ্যে যে আর এস পি ইউনিয়ান আছে তাদের যাট ভাগ লোক দুর্নীতিগ্রস্ত। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৭৯তে তারাপদ লাহিড়ী কমিটির

করেন বন্দীদের ওপর। ফলে বন্দীরা দ্বৈত শাসনের বলি। ইউনিয়নের শাসন, জেলর-সুপারের শাসন। বর্তমানের জেলর-সুপারদের দেখলে করুণা হয় এক ইউনিয়নের এক নেতা সুপারকে সম্বোধন করলেন, 'যা বে শালা ঘরে ঢোক'। সুপার বেচারা কোন ইউনিয়নের কথা শুনবে মুখ্যমন্ত্রীর (জ্যোতি বসু) ইউনিয়ন, না জেলমন্ত্রীর (বিশ্বনাথ চৌধুরীর) ইউনিয়ন জেলমন্ত্রীর ইউনিয়ন এই জেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ, স্বরাষ্ট্র-সচিব, অর্থ-সচিব সব আটকে দিচ্ছে।

টাকার বা জীবন মানের ভিত্তিতে নয়, এখানে তো শ্রেণী (!) বিশ্লেষণ করতে গেলে নির্যাতনের ভিত্তিতে করতে হবে দেখছি। আর্থিক উপার্জনেই বা এক একজন জেল-সিপাহী নেতা একজন জেলর (সৎ বা ভীরু অথবা ভদ্র) থেকে কম কিসে! মার্কসবাদের সমস্ত শিক্ষা পালটে যাবার জোগাড় হয়েছে দেখছি দুই ইউনিয়ন যদি শুধু নিজেদের মধ্যেই লড়াইটা সীমাবদ্ধ রাখত তা হলেও

> জেলর-সুপারদের দেখলে করুণা হয়। এক ইউনিয়নের এক নেতা সুপারকে সম্বোধন করলেন, 'যা বে শালা ঘরে ঢোক'। সুপার বেচারা কোন ইউনিয়নের কথা শুনবে। মুখ্যমন্ত্রীর (জ্যোতি বসু) ইউনিয়ন, না জেলমন্ত্রীর (বিশ্বনাথ চৌধুরীর) ইউনিয়ন।

বুঝতাম! তারা বন্দীদের নিয়েও টানা-হেঁচড়া শুরু করে দিয়েছে। এতে বন্দীদের মধ্যকার সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছে। ইউনিয়নগুলো সোজাসুজি চলছে পুলিশের নির্দেশে। আই পি এস সংগঠন পরিষ্কারভাবে জেলকে সিভিল-শাসন থেকে পুলিশি শাসনে আনতে চায়, এরই জন্য সব সময় তারা জেলে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সিভিলিয়ানদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা প্রমাণ হয়। দুই ইউনিয়নের মধ্যেই কিছু পরিচিত পুলিশি এজেন্ট আছে, তেমনিই আছে বন্দীদের মধ্যেও তাদের তল্পিবাহক। জেলর-সুপার এই ত্রিমুখী চাপে হতভম্ব। সামান্যতম সিদ্ধান্ত নিতেও অপারগ তাই কোনো জেলে সুপার (যেমন দমদমে) পুলিশের ১১২ টাকার মাইনের ইনফরমারের মত কাজ করেন। কলকাতার বাইরের একটি জেলের সুপার যেমন মহান দায়িত্ব নিয়েছেন বন্দীদের মধ্যে এবং সিপাহীদের মধ্যে সরকারের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করাবেনই। অথচ তিনি রাজনীতির কিছুই জানেন না বোঝেন না, সুতরাং কিছু

রিপোর্ট এবং ১৯৮০ সম্পূর্ণ রিপোর্টে জেলের পরিস্থিতি নিয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার ছোটখাটো দু একটা সুপারিশ কার্যকর হওয়া ছাড়া আজ দশ বছরে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি এর আগেও একবার কংগ্রেসি আমলে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে সুখময় দত্ত কমিটি গঠন করে জেলের পরিস্থিতি নিয়ে উন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। তখন তারাও ভ্রূক্ষেপ করে নি। লাহিড়ী কমিটি এও সুপারিশ করেছিল জেল কোডে কারা রাজনৈতিক বন্দী তাদের একটা চ্যাপ্টার যোগ করতে কিন্তু আজও তা কার্যকর হয়নি। তিরিশ দশকের বামপন্থী আন্দোলনের ধারা অনুযায়ী ১২১ এ আই পি সি (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা) এই ধারায় অভিযুক্ত করা হয় যদিও তার সঙ্গে অন্যান্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল

আলোকপাত: আজকের জেল সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি?

সুজাত ভদ্র: আবার বলি, লাহিড়ীর প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছিল——ক্রমপর্যায়ে একশ বছরের সাব জেলকে ভেঙে ফেলে সংস্কার করা হবে এবং জেলের ভেতরে যে অব্যবস্থা চালু আছে তা দূর করতে হবে কিন্তু সংস্কার তো দূরের কথা, দুর্নীতি দিনের পর দিন চরম রূপ নিচ্ছে। মূলত দুটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দুর্নীতি চলছে ওষুধ এবং খাদ্যে। এই অবস্থার জন্য দায়ী কনভিক্ট অফিসার। এই পদটিও তুলে দেওয়ার সুপারিশ ছিল। কিন্তু আজও তা বহাল আছে বর্তমানে একটা জিনিস অবশ্য বন্ধ হয়েছে তা হল বন্দীদের পায়ে বেড়ী পরানো আগে যে হারে শারীরিক নির্যাতন হত এখন সেটা কিছুটা কমেছে। তবে এখনও রিলিজ অর্ডার এলে চেপে দেওয়া হয় সোসাল ওয়েলফেয়ার অফিসার এই খেলা খেলে প্রচুর টাকা পয়সা দাবী করেন এমন কি সোনাদানার বিনিময়েও রিলিজ করে থাকেন

আলোকপাত: এই অবস্থার বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হচ্ছেন না কেন?

সুজাত ভদ্র: দেখুন আমাদের কাছে লিখিত কোন প্রমাণ নেই তবে এই হীন নিচ কাজে তারা যে লিপ্ত এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অমানবিক ভাবে এরা অনেক কিছুই করতে পারে। এমন কি বন্দীদের যে বরাদ্দ বিস্কুট দেওয়া হয় তা থেকে তারা দু একটা বাঁচিয়ে রাখেন কারণ তাঁদেরই ছোট ছেলেমেয়েরা যখন দেখা করতে আসে বাবার সঙ্গে তাদের হাতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দেখা গেছে সেই বিস্কুট অমানবিক ভাবে জেলের সোসাল ওয়েলফেয়ার অফিসার কেড়ে নিয়েছে। এরপরও কি বলতে হবে এই দেশের জেল ব্যবস্থার আদৌ কোন সুরাহা হতে পারে তবে আমরা এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও জনমত সংগঠিত করতে চলেছি অনেক ক্ষেত্রে আমরা আন্দোলনেও নেমেছি দেখা যাক পরিস্থিতি কি হয়।

আলোকপাত: এখনও এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলে বিনা বিচারে তথ্যানুযায়ী প্রায় ছাব্বিশ জন নকশালপন্থী রাজনৈতিক বন্দী জেলে বন্দী রয়েছেন। এঁদের সম্পর্কে আপনারা কি ভাবছেন?

সুজাত ভদ্র: গত ১৪ ও ২০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য অনুসারেই আজও পশ্চিমবাংলার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, বহরমপুর, কোচ-বিহার ও মালদা জেলে ২৬ জন রাজনৈতিক বন্দী বিচারাধীন অবস্থায় দুবছর থেকে নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে আটক। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গড়ে ৪.৫টি মামলায় কোন চার্জসিট দেওয়া হয় নি। এমন কি শুনলে অবাক হবেন যে হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ গত ২১ সেপ্টেম্বর ও ৬ অক্টোবর বন্দী গৌতম চক্রবর্তী ও কেলটি মুর্মুকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে, '৮৩ সালে গৌতমের বাঁ চোখ ভেদ করে যে গুলি মাথায় ঢুকেছে তা বের করার জন্যে আজ পর্যন্ত কোন যথাযথ চিকিৎসাই হয়নি পুলিশি অত্যাচারের ফলে কেলটি মুর্মুর মেরুদণ্ডের ব্যথারও কোন চিকিৎসা জেলে থাকাকালীন দীর্ঘ সাত বছরে হয়নি। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের বৃহত্তম শরিক দল—সি পি আই (এম) অতীতে বহুবার বিশেষ করে ১৯৭৪ সালে বিভিন্ন সভায় মিছিলে দাবী তুলেছিল 'দুই বৎসরের অধিক বিচারাধীন বন্দীর মুক্তি চাই।' জ্যোতি বসু, স্নেহাংশু আচার্য, সাধন গুপ্ত প্রমুখরা এই দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। আর আজকে এঁরা কি করছেন কংগ্রেসী সরকারের মতই এঁরা রাজনৈতিক বন্দীদের 'ক্রিমিন্যাল' আখ্যা দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একাধিক রায়কে উপেক্ষা করে বিনা বিচারে আটক রেখেছেন। আমরা বিস্মিত হচ্ছি এঁদের কর্মকাণ্ডে। ওঁরা কংগ্রেসীদের বুর্জোয়া বলে কিন্তু ওঁরা বুর্জোয়ার বুর্জোয়া।

ধান্দাবাজকে দলে টানার জন্য প্রচুর সুযোগ দিয়ে দল ভারী করছেন। এতে ব্যাপক অংশ নিজেদের বঞ্চিত এবং নির্যাতিত মনে করছেন। তার দলে টানার পদ্ধতিও বিচিত্র জেলের মধ্যে ড্রাগের কারবার করার অবাধ সুযোগ দান, মদের সরবরাহ এবং ইন্টারভিউ-এর সময় বাইরের দেহপসারিণী ঢুকিয়ে নিজের অফিসে কিছু লোককে যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া বর্তমান আলিপুর জেলের সুপার আধা পাগল অর্থাৎ তাঁকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দিতে চান। তাতে চলবে কি করে! তাঁদের সব কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব রাইটার্সের সরাসরি নির্দেশে বলীয়ান হয়ে তারা সুপারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর বউ-মেয়েও বেরোতে পারছে না। বেচারা বন্দীদের কথা ভাববে কখন? ফলে পাগল হয়ে যেতে বসেছে। অসংলগ্ন কথা-বার্তা, অদ্ভুত সব কাজ করে বসে।

বর্তমান আলিপুর জেলের সুপার আধা পাগল। অর্থাৎ তাঁকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অপরাধ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিদের স্বীকৃতি দিতে চান। তাতে চলবে কি করে! তাদের সব কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব রাইটার্সের সরাসরি নির্দেশে বলীয়ান হয়ে তারা সুপারের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর বউ-মেয়েও বেরোতে পারছে না। বেচারা বন্দীদের কথা ভাববে কখন? ফলে পাগল হয়ে যেতে বসেছে। অসংলগ্ন কথা-বার্তা, অদ্ভুত সব কাজ করে বসে।...

কলকাতার সব থেকে বেশি 'নিরাপত্তা'র বেড়া দিয়ে ঘেরা জেল প্রেসিডেন্সি জেল। আদিগঙ্গার পাড়ে প্রায় ১০০ একর জমিকে ১৮ ফুট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জগৎ, '৭০ এর পর আরও চার ফুট বাড়িয়ে সেটা ২২ ফুট করা হয়েছে। ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যখন পড়তে আসতাম, অবাক হয়ে পাঁচিলটা দেখতাম, মাঝে মাঝে ভাবতাম কারা থাকে কারান্তরালে? তখন কি জানতাম লাইব্রেরির মাঠের উল্টো দিকের শকটাতেই আসতে হবে আর কয়েক মাস পরে। ওটার নাম সাত-খাতা, 'খাতা' অর্থাৎ ব্লক জেলের বিচিত্র একটা ভাষা আছে মূলশব্দ ভাঙতে ভাঙতে অধিবাসীদের উচ্চারণযোগ্য হয়ে সেগুলো স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসেছে। বাইরে থেকে আমদানি করা বিভিন্ন অসামাজিক পেশার জন্যও বিভিন্ন শব্দ — টিও-বাজ (পকেটমার), পাব্বা-বাজ (চুরি), পাব্বা-ভসকানো (তালা ভাঙা), পড়ি-বাজ (স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘুমোবার ভান করে পড়ে থাকা, পরে সুযোগ বুঝে অপেক্ষারত যাত্রীর মালপত্তর নিয়ে সরে পড়া), ঝোলাবাজ (ট্রেন ছাড়ার সময় পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে সরে পড়া)। এই সমস্ত পুরনো শব্দের সাথে ষাটের দশকে নতুন কিছু শব্দ আমদানী করা হয়েছে রুটি (ক্র্যাকার), গাই (রাইফেল), বাছুর (ছোটো আগ্নেয়াস্ত্র), গামছা (তালা ভাঙার জন্য ব্যবহার করা হয় এমন রড যেটা ক্রমশ সরু থেকে মোটা হয়েছে। যেমনই তালা হোক, তালার আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দিলে লিভারটা কেটে যায়, তালা খুলে যায়)।"

এই রকম দুর্নিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে কারাগারের অন্তরালে বাম জমানায় বছরের পর বছর ধরে-দিন গুনছেন রাজনৈতিক বন্দীরা যেমন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গৌতম চক্রবর্তী, তপন কুমার দাস, জয়ন্ত দাস, অনুপ দাস, যোগেন দাস, কাবুল দে, তরুণ সাহা, সুনীল বর্মন, ননীগোপাল বর্মণ, মহেন্দ্র বৈরাগী, শুভাশিস সরকার, অরুণ হালদার, উজ্জ্বল রায়। মালদা জেলে—অনন্ত বর্মণ, উমেশ দেবশর্মা, জামির মার্ডি কোচবিহার জেলে—কামিনা বর্মণ, বহরমপুর জেলে—কবীর সেনশর্মা, কেনাটি মুর্মু, নবীন রায়, কানেশ দেবশর্মা, নিখিলেশ ভট্টাচার্য, নিত্যানন্দ সরকার, যোগেশ রায়, দীপঙ্কর সূত্রধর, সীতারাম ঘোষ।

এঁদের মুক্তির জন্য ১৯৮২ থেকে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি'। এই সমিতির বর্তমান সম্পাদক সুজাত ভদ্র জানিয়েছেন, তাঁদের এই প্রয়াসকে সফল করার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৭৯ সালের তারাপদ লাহিড়ী কমিটির রিপোর্ট ও ১৯৮০-র সম্পূর্ণ রিপোর্টে জেলের পরিস্থিতি নিয়ে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তা কার্যত ফাইলবন্দী হয়ে রয়েছে। লাহিড়ী কমিটি সুপারিশ করেছিল জেল কোডে কারা রাজনৈতিক বন্দী তাদের একটা চ্যাপ্টার যোগ করতে। কিন্তু আজও তা কার্যকর হয়নি। কেটে গেল ১৯ বছর এছাড়াও বাম জমানার আরেক কালাচার হল যে কোন অজুহাতে বিরোধী দল সংগঠনের কর্মীদের জেলে পোরা। '৯০-র গোড়ার দিকে পুরুলিয়ার আনন্দমার্গী ঘটনায় এই ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী প্যাট্রিসিয়া মাস্তেকে। এখনও এই রাজ্যের জেল হাজতে বন্দী আছেন বার্মার সামরিক শাসনের বিক্ষুব্ধ দুই গণতন্ত্রকামী যুবকনেতা তিন মে আও ও খিন কোয়াও। তাঁদের দোষ বার্মায় চলে আসা সামরিক অত্যাচারের প্রতি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁরা কলকাতার প্লেন হাইজেক করেছিলেন যদিও তা ছিল নিতান্ত শান্তিপূর্ণভাবে।

তবু অন্তত নকশাল বন্দীদের জন্য কাঁদতে বুদ্ধিজীবীরা আছেন পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ঝাড়খণ্ড পার্টির সমর্থক রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য এখন পর্যন্ত কোন অধিকার রক্ষা কমিটি বা কলমচী দাবী

সজিত ঘোষ

বিভাবসু পত্রী

চিত্তরঞ্জন প্রতিহার

কালীপদ প্রতিহার

কলারাম মাহেক

সুনীল দাস

ভৈরব টুডু

জানাননি। ঝাড়খণ্ড পার্টির কেন্দ্রিয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক ৬ জন ঝাড়খণ্ডী কর্মীর নাম দিয়ে বললেন, 'যারা বিনাবিচারে শুধুমাত্র সি পি এম-এর দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরোধিতা করার ফলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিনের পর দিন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম জেলে জেলবন্দী করে রাখা আছে—এদের বিরুদ্ধে পুলিশ অনেক কেসেই চার্জশিট দিতে পারে নি কাউকে কাউকে কোর্টে এক দু'বার তোলা হলেও সুকৌশলে বিচারে বিলম্ব ঘটানো হয়েছে সময় চেয়ে নিয়ে কিংবা এদের কেসওয়ালা পাওয়া যায় নি দেখিয়ে বিচারাধীন করে রাখা হয়েছে। এরা সকলেই ঝাড়খণ্ড পার্টির

কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী :
কিছুই কি করার নেই ?

সক্রিয় কর্মী এদের মধ্যে বাঙালি, আদিবাসী দুইই আছে। এরা হলেন ভৈরব টুডু, চিত্তরঞ্জন প্রতিহার, সুনীল দাস, সঞ্জীত ঘোষ, কালীপদ প্রতিহার এবং বিভাবসু পত্রী এরা সকলেই আঠারিয়া গ্রামের সৎ রাজনৈতিক কর্মী। পুলিশ সি পি এম-এর নির্দেশে এদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা এনেছে—চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এমন কি খুন পর্যন্ত। অথচ প্রাথমিকভাবেই প্রমাণ করতে পারবে না বলে জেলা পুলিশ বিচারের কাজ বাহানা তুলে দিনের পর দিন পিছিয়ে দিচ্ছে '

নরেনবাবু আরও জানালেন, 'হাঁা আমাদের পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একবার কিছু সময়ের জন্য ওদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলতে দিয়েছিল জেলখানার জীবনযাপন নিয়ে ওরা যা বলল তাতে তো ভয়াবহ ব্যাপার। বরাদ্দমত খাবার দাবার ওরা পায় না। জেলখানার পরিবেশ ভীষণ রকমের অস্বাস্থ্যকর তার উপর সাধারণ কয়েদীদের দিয়ে ওদের ওপর চলছে অকথ্য নির্যাতন আর মাঝে মাঝে জেরার নাম করে পুলিশ বা জেলরক্ষীরা যা করে তার দগদগে দাগ বন্দীদের পেটেপিঠেই স্বাক্ষর রেখে গেছে।'

শুধু ঝাড়খণ্ড পার্টির সমর্থক বা কর্মীরাই নন জ্যোতি বসুর সরকার এখন এত বেশি গণতান্ত্রিক যে যারা সি পি এম-এর রাজনৈতিক বিরোধিতা

চিন্তা বদল রুশি মোদীর সঙ্গে জ্যোতি বসু

ব্রিটিশ শাসনের জেলখানা

জেলখানাগুলি কলকাতার গর্ব নাকি অন্ধকার স্মারক সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু যে বিষয়টিতে দ্বৈতমত হবার কারণ থাকবে না তা হল, জেলখানা মাত্রেই বহুবিচিত্র স্মৃতি বহন করে, করে চলে। তখনকার দমদম সেন্ট্রাল জেল আজকের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি কিন্তু তখনকার ব্রিটিশ শাসনের দিনে এই দোতলা বাড়িটির দ্বিতীয় তলাটিকে বলা হত হাউস অব লর্ডস নিচের তলার নাম ছিল হাউস অব কমন্স। হাউস অব লর্ডসে রাখা হত প্রথম শ্রেণীর বন্দীদেরকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জায়গা বরাদ্দ ছিল হাউস অব কমন্সে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ধরাধায় ছিল দু'টি বিভাগ। প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা যেভাবে সুযোগ সুবিধা এবং মর্যাদা দেওয়ার কথা চিন্তা করতেন তা অনেকেরই জানা নেই প্রথম শ্রেণীর বন্দীরা বাড়ি থেকে আনা পোশাক-আশাক ব্যবহার করতে পারতেন, অন্যপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য জেল থেকেই পরতে দেওয়া হত ধুতি পাঞ্জাবী।

দমদম জেলের ভেতর ছিল তিন তিনটে রান্নাঘর। একটি ছিল স্বপাক ভোজনের জন্য যে যে বন্দীরা নিজেরা রান্না করে খেতে চাইতেন তাঁরাই এটি ব্যবহার করতেন। অন্যটি ছিল নিরামিষ রান্নাঘর, খুব ভাল নিরামিষ খাবার দাবার তৈরি হত। সকালে পুরী, তরকারি, হালুয়া। দুপুরে হত ভাত অবশ্যই ভাল চালের। সঙ্গে থাকত ডাল, তরকারি, চাটনি এবং দই নিরামিষ রান্নাঘর থেকে বিকেল বেলায় যে যে খাবার বন্দীদের জন্য বরাদ্দ করা ছিল তা হল চা, সঙ্গে গোলমরিচ দেওয়া চিঁড়ে ভাজা রাত্তিরের তালিকায় থাকত ঘি মাখানো রুটি তরকারি, চাটনি ও দুধ। দুধ না হলে পায়েস স্বপাক রান্নাঘরের বাঞ্জন বিধি ছিল রীতিমত লোভনীয় ঈর্ষণীয়ও ছিল বহু জেল বন্দীদের কাছে। নিয়মিত মাছ মাংস হত। পোলাও কোর্মার মত রান্নাও হত মাঝে মাঝেই। তৃতীয় রান্নাঘর ছিল সাধারণ রান্নাঘর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর রান্না হত এখানে। সপ্তাহের রুটিনে থাকত তিনদিন মাছ আর দু'দিন মাংস। ভাত, ডাল, সব্জি তো থাকতই। সকালে বরাদ্দ ছিল রুটি-মাখন আর একটা গোটা ডিম। বিকেলে রান্নাঘর থেকে বেরত শুধু চা। অবশ্য চায়ের সঙ্গে দেওয়া হত বিস্কুট।

জেলখানার ভেতরে জেলবন্দীরা নিশ্চয়ই পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে বসবাসের আনন্দ পেতেন না। তবে আনন্দ আহরণের প্রচেষ্টার কিন্তু অভাব ছিল না জেলের ভেতর বসত মক পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্টে একজন হতেন স্পিকার। বিরোধী আসনও ছিল একটি। জেলে পুজো হয়েছে, হয়েছে অভিনয়ও রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের অভিনয়ও হয়েছিল দমদম সেন্ট্রাল জেলে ১৯৩২-এ পুজোর পুরোহিত ঠিক হত জেলবন্দীদের মাঝ থেকেই আর অভিনয়ের মঞ্চ করা হত, হাউস অব লর্ডসে আর জেলে বসে চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া? সে এক বিষম ব্যাপার বিষম ব্যাপার ছিল এইজন্য বৃটিশ শাসকেরা নিয়ম করে দিয়েছিলেন কোন জেলবন্দী সপ্তাহে কেবল একটি চিঠিই লিখতে পারবে এবং কোথা থেকেও জেলবন্দীর নামে চিঠি পৌঁছুলেও সপ্তাহে কেবল তার একটি চিঠিই প্রাপ্য, তার বেশি নয়

দমদম সেন্ট্রাল জেলই হোক আর প্রেসিডেন্সি জেলই হোক, ব্রিটিশ আমলের জেলবন্দীদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে বড় একটা হেরফের ছিল না। ক'টা সেল, ক'টা রান্নাঘর, বাথরুম এর সংখ্যাটিই যা আলাদা থাকত তবে গোরা সাহেবদের শাসনের আর আইনজারি করার পেছনে যতখানি দৃঢ়তা ছিল তা সত্যিই দেখার মত তাছাড়া স্বাধীনতাকামী জেলবন্দীদের উপর ব্রিটিশ শাসকেরা অনেক সময়েই অপ্রত্যাশিত অত্যাচার চালাত। ব্রিটিশ বেনিয়ার সে অত্যাচার হয়তো বা বাঙালির স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত। নিজেদের অপারগতা ঢাকার কলাকৌশলই আসলে জেলবন্দীদের নিগৃহীত করার ঘটনার স্পষ্টরূপ

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

করবে এবং যাদেরকে বাইরে পুলিশ বা ক্যাডার দিয়ে সামলানো যাবে না তাদের ভাগ্যে জেলগরাদের 'লগসি' লেখা আছে। হাতের কাছে পাওয়া তেমনি একটি উদাহরণ দিলেন ঝাড়খণ্ডী নেতা নরেন হাঁসদা মেদিনীপুর জেলা ১ নং বিনপুর ব্লকের কংগ্রেস নেতা এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধি বলরাম নায়েককেও বিচারাধীন বন্দী করে দিনের পর দিন জেলখানায় পচে মরতে হচ্ছে। নরেনবাবুর মতে, 'বলরাম অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, তাঁকেও ফাঁসানো হয়েছে সাজানো মামলায়। এবং বিচার হলেই তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন বলেই পুলিশ ডেটের পর ডেট চেয়ে নিচ্ছে। ফলে বিলম্বিত হচ্ছে বিচারপর্ব আর এদিকে জেলখানার ভেতর অপুষ্টি, অত্যাচার এবং বিনা চিকিৎসায় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলরাম। আসলে বিরোধী দলগুলির কর্মীদের মনোবল এবং দৃঢ়তা ভেঙে দিতেই সি পি এম সরকার এই কৌশল চালিয়ে যাচ্ছেন।'

ঝাড়খণ্ড পার্টি বা নকশালপন্থীরা রাজনৈতিক ভাবে খুবই সংহত। তাই তাদের কর্মীরা কে কোথায় কি ভাবে বন্দী আছেন তা তারা সহজেই বলে দিতে পারেন। পারে না কংগ্রেস, কেননা অন্তর্দলীয় খেয়োখেয়িতে নেতারা এতই ব্যস্ত যে কর্মীদের খবর রাখার কোন দায় তাদের আছে বলে মনে হল না ব্যতিক্রম মমতা ব্যানার্জি। মমতা বললেন, 'আমি সবে যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছি তাই এখনও অবধি তালিকা সম্পূর্ণ করতে পারিনি তবে যে কটি জেলায় গেছি তাতে সাজানো মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা এবং জেলখাটা কর্মীর সংখ্যা এখনই ১০০০ ছাড়িয়ে গেছে আর জেলে বা হাজতে তাদের উপর যে মর্মান্তিক মধ্যযুগীয় অত্যাচার চলার কথা কানে আসত কি বলব। এই কিছুদিন আগে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা দুই বন্দীকে হাসপাতালের খাটের সঙ্গে বেঁধে পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি মহাকরণে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে তবে ছাড়াই। যে সরকারের প্রশাসন হাসপাতালে বন্দীদের সঙ্গে এরকম বর্বর ব্যবহার করতে পারে তারা জেলখানায় কি করছে তা তো সহজেই অনুমেয়।'

মমতা ব্যানার্জি বা নরেন হাঁসদা বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, তাই তাঁরা তো বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বলবেনই এবারে শোনা যাক মহামান্য আদালত নিযুক্ত জেলখানা পরিদর্শনের স্পেশাল অফিসার আইনজীবী শিবশংকর চক্রবর্তীর কথা। শিবশংকর বললেন, 'আমি প্রেসিডেন্সি জেল পরিদর্শনে গিয়েছিলাম যেখানে সব ধরনের বন্দীদের অবস্থা অমানবিক এবং মানবতাবিরোধী। জেলখানার যে অবস্থা তাতে ওরকম ভাবে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আর এর জন্য অবশ্যই দায়ী সরকারি প্রশাসন এবং দলীয় রাজনীতি। (শিবশংকর চক্রবর্তীর মহিলা ওয়ার্ডের হাজহকিকৎ সংক্রান্ত রিপোর্টটি বন্দ-এ ছাপা হল)।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জ্যোতি বসু ছিলেন বন্দী মুক্তি আন্দোলনের প্রধান হোতা। তিনি ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিও দিয়েছিলেন। সেই জ্যোতি বসুর জমানায় জেলখানার যে ছবি আমরা পেলাম তা পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার ইমেজের পক্ষে মানানসই নয় কারণ তাঁর কাছে সাধারণ মানুষ এমন কি জেলবন্দীদের কেউ কেউ পর্যন্ত এরকম আশা করেন নি জ্যোতি বসু এ সম্পর্কে কিছু ভাববেন কি?

– কৃষ্ণাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি অশোক বসু, বিকাশ চক্রবর্তী, কাজী আব্দুর সাহিদ, জয়ন্ত সাহা

পরিবারের প্রাণস্পন্দন
আপনার শিশু এক মহান শিক্ষার্থী –
ওর বিদ্যারম্ভের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। ওকে
হরলিকসের পুষ্টিগুণ দিন, ওকে সজাগ,
মেধাবী করে তুলুন। আপনার পরিবারের
সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি
আছে এতে
স্বাস্থ্য ঝলমল,
প্রাণ চঞ্চল,
পুষ্টিভরা হরলিকস
পরিবারের প্রাণস্পন্দন।
Horlicks
WITH EXTRA CALCIUM
মহান পুষ্টিদাতা

অপারেশন বজরং: অসমে শান্তি আনতে পারবে?

ভারত থেকে অসমকে বিচ্ছিন্ন করবার আলফা-উদ্যোগের মুখে দেশকে রক্ষা করতে রাতারাতি জারি রাষ্ট্রপতি শাসন ও সেনা মোতায়েন—এর 'অপারেশন বজরং' চালু করে কেন্দ্রিয় সরকার কি অসমে শান্তি আনতে পারবেন? অসমের রাজনৈতিক নেতারা,রাজ্যপাল এবং ছাত্র নেতারা কি বলছেন? একটি সরজমিন রিপোর্ট।

সরাসরি লড়াই লখিপাথারে 'অপারেশন বজরং'

দিশপুর থেকে উজানী অসমের ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের ছাবুয়া ঘাঁটিতে যেতে আকাশ পথে সময় লাগবে মিনিট তিরিশের মত এখান থেকে গাড়িতে ইউনি লিভারের চা বাগান (ভারতে হিন্দুস্থান লিভার) এবং ডিগবয়ের তৈলশহরের মধ্যে দিয়ে গেলে আপনি দুই ঘণ্টায় লখিপাথার পৌঁছে যাবেন এই লখিপাথারই হলো সরকারি মতে উগ্রপন্থী অধ্যুষিত 'ডেঞ্জার জোন' এই ৫০ কি মি রাস্তাটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা, পরে এটি বেড়ে বার্মার কাচিন পর্বতমালা থেকে সরাসরি একদিকে অরুণাচলে অন্যদিকে মেঘালয়ে পৌঁছে গেছে, যার পুরোটাই এখন উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষিত ছাবুয়া থেকে লখিপাথার পর্যন্ত সমস্ত পথই ফৌজী ট্রাকে ভরে গেছে ব্রিগেডিয়ার কে এম পালাণ্ডের নেতৃত্বে স্টেনগান উঁচিয়ে জওয়ানরা এ্যাকশানের জন্য তৈরি। জায়গাটি ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম ওরফে আলফা অধ্যুষিত জঙ্গি ট্রেনিং এলাকা এই ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম ওরফে আলফার স্বঘোষিত মুক্তি বাহিনী 'সদৈ অসম'কে নয়াদিল্লির 'ভারতীয় ঔপনিবেশিকতাবাদী বাঁধন'

থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর

যদিও তাদের গভীর জঙ্গলে সন্ত্রাসবাদী সাজসরঞ্জামে ঠাসা 'ওয়ার হেড কোয়ার্টার্স' ৩০ নভেম্বর মধ্যরাত্রি থেকে চলে গেছে সেনাবাহিনীর দখলে

রাতারাতি জংগি কবলিত অসমে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সেনা নামালেন অতর্কিতে। উজানী অসমকে উগ্রমুক্ত করতে শুরু হয়েছে সেনাবাহিনীর 'অপারেশন বজরং'। এটি দেশের সাম্প্রতিককালের এক বিশাল ফৌজী অপারেশনের কোডনেম। ৩টি পর্বতীয় সেনা ডিভিশনের ৩০ হাজার ফৌজী, যারা শ্রীলঙ্কায় উগ্রবাদী এল টি টি ই'র মোকাবিলায় গিয়েছিল, তারাই উজানী অসমের ৫টি জেলা ছেঁকে ফেলে নিষিদ্ধ আলফা গেরিলাদের উৎখাত করতে নেমে পড়েছে যদিও ফৌজীর পক্ষে অন্তত প্রথম এক সপ্তাহের ফল একেবারেই আশাপ্রদ ছিল না। তবে সেনাতৎপরতায় বেশ কিছু আলফা ক্যাম্প ও হেড কোয়ার্টার ধ্বংস হয়েছে এবং সেখানকার গেরিলারা পালিয়েছে। কিন্তু সেনাবাহিনী আলফার জংগি নেতাদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি। আর দখল করা ক্যাম্প থেকে যেন রাতারাতিই জংগিদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাতদিন ধরে লাগাতার ফৌজী অপারেশন চলবার পর বজরং বাহিনীকে আলফারা কিরকম বোকা বানালো এইসব নিয়ে ইতিমধ্যে জনমানসে নানা গুজব রটতে আরম্ভ করেছে। অসম সরকারের কিছু উঁচু পর্যায়ের অসমীয়া অফিসার এবং পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তর নামে আলফাকে আগে ভাগে খবর দেওয়ার কথা চাউর হয়েছে। এছাড়া আলফা ক্যাম্প থেকে উদ্ধারকৃত চিঠিপত্রেও অ গ প সরকারের সঙ্গে আলফার গোপন সম্পর্কের কথা প্রমাণ করেছে।

চন্দ্রশেখর সরকার একেবারে শেষ অবস্থায় সেনা ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের চীফ অফ স্টাফ লেঃ জেনারেল বলজিৎ সিং সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলফার বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের বিষয়টি দেখাশোনা করেছেন। তিনি জানান, 'এলাকা সম্পর্কে সুষ্ঠু অভিজ্ঞতা এই ধরনের সেনা অভিযানের ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে। কিন্তু অপারেশন বজরং এর ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল।' আরও ব্যাপার হল সৈন্যরা এই পর্বতসংকুল বনাঞ্চল সম্পর্কে একেবারে অপরিচিত। অথচ মিলিটারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আলফা গেরিলাদের পক্ষে ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই বনাঞ্চল একেবারে স্বর্গরাজ্য অভিযানের শুরুতে তাদের মধ্যে অধিকাংশই গাছপালার মধ্যে থেকে জওয়ানদের ওপর গুলি চালিয়ে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ত। অসমে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদে ২৮ নভেম্বর সকালে

অসমে সেনাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান

আলফা ক্যাম্পে বাজেয়াপ্ত জঙ্গীদের জিনিসপত্র

নর্থলখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় সেনাবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হয়। উজানী অসমে সেনাবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল লখিপাথার জঙ্গলে আলফার 'ওয়ার কন্ট্রোল সেল' গুঁড়িয়ে দেওয়া।

এখানে সরু সরু এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ভরা সমস্ত এলাকা হেলিকপ্টার, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথমে আলফার জংগি ঘাটিগুলির ওপর

রাজ্যপাল ডি ডি ঠাকুরের সাক্ষাৎকার

"ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি অসমে নতুন নির্বাচনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে"

অসমের রাজ্যপাল ডি ডি ঠাকুর জাতীয় ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুফতি মহম্মদ সৈয়দ কর্তৃক একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়েছিলেন একজন দুঁদে রাজনীতিবিদ, শেখ আবদুল্লার ক্যাবিনেট সহকর্মী, রাজ্যপাল ডি ডি ঠাকুর ফেব্রুয়ারির শেষে এ রাজ্যে নির্বাচন করতে চান। তিনি বলেন, অ গ প সরকার প্রধানত প্রফুল্ল মহন্ত যদি তাঁর কথায় কান দিতেন তাহলে আইন শৃংখলার অবস্থা এরকম হয়ে পড়ত না।

প্রশ্ন: ভি পি সিং সরকারের সময় আপনি নিশ্চুপ ছিলেন কেন? সেটা কি জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে অ গ প ছিল বলে?

ডি ডি ঠাকুর: এটা ঠিক যে প্রথমেই আমি রাষ্ট্রপতি শাসন সুপারিশ করিনি কিন্তু আমি বহুবার কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারকে আইন শৃংখলার ক্রমশ অবনতির বিষয়ে সতর্ক করেছি। বারবার প্রফুল্ল মহন্তকে আলফার হটকারী কার্যকলাপের বিষয়ে শাসনকে কড়া হাতে ধরতে বলেছি তাঁর হয়তো নানা রকম সমস্যা এবং বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু এটা ঠিক যে তিনি আমার পরামর্শে কোন রকম কর্ণপাতই করেননি। ১৯৮৭ সাল থেকে ১১৩ জনেরও ওপরে মানুষ আলফার হাতে নিহত হয়েছেন। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যাপারী সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই আলফার অত্যাচারে জর্জরিত ব্যবসা ট্যবসা বন্ধ রাজধানী রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন অন্যদিকে সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেল বেকারী

পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলি, যারা কিছু চাকরি বাকরি দিতে পারে, তারা আলফার ঝামেলায় কাজকর্ম বন্ধ করে দিল মোটামুটি ভাবে রাজ্যের সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল এবং আমি বিশ্বাস করি এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসন অনুমোদন করে রাজ্যের প্রতি সুবিচারই আমি করেছি।

প্রশ্ন: জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকা আলফা কর্মীদেরকে বের করতে কত সময় লাগবে?

ডি ডি ঠাকুর: এ বিষয়ে সঠিক সময় নির্দেশ করাটা সমস্যার আমরা তাদের সম্পর্কে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করছি। তাদেরকেও ধরছি তাদের সম্পর্কে আরও বেশি ওয়াকিবহাল হয়ে আমরা আমাদের গতিবিধির পরিবর্তন ঘ[illegible] আমরা কোন নিরর্থক এবং দুর্বল পদক্ষেপ নিতে চাই না

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে জনসাধারণকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে বলতে পারেন না।

ডি ডি ঠাকুর: জনসাধারণ অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করছি স্থানীয় আমলাতন্ত্র, পুলিশ এবং ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলির সঙ্গেও যৌথ আছে এই সমস্ত এজেন্সিগুলির সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো এবং এদেরকে কাজে নিযুক্তও এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার

প্রশ্ন. সাধারণের ধারণা হল অপারেশন বজরং ব্যর্থ হয়েছে?

ডি ডি ঠাকুর: ব্যর্থতা এবং সফলতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। কিছুদিন ধরেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার বিষয়টি সবাই বলাবলি করছিল। সুতরাং সৈন্যরা অভিযানে যাবার অনেক আগেই আলফাকে তারা জানিয়ে এবং সতর্ক করে দিতে পারে এবং আলফা নেতৃবৃন্দ নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার প্রচুর সময় পেয়ে যায়

প্রশ্ন: 'তারা' কারা?

ডি ডি ঠাকুর: (মুচকি হেসে) অনুমান। সারা রাজ্য জুড়ে তাদের বেশ কাজকর্ম ছড়ানো। এমন কি আমলাতন্ত্রেও এগুলো ঢুকে পড়েছে।

প্রশ্ন: কোন্ সময়ে অসমের নির্বাচন করবেন?

ডি ডি ঠাকুর: রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর। এবং আশা করছি, ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি অসমে নতুন নির্বাচনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে

প্রশ্ন: কিন্তু আপনি কি রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে রাজ্যপাল হিসেবে বেশি সময় পাবেন?

ডি ডি ঠাকুর: আমি যতদিন পর্যন্ত রাজ্যপাল হিসেবে কাজ করার অনুমতি পাব ততদিন পর্যন্ত কাজ করে যাব বর্তমানে আমি প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনাধীনে কাজ করছি (আবার মুচকি হাসি) বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আমার উপলব্ধি বলতে পারেন।

- বিশেষ প্রতিনিধি।

চকিত আক্রমণের চেষ্টা চালায় সেনাবাহিনী। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে কয়েক গজ প্রবেশ করেই সেনাবাহিনীর বোধগম্য হল যে তারা সাংঘাতিক ট্রেণ্ড শত্রুর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় লড়তে নেমেছে। আলফার মেইন ক্যাম্প অবধি চলে যাওয়া সরু কাদার রাস্তায় মাইনের পর মাইন পোঁতা। সেনাবাহিনী এই মাইন বিস্ফোরণে আক্রান্ত হয়েছে প্রতিপক্ষ যে দুর্দান্ত প্রশিক্ষিত তা প্রমাণিত হয়েছে চীনের ছাপমারা আগ্নেয়াস্ত্র আটক করায়। যাই হোক, গেরিলা কায়দার বিক্ষিপ্ত লড়াই–এর বাধা কাটিয়ে একের পর এক আলফা ট্রেনিং ক্যাম্প সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। সেনাবাহিনীর ক্যাম্প দখল সাফল্যের বিশেষ দিকটি হল, এইসব ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে আলফা গেরিলারা আক্রমণ চালাত এবং কাজ শেষে এখানে আশ্রয় নিত। কিন্তু সেনাবাহিনীর তথা দেশের পক্ষে ভবিষ্যত আতংকের কারণ হল–পরেশ বড়ুয়া, অরবিন্দ রাজখোয়া, সিদ্ধার্থ ফুকন সমেত বেশির ভাগ শীর্ষস্থানীয় আলফা নেতা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে গেছে এবং এক সপ্তাহ ধরে এই সেনা অভিযান চালানোর পর তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নি, পাওয়া যায়নি অত্যাধুনিক অস্ত্র। অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্র জানাচ্ছে যে, আলফা জংগিদের হাতে চীনা এ কে ৪৭ রাইফেল পর্যন্ত ছিল। ছিল স্টেনগান ও মেশিনগানের মত মারাত্মক সমরাস্ত্র। আলফার 'ওয়ার কন্ট্রোল সেল' থেকে সেনাবাহিনীর আটক করা অস্ত্রশস্ত্র সে সবের ধারেপাশেও মাড়াতে পারেনি সেখানে পাওয়া গেছে এক জোড়া দুই ব্যারেলের বন্দুক, কয়েকটা এয়ার পিস্তল এবং কিছু লোহার পাইপ দিয়ে তৈরি করা মাইন লখিপাথার ক্যাম্প থেকে যেসব জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে তাতে সেটিকে ট্রেনিং ক্যাম্প না বলে আলফার মেডিকেল ক্যাম্প বলা উচিত। যেখানে পাওয়া গেছে একটি ওনিডা টি ভি, একটা ভি সি পি, কিছু স্যালাইনের বোতল, প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সহ প্রচুর ওষুধপত্র এবং নানা রকম হেল্থ টনিক। এছাড়া স্টেশনারি কিছু দ্রব্য, মশারি ও একটা গীটার আর পাওয়া গেছে কিছু বইপত্র। এর মধ্যে আছে–কিরোর 'পামিস্ট্রি, ব্যানার্জির 'গুড ইংলিশ' এবং মাও সে তুং এর কবিতা সংগ্রহ। এসব নিরামিষ বাজেয়াপ্তীকরণ এবং আলফার শীর্ষনেতাদের পলায়ন কি অসমে ভবিষ্যত গেরিলা হানার দিকনির্দেশ নির্ণয় করে?

সেনাবাহিনী জঙ্গলের মধ্যে আলফার হাতে খতম হওয়া মানুষের গণকবরও আবিষ্কার করেছে। যার অধিকাংশই বাঙালি, অহোম এবং উপজাতিদের। এর মধ্যে একজনও অ গ প সমর্থক অসমীয়া বর্ণহিন্দু নেই। এই গণকবর অসমের সম্প্রদায়গত ভেদাভেদকে আরও প্রকট করেছে. সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতংকিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য ঝুঁকে পড়ছে সর্বভারতীয়

সেনাবাহিনী জঙ্গলের মধ্যে আলফার হাতে খতম হওয়া মানুষের গণকবরও আবিষ্কার করেছে। যার অধিকাংশই বাঙালি, অহোম এবং উপজাতিদের। এর মধ্যে একজনও অ গ প সমর্থক অসমীয়া বর্ণহিন্দু নেই। এই গণকবর অসমের সম্প্রদায়গত ভেদাভেদকে আরও প্রকট করেছে।

রাজনৈতিক দলগুলির দিকে, যা আঞ্চলিকতাবাদী অসমীয়া রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

আলফা ক্যাম্প থেকে বেশ চমকপ্রদ কিছু ডকুমেন্ট সেনাবাহিনী হস্তগত করেছে যা অসমের ভবিষ্যত রাজনীতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে আলফার কমান্ডার-ইন-চীফ পরেশ বড়ুয়ার একটি সার্কুলার নোট যাতে তিনি ক্যাম্পগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছেন আলফার গেরিলা-দেরকে, সেনাঅভিযানের জন্যে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে তারা যেন সমস্ত ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে তাহলে দিশপুরের উঁচু মহলেও আলফার সহমর্মী মানুষজন আছেন।

সেনাবাহিনীর এই অভিযান কিন্তু খুব গোপনীয়তার সঙ্গে শুরু হয়েছিল এমন কি অসমের রাজ্য পুলিশকে আগাম অবহিত করা হয় নি। এই আসন্ন অভিযানের বিষয়টি জানা ছিল সেনাবাহিনীর উপর মহল, হোম মিনিস্ট্রি এবং অসম গণ পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে অসম গণ পরিষদের কেউ আলফাকে সেনা অভিযানের সম্পর্কে আগেই সাবধান করে দিয়েছে?

অসমের বাঙালি ছাত্রসংস্থা আকসা এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় নি। উদাহরণ হিসেবে আকসার সভাপতি প্রদীপ দত্ত রায় বললেন, 'আলফার হেড কোয়ার্টার লখিপাথারের ক্যাম্পগুলি অসমের তৈলশহর ডিগবয় থেকে খুব বেশি হলে আট কিলোমিটার দূরে আবার রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীন ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে তার দূরত্ব হবে মাত্র দেড় কি·মি·। এই অবস্থায় এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব যে, স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন আলফাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একেবারেই অসচেতন ছিল। স্থানীয় পুলিশ রিপোর্ট মোতাবেক একথা এখন প্রমাণিত যে এ জি পি–র বহু হর্তাকর্তার সঙ্গে আলফা জংগিদের যথেষ্ট দহরম ছিল এবং আছে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার কিছু আগে আপার অসমে নিযুক্ত একজন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ তার দিসপুর হেডকোয়ার্টারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি গোপন নোটে জানান যে, অ গ প আলফার কার্যকলাপ সৃষ্টি করছে ভোটের জন্য সন্ত্রাসের পরিস্থিতি তৈরি করতে। সেই নোটে বিশেষভাবে বলা ছিল যে আলফা অ গ প ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচারের জন্যে সমর্থন করে না' অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিতেশ্বর সইকিয়ার মতে, 'এটা আর গোপন নেই যে অ গ প আর আলফা একজোট হয়েছে স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে আপার অসম আলফা সংগ্রামকারীদের জ্বালায় অতিষ্ঠ। সূর্যাস্তের পর সরকারী সব অফিস থেকেই আলফাদের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।' বজরং অপারেশনের একজন সিনিয়র অফিসার আলফা অ গ প সম্পর্ককে সমর্থন করলেন এইভাবে, 'এই একটা বড় সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। সৈন্যবাহিনীর পক্ষে খবরাখবর সংগ্রহ করার সময় খুব কম এবং আমরা রাজ্যের অসমীয়া বর্ণহিন্দু পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর বেশি আস্থা রাখতে পারছি না কারণ এরা আলফা–র ওপর পুরোপুরি সহানুভূতিশীল।' লেঃ জেনারেল বলজিৎ সিং স্বীকার করলেন, 'আলফা র বেশির ভাগ নেতৃস্থানীয় সদস্য স্থানীয় সহায়তা এবং আগাম খবর পেয়েই বার্মায় পালিয়ে গেছে মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের মত প্রতিবেশি রাজ্যেও তারা যেতে পারে। তবে অসমের গ্রাম এবং শহরগুলিতে এখন আর তাদের কর্মক্ষেত্র গড়বার সম্ভাবনা দেখি না।'

অপারেশন বজরংকে অ গ প–আসু বিরোধিতা করলেও সংখ্যালঘু ফোরাম, উপজাতিরা এবং কংগ্রেস স্বাগত জানিয়েছে। এরা সকলেই প্রকাশ্যে বলেছে–রাষ্ট্রপতি শাসন এবং সেনা অভিযান অসমে স্থায়ী শান্তি আনবে।

আলফা অভিযানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্রসংস্থা আসু ও অসম গণপরিষদ পাবলিকের

আলফার অভ্যুত্থান

১৯৭৯-এ অসমে বিদেশি হটাও আন্দোলন যখন দানা বেঁধে চলতে আরম্ভ করেছে, সেই সময় এপ্রিলের ৯১ তারিখে অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের আনুষঙ্গিক হিসেবেই আলফার সৃষ্টি হল। তখন এটি ছিল তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রসংস্থা আসুর এনফোর্সমেন্ট আর্ম। বিস্ময়ের ব্যাপার হল যখন এই জংগি শাখার জন্ম হল এবং 'ইউনাইটেড স্টেটস অব অসম' নাম ঘোষিত হল। তখন কেউই, এমন কি কেন্দ্রও এদিকে লক্ষ্য দেয়নি। সেদিন থেকে চেয়ারম্যান হিসেবে অরবিন্দ রাজখোয়া এবং কমান্ডার ইন চিফ পরেশ বড়ুয়া এই নবা শাখাটির প্রধান দায়িত্বে ছিলেন। তখন আসুর সঙ্গে থাকলেও এখন আলফা উগ্র অসমীয়া প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনে বড় ভাই-এর ভূমিকা নতুন হয় পালন করছে। কয়েক মাস বাদেই 'ইউনাইটেড স্টেটস অফ অসম' (ইউ এস এ)-এর নাম পাল্টে দিতে হল। কারণ এই নামের সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা (ইউ এস এ) নামের মিল হওয়ায় ভুল হতে পারে।

পরেশ বড়ুয়া এবং অরবিন্দ রাজখোয়ার বয়স প্রফুল্ল মহন্ত এবং ভৃগু ফুকনের মতই তিরিশের ওপর। পরেশ একজন ভাল ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন। স্পোর্টস কোটায় ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে চাকরিও পান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাপ বরবরা নরেন বড়ুয়ার সম্পর্কে সম্প্রতি বলেন, 'পরেশ ১৯৭৮ সালে আমাদের পার্টির (জনতা) ইলেকশন এজেন্ট হয়ে কাজ করেছিল।' একজন খেলোয়াড় থেকে বড়ুয়ার এই পরিবর্তন ঘটে গেল যখন হিতেশ্বর শইকিয়া কংগ্রেস (ই) মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী। বড়ুয়া তখন উগ্র অসমীয়া প্রাদেশিকতাবাদী আন্দোলনের শরিক হয়ে এই মন্ত্রীসভার অপসারণের তীব্র সোচ্চার। শোনা যায়, বড়ুয়া যখন কয়েকটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে মণিপুরে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন, তখন মণিপুরের উগ্রপন্থী সংস্থা নিষিদ্ধ পিপলস্ লিবারেশন আর্মির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। সেখান থেকে তিনি কিছু পি এল এ-র লিটারেচার আনেন এবং তখন থেকেই শিবসাগর জেলায় আলফা উত্থানের সূত্রপাত। অসম পুলিশ তাঁর বাড়ি চড়াও হয়ে সেই লিটারেচারগুলি বাজেয়াপ্ত করে। বড়ুয়াকে পড়তে হয় ভয়ংকর জেরার মুখে। এরপরেই পরেশ হয়ে উঠলেন সরকার বিদ্রোহী। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই বর্মার বিদ্রোহী এলাকা কাচিনে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে রাচিনবাদী উগ্রপন্থী সংস্থার ওনাম চৌধার কাছে গেরিলা লড়াই-এর ট্রেনিং নিয়ে অসমে ফিরলেন এবং উজানী অসমের লখিপাথার জঙ্গলে অধুনা আলফার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন। ১৯৭৯ সালের 'বাহাগ' (বৈশাখ) মাসে 'রঙালি বিহু' উৎসবের দিন এই জংগিসংস্থার জন্ম হলেও ১৯৮৬ সালে লখিপাথারের হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করলেন তিনি ওই রাচিনবাদী ট্রেনিং সেন্টারের কায়দায়। সোস্যালিস্ট ঘরানার [illegible] পরেশ বড়ুয়া বর্মা থেকে 'মাও'বাদী হয়ে ফিরলেন। তিনি এরপর শিবসাগর জেলার অরবিন্দ রাজখোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তুতিপর্ব করলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ভারতের উপনিবেশিকতার বাঁধন থেকে 'সদাই অসম'কে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্যে যোগাযোগ শুরু করলেন— ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড, পি এল এ এবং কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আর্মি কাংলেইপাকের সঙ্গে।

১৯৮৫তে অ গ প ক্ষমতায় আসার পরেই আলফা 'রণংদেহী' রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। শুরু হয়ে গেল অ-অসমীয়া খুন ও চা-বাগানগুলিতে হামলা। ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট (ইউ এম এফ) ক্ষমতাসীন অ গ প-র বিরুদ্ধে ১৭টি সিটে জয়ী হয়েছিল। আলফা হানার প্রথম শিকার হল এরাই। ১৯৮৬-তে প্রথম আঘাতে এল ইউ এম এফ এ-র প্রধান কালিপদ সেন নিহত হলেন প্রকাশ্য দিবালোকে গৌহাটিতে।

তারপর পালা পড়ল চা বাগানগুলির। সাম্প্রতিক বছরে আলফা লখিমপুরের মতন একটি ছোট্ট শহর থেকে ৯৫ কোটি টাকা তুলেছে। এই শহরের জনসংখ্যা হবে ৫০ হাজারের কম এবং ১৯৯০-এর আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উজানি অসমের তিনসুকিয়া শহরের ৮৫ জন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ভি পি সিংহ-এর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় উপপ্রধান মন্ত্রী দেবীলাল যখন অসম সফরে এসেছিলেন তখন আলফা শক্তি জাহির করতে কামরূপ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট বীরুমিত্তালকে হত্যা করে। এরপর শিবসাগরে হত্যা করা হয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিজয় মজিন্দর বড়ুয়াকে। এরপরই বহু ব্যবসায়ী আলফার ভয়ে অসম থেকে চলে যেতে শুরু করেন।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পানবাজারের বিকাশ হোটেলের জনৈকা মহিলা কর্মী আলফা প্রসঙ্গে বললেন, 'একদিন দু'জন আলফার জংগি কিশোর আমার কাছে এক হাজার টাকা দাবী করে বসল। আমি তাদের বললাম অত টাকা আমি মাইনেই পাই না। কিন্তু তারা কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে আমি আমার কানের দুল বিক্রি করে তবে তাদের চাহিদা মেটাই।' অসমের রাজধানী দিসপুরেও খুবই গণ্ডগোল। ব্যবসায়ীরা স্থির হতে পারছেন না। গৌহাটির এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী জানালেন, 'আমাকে ৫ লাখ টাকা দিতে বলা হল। সঙ্গে এও হুমকি দেওয়া হল যদি না দিই তাহলে সুরেন্দ্র পালের মত অবস্থা হবে। কিন্তু অনেক ধরে কয়ে ৫০ হাজারে রক্ষা করতে হল—কারণ ব্যবসার খাতিরে দিসপুরে আমাকে প্রায় প্রতিদিনই যেতেই হবে।'

অ গ প সরকারের আমলে থেকে আলফা অসমে একটা সমান্তরাল সরকারই চালাচ্ছিল বলা যায়। ব্রুক বণ্ড এবং লিপ্টন চা-কে তারা হিট লিস্টে রেখে দিয়েছে। আলফার শাসানির ভয়ে এই কোম্পানিগুলির ম্যানেজমেন্ট নভেম্বরের ১৩ তারিখ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চার সপ্তাহের জন্যে গৌহাটিতে চা অকশান করতে অস্বীকার করেছে। এবং দুমদুমা চা বাগান থেকে কর্মীদের বার করে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে আকস্মিকভাবে চা শিল্পে অসমব্যাপী সঙ্কট দেখা গেছে। আলফা এর পাল্টা ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক ইস্যু তুলে কোম্পানির একসিকিউটিভদের হুমকি দিয়েছে অসম ছেড়ে যাবার জন্য। লণ্ডনের ইউনিলেভার, যারা লিপ্টন এবং ব্রুক বণ্ড এই দুটি কোম্পানিকেই চালায়, তারা ব্রিটিশ হাইকমিশনারের মধ্যস্থতায় দিল্লির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

অপারেশন বজরং-এর সেনা অফিসারদের মতে, আলফা-র কর্মীদের তাদের সেই নেতাদের সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটে গেছে, যে নেতারা হত্যা এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ আদায়ে বিশ্বাসী। কর্মীরা এখন হতাশ। লখিপাথার ক্যাম্প থেকে পাওয়া আলফা-র একজন সক্রিয় কর্মীর ডায়রী ফৌজী অফিসারদের এই মতকে হয়তো সমর্থন জোগাবে। এই সংক্ষিপ্ত ডায়রীর এক জায়গায়: 'সন্ধ্যা ৫টার মধ্যে খাবার পর আমরা যে যার ক্যাম্পে চলে যাই। সেখানে ৮টা পর্যন্ত অধৈর্য ভাবে অপেক্ষা করি। তারপর আমাদের ঘুমোতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতভাবে আমরা ঘুমোতে পারি না। আমাদের প্রত্যেককে ৮ থেকে ৩টের মধ্যে এক ঘন্টা করে কাজ করতে হয়।'

ডায়রীর অন্যত্র—'সকালে এবং রাত্রে, এই দু'বার খাবার মাঝের ১৬ ঘন্টা আমরা একেবারেই কিছু খাই না, জল ছাড়া।'

'সেন্টার থেকে রেশন শপ-এর মধ্যে একটি ছোট্ট নদী আছে। এর দূরত্ব ২ কি.মি.। কোন কোন সময় দিনে আমরা সেখানে তিনবারও যাই।'

'মাঝে মধ্যে আমার সব কিছুই একেবারে বাজে মনে হয়। কিন্তু এখানে ৪০ জন মতন মেয়ে আছে। এখানে তারা মাস দুয়েক ধরে আছে। আমিই একমাত্র নতুন, আমার মনে হয়…'

কাহিনীর শেষটুকু লেখা হয় নি। হয়তো সেনা অভিযানের সংবাদে সে সাময়িকভাবে ডায়রী লেখা ছেড়ে উঠে চলে গেছে।

হয়রানি এবং ধর্ষণের অভিযোগ করেছে, নির্দিষ্ট ভাবে অ গ প এবং আসু 'বিদেশি-বিরোধী' বিক্ষোভ নিয়ে যখন জনসমক্ষে আসে তখন থেকেই সেনাদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দু অসমীয়া প্রাদেশিকতা-বাদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় রাজ্যের শাসনক্ষমতায় থেকে অপব্যবহার এবং দুর্নীতির অভিযোগের সুবাদে রাজনৈতিক দল হিসেবে অ গ প–র জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে–পরে এল রাষ্ট্রপতি শাসন অ গ প এখন চেষ্টা করছে জনসাধারণের দৃষ্টি নিরপরাধদের ওপর সেনাবাহিনীর কাজকর্ম এবং আলফা ভীতির দিকে ঘুরিয়ে দিতে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত রাষ্ট্রপতি শাসন ও সেনাবাহিনীর বিরোধিতাকে সম্বল করে হাত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে ছুটে বেড়াচ্ছেন লখিমপুর থেকে গৌহাটি ডেকে ডেকে শোনাচ্ছেন নারী ধর্ষণ ও যুবাগ্রেপ্তারের অপ্রমাণিত কাহিনী তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে একবালে তাঁরই গড়ে তোলা ছাত্র সংগঠন আসু অভিযোগ করেছে সেনার হাতে ধর্ষিতাদের কথাবার্তা টেপ রেকর্ডারে তাদের কাছে ধরা আছে এবং ৮ ডিসেম্বর গৌহাটিতে আসু এক মহিলা সমাবেশ সংগঠিত করেছিল, সেখানে জনসমক্ষে সেই ধরনের কিছু টেপও বাজানো হয়। আসুর সাধারণ সম্পাদক সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বললেন, 'আমরা এক দীর্ঘ মেয়াদী বিক্ষোভ কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমরা রাষ্ট্রপতি শাসনের বিরুদ্ধে এবং অসম থেকে সেনা বিতাড়নের জন্যে দৃঢ় সংকল্প।' প্রতিদিনই এখন সৈন্য সম্পর্কিত গুজব শোনা যাচ্ছে, যা শোনা যাচ্ছে মূলত অ গ প ও আসু সমর্থক ও

উজানি অসমের গভীর জঙ্গলে আলফা নায়করা

'আলফা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল বিভিন্ন ইস্যুতে' : প্রফুল্ল মহন্ত

প্রশ্ন : রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

প্রফুল্ল মহন্ত : মতামত আর কি আমি চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম ১৪ কিংবা ১৫ নভেম্বর। তিনি তখন বলেছিলেন, অসমের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ওপর হস্তক্ষেপ করবেন না শেষবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করি ২৭ নভেম্বর তখনও কিছু জানি না। কিন্তু সাক্ষাতের ছ'ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হল

প্রশ্ন রাজ্যপাল নাকি জানিয়েছেন অ গ প, আসু, আলফা সব এক?

প্রফুল্ল মহন্ত : আমি রাজ্যপালের এ কথার ব্যাপারটা জানি না। উনি সত্যিই যদি লিখিত ভাবে একথা জানিয়ে থাকেন তবে সেটা দুর্ভাগ্য। এটা তো সবারই জানা আলফা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল বিভিন্ন ইস্যুতে আর আলফা ভারতীয় সংবিধানকেই বিশ্বাস করে না কিন্তু অ গ প ভারতীয় সংবিধানের প্রতি অনুগত এবং আমাদের দল একটি গণতান্ত্রিক দল। তাহলে কি করে তিনটি সংগঠনকে এক বলা যায়?

প্রশ্ন মুফতি মহম্মদ সৈয়দ কি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পক্ষে কাজ করেছেন?

প্রফুল্ল মহন্ত. মুফতিকে তাঁদের দলের লোকেরা প্ররোচনা দিয়েছে, যেমন গোলাপ বরবরা মুফতি যে আমাদের বিরুদ্ধে ওপরে বাজে রিপোর্ট দিয়েছেন তা আমি জানি।

প্রশ্ন : ভি পি সিং কি আলফা–র বিরুদ্ধে কখনও আপনাকে অ্যাকশন নিতে বলেছিলেন?

প্রফুল্ল মহন্ত : হ্যাঁ, দু'একবার বলেছিলেন। আমরা তো শ'দুয়েক আলফা যুবককে অ্যারেস্টও করেছিলাম

প্রশ্ন আপনার কি মনে হয় যে অসম আর একটা পঞ্জাব হতে চলেছে?

প্রফুল্ল মহন্ত : এটা বলা খুব কষ্টসাধ্য সৈন্যবাহিনী দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে মারাত্মক ভাবে নিপীড়ন করলে অবস্থা কি হবে তা বলা যাচ্ছে না

প্রশ্ন : সেনাবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে

প্রফুল্ল মহন্ত : বলছি, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অত্যাচারের সংবাদ আমাদের হাতে এসেছে তারা নির্দোষ যুবকদের ধরে পেটাচ্ছে এবং মেয়েদের ধর্ষণ করছে। যা কিছুই ঘটুক এসব চলতে দেওয়া যায় না

প্রশ্ন : আলফা অত্যাচার সম্পর্কে আপনার কোন অভিমত আছে কি?

প্রফুল্ল মহন্ত : প্রথম দিকে আলফা–র বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আমরা পাইনি। পরবর্তী সময়ে চা কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বিশাল অংকের টাকা পয়সা ওরা আদায় করতে গেলে গোলমাল শুরু হয়ে যায়।

প্রশ্ন : চারদিকে অভিযোগ উঠছে অসম পুলিশকে কাজে লাগিয়ে আলফা তাদের তহবিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছে

প্রফুল্ল মহন্ত : এগুলো একেবারেই বাজে গালগপ্প।

প্রশ্ন অসম আন্দোলনের সময় আপনারা যেমন বনধ ডাকতেন এবার কি সেরকম ধরনের আন্দোলনে নামবেন?

প্রফুল্ল মহন্ত : আন্দোলনের কর্মসূচি এখনও ঠিক করিনি তবে আমরা মানুষের কাছে যাব। বোঝাবো কেমন করে কংগ্রেস ও বড় ব্যবসায়ীরা আঁতাত করে অসমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে দিল।

প্রশ্ন : জনসাধারণের কাছে অ গ প–র ভাবমূর্তি কি নষ্ট হয়ে গেছে?

প্রফুল্ল মহন্ত : মোটেই না আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আগামী নির্বাচনে আগের চেয়েও বেশি ভোটে জিতে আমরা ক্ষমতায় আসব। কারণ অসমের জনসাধারণ অ গ প–র নিয়মনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

বিশেষ প্রতিনিধি

নেতাদের কাছ থেকে গুজবগুলির মধ্যে একটা এরকম–'সৈন্যরা একদল গ্রামবাসীর ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে' কিন্তু লেঃ জেনারেল বলজিৎ সিং বলছেন, 'একটা মিথ্যা হাজার বার বললে সেটা সত্যি হয়ে যায়–এটাই আলফার বিচ্ছিন্নতাবাদী লড়াই–এর এক মনস্তাত্ত্বিক কৌশল।' এখনকার সরকারি পক্ষ এবং সংখ্যালঘু জনগণ কিন্তু অ গ প–আসুকে আলফারই পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করে। তাই বর্ণহিন্দু অসমীয়াদের দল অ গ প'র বিরুদ্ধে তারা উপজাতি, অহোম, বাঙালি, কার্বি, দিমাছাদের নিয়ে জোটবদ্ধ হচ্ছে। ফলত এই অভিযান অসমের জলন্ত জাতপাত সমস্যাটিকে মুখোমুখি দুটি শিবিরে এনে ফেলেছে

সৈন্যদের পক্ষে একটি ভাল সুযোগ হচ্ছে অ গ প নেতাদের জনপ্রিয়তাহীনতা। অ গ প মন্ত্রীদের কাজকর্মের কল্যাণে জনমানসে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে দলের ইমেজ কি] ছাত্রসংগঠন আসু র কিছুটা জনপ্রিয়তা ধরে রাখার ক্ষমতা আছে কারণ মুখোশের মত করে হলেও তারা লোকদেখানো অ গ প সরকার-বিরোধিতা মাঝে মধ্যে করে যাচ্ছিল। এটাই রাজ্যপাল ডি ডি ঠাকুরের কাছে শঙ্কার যে উগ্র প্রাদেশিকতাবাদে আক্রান্ত ছাত্ররা একবার উগ্রজাতীয়তাবাদী চেতনায় উঠে পড়ে লাগলে তাদের সামাল দেওয়া খুব কঠিন কাজ। যেটা প্রফুল্ল মহন্তর নেতৃত্বে আসু করেছিল সত্তরের দশকে বিদেশি হঠাও আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অল গুয়াহাটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন–এর জেনারেল সেক্রেটারী হেমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন,'আমরা অসম আন্দোলনের সময় মিলিটারীর বিরুদ্ধে লড়েছি, আবার সেরকম করতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। অসমীয়ারা কারও অধীন হতে পারে না।' এভাবেই সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য, অতুল বোরা ও হেমন্ত বিশ্বশর্মার মত ছাত্রনেতারা প্রাদেশিকতাবাদী বক্তব্য রেখে অসমীয়া সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল, সংখ্যালঘু উপজাতিদের সঙ্গে বর্ণহিন্দু অসমীয়া জনগণের মুখোমুখি সংগ্রাম। ফলে বাড়বে বিচ্ছিন্নতাবাদ

ইতিমধ্যেই রাজ্যের মানুষদের মধ্যে এর প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে। উগ্র অসমীয়া জনসাধারণ আলফা–অ গ প–র অনুকরণে সৈন্যদেরকে 'ভারতীয়' বলে অভিহিত করছে এবং আলফাকে 'একদল দেশপ্রেমিক' এবং 'আমাদের ছেলে' বলে তকমা লাগাচ্ছে। এবং রটানো হচ্ছে কিভাবে ৪ হাজার মিলিটারীকে মাত্র ১৬ জনের একটি জংগি গ্রুপ সমগ্র রাজ্যে মহড়া নিয়েছে বলজিৎ সিং বলেন, 'সৈন্যদের এইসব প্রোপাগান্ডাকে আয়ত্ত করার সফলতা অর্জন করতে হবে আমার কথা হল আলফা সেনা নামানোর অবস্থা তৈরি করেছে অতএব আমরা লড়াই করে তাদের হটিয়ে দেব। কিন্তু এখনই আলফা মিলিটারীর মুখোমুখি হতে চাইছে না গেরিলারা স্থানীয় সহযোগিতা পেয়ে সফলতার সঙ্গে সৈন্যদের জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। মনে হয় নিরাপত্তা বাহিনীর চলে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে তারপরেই তারা আরও বেশি দলে ভারী হয়ে আরও বেশি ভয়ংকর শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই সময় অসমীয়া জনগণের সিংহভাগের সহানুভূতি তাদের ওপরে বেশ প্রকটভাবেই আছে।'

আলফা সভাপতি প্রদীপ দত্ত রায়

অ গ প এবং আসুকে সামনেকার রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসেবে রেখে নেপথ্য থেকে আলফা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালালে সাময়িকভাবে হয়তো অসম উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে পড়বে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের পথেই কি অসম চলে যাচ্ছে? –ওয়াকিবহাল মহলের এই প্রশ্নের মধ্যে কিছুটা আপাত গুরুত্ব থাকলেও এধরনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কেননা কাশ্মীর বা পঞ্জাবের মত অসম একেবারে সীমান্তবর্তী রাজ্য নয়। অসম এবং সীমান্তের মধ্যে ব্যবধান গড়ে রেখেছে মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও ত্রিপুরার মত রাজ্যগুলি যদিও বর্মা এবং চীন একটি করে রাজ্য পার হলেই অসমকে স্পর্শ করতে পারবে তবুও ওই দুই বিদেশি রাষ্ট্রের পক্ষে পঞ্জাব-কাশ্মীরের মত পরিস্থিতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তার উপর অসমের সমস্যা ভাষা এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। ধর্মীয় সুড়সুড়ি এখানে অনুপস্থিত। সর্বোপরি সমস্ত অসমীয়ারাই আলফা বা অ গ প–র সমর্থক নন। অসমীয়াদের মধ্যে কংগ্রেসের তরুণ গোগই এবং অহোম ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে হিতেশ্বর শইকিয়ার প্রভাব বেশখানিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে।

তবুও অ গ প এবং আসুকে সামনেকার রাজনৈতিক ফ্রন্ট হিসেবে রেখে নেপথ্য থেকে আলফা চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালালে সাময়িক-ভাবে হয়তো অসম উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে পড়বে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে। কিন্তু কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারগুলির লৌহ কঠিন সংহতি ইচ্ছা জারী থাকলে ভারতকে টুকরো করার মত রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি তারা কোনমতেই অর্জন করতে পারবে না। এর প্রমাণ তো অ গ প পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের প্রধান হিসেবে হিতেশ্বর শইকিয়া রেখেছিলেন। বিদেশি হঠাও আন্দোলনের দুই কর্তা আসু ও অ গ প–কে তিনি প্রায় বোতলবন্দী করেই ফেলেছিলেন। রাজীব গান্ধী উদারতা দেখাতে গিয়ে দলকে ডুবিয়ে অসম চুক্তি করলেন এবং হিতেশ্বর শইকিয়াকে টেনে নামালেন। তারই প্রত্যক্ষ ফল হল এই অ গ প উত্থান এখন সেই হিতেশ্বর শইকিয়া যাকে রাজ্যের ৪০ শতাংশ সংখ্যালঘু এবং ৩০ শতাংশ উপজাতিরা অ-অসমীয়া আশ্রয়স্থল বলে মনে করে তিনিই পরিকল্পনা করছেন নির্বাচনী যুদ্ধের। রাজ্যপাল সূত্রে জানা গেছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন এবং আলফার বন্দুক ব্যবহার করতে না পারলে অ গ প যে আসতে পারবে না তা একেবারে নিশ্চিত অপারেশন বজরং অসমে সত্যি শান্তি আনতে পারবে যদি সে আলফাকে পুরোপুরি নির্বিষ করে ফেলতে পারে। শান্তিপ্রিয় অসমবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন তারই প্রতীক্ষায়।

–রমাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি: অশোক বসু ও বিকাশ চক্রবর্তী

আর জি কর : ৭৫ বছরের আলোয়

প্লাটিনাম জুবিলি উদযাপিত হতে চলেছে আর.জি. কর মেডিকেল কলেজের। বাংলার প্রথম জাতীয় চিকিৎসালয়টি কিভাবে মানুষের বিপদে আপদে সুচিকিৎসার দায়িত্ব পালন করে চলেছে, আলোচনাক্রমে তারই অনুবর্তন পটটি তুলে আনা হয়েছে এবারের প্রতিবেদনে।
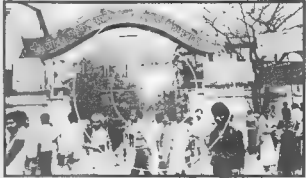
আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

১৯১২ সাল। ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সে এক লজ্জাজনক সময়। ক্রমশই বেশি বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ গোরা সাহেবরা নেটিভদের ভয়ে একটু যেন সন্ত্রস্ত। এইরকম এক সকালে ঘোড়ার গাড়িতে করে শিয়ালদহ স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন এক দম্পতি। বাংলার প্রশাসনিক বিভাগের এক কর্তাব্যক্তি শ্রীযুক্ত অ্যালবার্ট ভিক্টর এবং তাঁর স্ত্রী, তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু জিনিসপত্র। কিন্তু স্টেশনচত্বরে একটিও কুলি নেই। নিরুপায়ভাবে তাঁরা এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, এমন সময় দু'জন ভদ্র যুবা এগিয়ে এল তাঁদের দিকে। স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিল বেডিং এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। ভিক্টর দম্পতির মনে প্রথমে কোনরকম সংশয়ই দেখা যায় নি। নিভাবনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা গাড়ির দিকে। কিন্তু হঠাৎ শ্রীমতী অ্যালবার্ট ভিক্টর খেয়াল করলেন যে ছেলে দুটি নিজেদের মধ্যে ইংরাজিতে কথা বলছে। যুবক দু'টিকে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহ করে শংকিত হয়ে উঠলেন তিনি। ততক্ষণে সকলে পৌঁছে গেছেন সেলুন গাড়ির কাছে। স্বামীকে ব্যাপারটা জানানো মাত্রই শ্রীযুক্ত ভিক্টর চেপে ধরলেন যুবক দুটিকে। না আশংকা অমূলক। সন্ত্রাসবাদী ওঁরা নন। একটি হাসপাতাল তৈরি করতে চান—সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য। তাই নিজেরাই কুলিগিরি করে পয়সা তুলছেন। এই দুই যুবকের একজন হলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর এবং অন্যজন ডাঃ নীলরতন সরকার—বাংলাদেশের দুই প্রখ্যাত চিকিৎসক। সেদিন তাঁদের কথায় অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন ভিক্টর দম্পতি। তখনই তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন যে হাসপাতাল তৈরির জন্য তিন লাখ টাকা দান করবেন। আর সেই টাকাতেই ১৯১৬ সালে চালু হল 'মিসেস অ্যালবার্ট ভিক্টর ওয়ার্ড,' আজকের আর জি কর মেডিকেল কলেজের (১৯৯১ সালে যার প্লাটিনাম জুবিলি অর্থাৎ ৭৫ বৎসর পূর্তির উৎসব হতে চলেছে) প্রথম চিকিৎসা বিভাগ।

১৮৩৫ সালে বৃটিশদের উদ্যোগে তৈরি হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। কিন্তু সেখানে বৃটিশ ছাড়া অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। ভারতীয়দের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। তাই তখনকার প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চাইছিলেন একটি জাতীয় হাসপাতাল গড়ে তুলতে যেটি হবে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের জন্যই। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার, কেদারনাথ দাস, ডাঃ অমল রায় চৌধুরী প্রমুখ। শ্যামবাজার অঞ্চলে তখন ডাক্তারি পড়ার জন্য কারমাইকেল মেডিকেল স্কুল এবং তৎসংলগ্ন হাসপাতাল ছিল। ১৯১৬ সালে যেটিকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হয়। তখন নাম ছিল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ। ১৯২২ সালে এই কলেজ থেকে প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা পাস করেন। এদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ভূপাল বসু, মদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ গোপাল দাস নাগ প্রমুখ। সেই সময় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ অমল রায় চৌধুরী। স্বাধীনতার আগে এখানে এম এস ডিগ্রি দেওয়া হত, এম বি বি এস নয়। কিন্তু কেউ যদি ছ' বছরের মধ্যে কোন একটি পরীক্ষায় পাস করতে না পারেন তবে তাকে দেওয়া হত এল এম এস ডিগ্রি। এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প আছে আর জি করের অধ্যাপক ডাঃ মণি ঘোষের স্মৃতিতে। পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় তখন এই কলেজের ছাত্র। একদিন তিনি কলেজে আসছিলেন। দেখলেন তাঁর চোখের সামনেই মেডিসিনের ব্রিটিশ অধ্যাপকের গাড়ির কোচোয়ান নিরীহ মানুষকে ধাক্কা মারল। সাক্ষী দেওয়ার প্রয়োজন হলে বিধান রায় সত্যি কথাই বললেন। দোষ লোকটির নয়, সাহেবের কোচোয়ানের। এর দরুন যথেষ্ট কঠিন শাস্তি পেতে হল তাঁকে। সেই অধ্যাপক নিজের বিষয়ে তাঁকে পাস করালেন না। চিকিৎসা জগতের প্রবাদ পুরুষ বিধান রায় তাই আর জি কর থেকে এল এম এস ডিগ্রি নিয়েই বেরিয়েছিলেন।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই কলেজ ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন। স্বাভাবিকভাবেই সুযোগসুবিধা অনেক কম ছিল। একদিকে যেমন যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যেত না আবার অন্যদিকে যথেষ্ট অভাব ছিল চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির। ছাত্ররা সরকারি জলপানি বা ভাতার সুবিধা পেত না। ফলে ছাত্র এবং শিক্ষক যৌথভাবে আন্দোলন করেন কলেজটি জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে। ফলস্বরূপ

১৯৫৮ সালে এই কলেজের জাতীয়করণ হয় ১৯৬২ সাল থেকে সমস্তরকম সরকারি সুযোগ-সুবিধাও পেতে থাকে অবশ্য ইতিমধ্যেই কলেজের নাম বদলে গেছে স্বাধীনতার পর থেকেই নাম হয়েছে ' আর জি কর মেডিকেল কলেজ।'

আজকের কলকাতায় এই কলেজ এবং হাসপাতাল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে বিশেষত উত্তর চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অনেকটাই এই হাসপাতালের ওপর নির্ভর শীল। হাসপাতালে বর্তমানে তেরটি বিভাগ আছে- মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, আই, ই এন টি, অর্থোপেডিক্স কার্ডিওলজি, পেডিয়াট্রিক্স (যেখানে শুধু মাত্র শিশুদের চিকিৎসা হয়) ভারমাটলজি (যৌন রোগের চিকিৎসা), রেডিওথেরাপি, ফিজিকাল মেডিসিন এবং রেডিওলজি এছাড়া নন ক্লিনিকাল কিছু বিভাগও আছে যেমন, প্রিভেনটিভ এণ্ড সোশাল মেডিসিন, প্যাথলজি, অ্যানাটমি আর ফারমাকলজি

হাসপাতালে বাচ্চাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ওয়ার্ড আছে। তার মধ্যে পেডিয়াটিক মেডিসিন আর পেডিয়াটিক্স সার্জারির আলাদা বিভাগ যেমন আছে, তেমনি আবার একটি 'বেবি নার্সারি'ও আছে। এই নার্সারিটি কিছুদিন আগেই মাদার টেরিজা উদ্বোধন করেছেন

বর্তমানে এই হাসপাতালের স্বীকৃত বেডের সংখ্যা ১০৮৭। প্রতিটি বিভাগের জন্যই নির্দিষ্ট সংখ্যক বেডের ব্যবস্থা আছে। তবে স্বাভাবিক ভাবেই মেডিসিন এবং সার্জারিতেই বেডের সংখ্যা সব থেকে বেশি। এছাড়া ৩৫টি বেড নির্দিষ্ট থাকে এমারজেন্সির জন্য।

আর জি কর হাসপাতালের মাইক্রোসার্জারি অত্যন্ত উন্নত এখানে রিকেনালাইজেশন নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন হয়। আজকাল অনেক মহিলারাই দু'একটি বাচ্চা হয়ে যাবার পর আর মা হতে চান না। তখন তাদের ফেলোপিয়ান টিউবে একটি অপারেশন করা হয়—যাকে বলে লাই গেশন। কিন্তু এর পরে যদি কোন কারণে কারুর সবগুলি সন্তানেরই মৃত্যু হয় তাহলে তিনি যাতে আবার সন্তানধারণ করতে পারেন তার জন্যই রিকেনালাইজেশন অপারেশন করা হয়। এই অপারেশনের সাহায্যে ফেলোপিয়ান টিউবকে আবার খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরনের চোখের অপারেশনের ব্যবস্থাও এখানে আছে। ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য 'টেলি কোবাল্ট' নামে একটি ইউনিট খোলার ব্যবস্থাও হচ্ছে যেটি ভারতের অন্য কোথাও নেই

এই হাসপাতালে সিনিয়র, জুনিয়র, ইন্টার্ন হাউস স্টাফ মিলিয়ে ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় চারশ কিন্তু প্রয়োজনে বড় ডাক্তারদের প্রায় কাউকেই পাওয়া যায় না। দেখাশোনার ভার থাকে নার্স এবং জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর দামী ওষুধ বা যন্ত্রপাতি অনেক সময়ই চালান হয়ে যায় ডাক্তারের নিজস্ব চেম্বারে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও চরম অব্যবস্থা। রোগীর তুলনায় বেডের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল তাই মরণাপন্ন রোগীকেও মাটিতে ফেলে রাখা নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা সদ্যোজাত শিশু আর তার মা'কে এইরকম অযত্ন–অবহেলায় ফেলে রাখার দরুন প্রায়শই শিশুর যেমন মৃত্যু হয় তেমনি

অধ্যাপক ডঃ মণি ঘোষ

মা'ও আক্রান্ত হন নিদারুণ সূতিকা–রোগে। এছাড়া ময়লা বিছানা, অপরিষ্কার বাসনপত্র আর নোংরা করিডরে কুকুর ঘুরে বেড়ানর কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। হাসপাতালে সর্বক্ষণের জন্য এক্স রে এবং ই সি জি মেশিন চালু রাখার ব্যবস্থা আছে তবে মেশিন খারাপ থাকলে তো আর কারুর দোষ দেওয়া যায় না তাই এক্স রে ডেট পেতে অনেক সময়েই মাসের পর মাস কেটে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। জীবনদায়ী ওষুধও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না।

জন্মলগ্ন থেকেই আর জি কর মেডিকেল কলেজে আন্দোলনের ঐতিহ্য বর্তমান ভারতীয়-দের চিকিৎসার জন্য ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই এই কলেজের সৃষ্টি আর এই ঐতিহ্য বজায় রয়ে গেছে তার পরবর্তী যুগেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল এই কলেজের ছাত্ররা প্রায়শই কলেজে ক্লাস চলাকালীন পুলিশ যখন হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ত, বিদ্রোহী ছাত্রদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে তখন অধ্যাপক এবং সতীর্থরাই তাদের সাহায্য করতেন পালাতে। অনেক সময় নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও অধ্যাপকরা ছাত্রদের রক্ষা করেছেন প্রশাসনিক ক্রোধের হাত থেকে তারপর দেশ স্বাধীন হল। সূচনা হল নতুন যুগের। ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ আবার সত্তর দশকে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ল আর জি করের বুকে। ঘটে গেল বাঞ্ছিত–অবাঞ্ছিত বহু ঘটনা। '৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল আশির দশক পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নিরুত্তাপ নিস্তেজ সময় কিন্তু সেই আশির দশকেও দু'বার ছাত্রবিক্ষোভে কেঁপেউঠেছিল আরজিকরের প্রাঙ্গণ। দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় উঠে এসেছিল খবর

ডঃ শ্যামল ঘোষ জানালেন, '৮৩ সালের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের খবর। টানাপোড়েন শুরু হয় প্রথমে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সিনিয়র আর জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে একরকম চাপা দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে সেবার বর্ধমানের এক সিনিয়র ডাক্তার অভিযোগ করেন যে একজন হাউস স্টাফ তাঁকে মারধোর করেছেন কিন্তু সেই হাউস স্টাফ ছিলেন শারীরিক প্রতিবন্ধী। ফলে অন্যান্য হাউস স্টাফরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ঘটনার জের ছড়ায় অনেক দূর। কলকাতায় নতুন ধারায় শুরু হয় আন্দোলন আর জি কর–এ যাঁরা ডি এস এ–র ব্যানারে ছাত্র সংগঠন করতেন তাঁরাই তখন পাশ করে গড়ে তুলেছেন জে ডি এ বা জুনিয়র ডাক্তার অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতার চারটি মেডিকল কলেজের ডাক্তাররা একত্রে গড়ে তুললেন এ বি জে ডি এফ। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের ভাতা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম ছিল। তাই আন্দোলনের একটি মূল দাবি হয়ে উঠল ভাতা বাড়ানো। এছাড়া চব্বিশ ঘন্টার জন্য এক্স রে, ই সি জি চালু করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ বজায় রাখাও ছিল অন্যতম দাবি। আন্দোলন চলাকালীন তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্র পেটায় তিনজন জুনিয়র ডাক্তারকে সাসপেণ্ড করা হয় প্রায় দশ বার দিন আন্দোলন চলার পর শেষ পর্যন্ত দু'টি দাবি সফল হয় ডাক্তারদের প্রথম তিনজন ডাক্তারের ওপর থেকে শাস্তি তুলে নেওয়া হয় আর ভাতাও বেড়ে ১৫০০–২০০০ টাকা হয়ে যায়। এক্স রে, ই সি জি মেশিন চব্বিশ ঘন্টা চালু রাখার দাবিও স্বীকার করে নেওয়া হয়

এরপর কয়েক বছর চুপচাপ থাকার পর আবার ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় '৮৭ সালে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র বাসুদেব মুখার্জি আর অতীশ সরকার জানালেন যে, সেবারও আন্দোলন শুরু হয় জনৈক সিনিয়র ডাক্তারের অনৈতিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেই। তিনি হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি প্রয়োজনে নিজের ব্যক্তিগত চেম্বারে নিয়ে যেতেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বিশেষ কিছু কিছু জুনিয়র ডাক্তারকে অপমান করতে থাকেন। স্বভাবতই হাউস স্টাফরাও অসন্তুষ্ট হন এবং ঝামেলা শুরু হয় এর ফলে শেষ পর্যন্ত দু'জন ডাক্তার সাসপেণ্ড হয়। আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ রাত্রি বেলায় জোর করে এই দু'জন ছাত্রকে হস্টেল থেকে বের করে দেয়, তাদের জিনিসপত্র

ফেলে দেওয়া হয় রাস্তায়। পরের দিন থেকে সাত-জন ছাত্র টানা অনশন শুরু করে। অনশনের চতুর্থ দিন রাত্রে পুলিশ এসে ছাত্রদের সাংঘাতিকভাবে মারধোর করে। এমন কি কোন মহিলা পুলিশ না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীরা রেহাই পায় না। পরের দিন প্রশান্ত শূর বিবৃতি দেন যে ছাত্রদের দমন করার জন্য প্রয়োজন হলে তিনি হিটলারও হবেন। বার দিন অনশন চলার পর ছাত্রদের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ডি এস এ আন্দোলন তুলে নিতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র তিনজন ছাত্রের শাস্তির আদেশ তুলে নেওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই তারা অর্জন করতে পারে না। তবে একটি বিশেষ পদক্ষেপ নিতে রাজ্য সরকার বাধ্য হন। খবরে প্রকাশ, এর আগে পর্যন্ত ডাক্তারি পাস করার পর অধিকাংশ সরকারি চাকরিই পেতেন এস এফ আই এর নেতারা। সাধারণ ছেলেদের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এরপর থেকেই সরকারি চাকরির জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা চালু হয়।

বর্তমানে অবশ্য আর জি কর অনেক শান্ত। যদিও হস্টেলের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। হাসপাতালের অব্যবস্থাও চূড়ান্ত। তবু ছাত্রদের মধ্যে নাড়াচাড়া কম। তাতা বৃদ্ধি জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যেও কাজ করেছে ঘুমের ওষুধের মত। ফলে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ঘটছে চরম অধঃপতন। ছেলেদের হোস্টেলে নাকি ব্লু-ফিল্ম দেখানো বা 'জোবেলিয়া'র অশ্লীল গান শোনা এখন সাধারণ দৃশ্য। আবার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ-দের পয়সায় মদ খাওয়া বা ফূর্তি করা বা গরিব রোগীর অসহায় মেয়েকে ব্যবহার করাও নাকি জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা।

মেডিকেল কলেজগুলিতে জুনিয়র এবং সিনি-য়র ডাক্তারদের মধ্যে কখনোই খুব সুসম্পর্ক নেই। ইদানিং এই অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। আর জি করের ছাত্ররা জানালেন যে, বর্তমানে পরীক্ষায় পাস করার জন্য অধ্যাপকদের কাছে টিউশন পড়তে বাধ্য হন অনেকেই। হাউস স্টাফ বা ইন্টার্নরা নিজেদের ভবিষ্যতের খাতিরে মেনে নেন সিনিয়র ডাক্তারদের অন্যায় আদেশ। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তাও নয়। এখনও অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁরা একদিকে যেমন যত্ন করে ছাত্রদের পড়ান, সাহায্য করেন, তেমনি আবার হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর জন্যও যথাসাধ্য করার চেষ্টাও করেন।

ছাত্র এবং ডাক্তার ছাড়াও আর জি কর মেডিকেল কলেজে যাঁদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে তাঁরা হলেন অশিক্ষক কর্মচারি। সি পি আই (এম) এর সাংগঠনিক পরিকাঠামো এখন এত নিখুঁত যে প্রায় সবরকম আন্দোলনই নাকি তাঁরা ভেঙে দিতে পারেন কেবলমাত্র পাল্টা ব্যবস্থা চালু করে। অর্থাৎ ডাক্তাররা আন্দোলন করলে পেটোয়া ডাক্তার আনতে পারেন, ছাত্ররা আন্দোলন করলে ক্যাডার দিয়ে পেটাতে পারেন—কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম-চারীরা যদি আন্দোলন করে তাহলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, কারণ হাসপাতালের নোংরা পরিষ্কার করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। অথচ আজ এরাই সব থেকে বেশি অবহেলিত। ভেঙে যাওয়া হোস্টেল বাড়ির বদলে ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেল তৈরি হয়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন হাসপাতালও। অথচ সত্তর সালে কলেজের মধ্যে যে মিলিটারি ব্যারাক তৈরি হয়েছিল আর আজকে পি ডব্লু ডি-র মতানুসার যেটি 'ব্যবহারের অনুপযুক্ত' বলে ঘোষিত সেই বাড়িটিতে ছোট ছোট পায়রার খুপরির মত ঘরে থাকেন তাঁরা। অভি-যোগ, এদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যারা সুবিধা-ভোগী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত—হাসপাতালের ওষুধ বা খাবার বাইরে পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। তবে অধি-কাংশই দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এদের মধ্যে কোন একতা নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সংগঠন এদের বহুধাবিভক্ত করে রেখেছে। তাই কোন সংগঠিত জঙ্গী আন্দো-লন গড়ে ওঠে না আর এদের অবস্থারও কোন পরি-বর্তন ঘটে না। তবে অধ্যাপকদের সঙ্গে তেমন না হলেও ছাত্রদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভালো। পরস্পরের প্রয়োজনে অনেক সময়ই সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে। বিশেষত '৮৭ আন্দোলনের সময় পুলিশের মোকাবিলায় কর্মচারীরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন ছাত্রদের।

পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত। যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে আর জি কর মেডিকেল কলেজ তার যাত্রা শুরু করেছিল তার হিসাব নিকাশের একটা দায় থেকেই যায়। মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়ের জন্য বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা বা প্রশান্ত শূরের ভাইপোর ইচ্ছাকৃত গাফিলতির জন্য দরিদ্র রোগীর মৃত্যু বা সিটু ইউনিয়নের অপর্যাপ্ত চুরির প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না জানিয়েও বলতে হয় যে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসার আশায় আসেন এই হাসপাতালে। তাদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক রোগীও যদি সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বে সুস্থ জীবন ফিরে পান তাহলেই হবে আর জি কর মেডিকেল কলেজের এই দীর্ঘ পথ অতি-ক্রমনের সার্থকতা।

দীপান্বিতা রায়

ছবি সুস্মিতা চৌধুরী

জুনিয়র ডাক্তার শ্যামল ঘোষ

বাসুদেব মুখার্জি (ছাত্র, চতুর্থ বর্ষ)

অতীশ সরকার (শেষ বর্ষের ছাত্র)

কিল । [illegible] জ্যাপ চেকিং স্টাফকেই চেষ্টা করেন [illegible]নের নির্দেশ মেনে চলতে । এখানে একটা তথ্য [illegible] ধরলে নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না–ভারতীয় রেলের [illegible] ডিভিসনের চেয়ে খড়্গপুর-হাওড়া ডিভিসনের চেকিং ব্যবস্থা অনেক বেশি [illegible] । এমনকি যে কোন ডিভিসনের থেকে এই সেকসনের [illegible] স্টাফরা [illegible] পরিমাণ [illegible] আদায় করে [illegible] রেলের অর্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ [illegible] ।

বিভাগীয় নির্দেশ মত ১৬০ জন টি টি ই এবং ১৬ জন টি সি-র দক্ষতার ফলে প্রাপ্ত মার্চে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা [illegible] ডিভিসনের দুজন টি টি ই এপর্যন্ত সর্বভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন রেকর্ড পরিমাণ জরিমানার টাকা আদায় করে । এঁরা হলেন মিঃ ডি কে ঘোষ ও মিঃ এস খাঁটিয়া । এছাড়াও এই বিভাগের বহু টিকিট [illegible] পেয়েছেন ডিভিসনের প্রশাসনিক পুরস্কার

সাত তারিখ বেলা ১১টা নাগাদ ম্যাজিস্ট্রেট চেকিং শেষ করে সমস্ত কর্তব্যরত চেকিং স্টাফ ফিরে গেলেন হেড কোয়ার্টার খড়্গপুরে । একদিকে কিছুটা [illegible] হলেও ঠিকাদার কর্মী দেবাশিস ওঝার আটকের খবর ঠিক [illegible] পৌঁছলো ঠিকাদার কর্মী সমর্থন [illegible] কাছে । সংবাদে তারা রীতিমত উত্তপ্ত [illegible] ছুটে গেল পাঁশকুড়া স্টেশনে । [illegible] যে হস্তান্তর ছেড়ে দিতে হবে দেবাশিস ওঝাকে । শেষে রাত্রি প্রায় [illegible] নাগাদ জি আর পি [illegible] থেকে দেবাশিস ওঝাকে পার্সোনাল বন্ডে রিলিজ করিয়ে নিয়ে [illegible] ফিরে এল [illegible] বসল মিটিং । রাতারাতি ঠিক হল যে চেকিং স্টাফদের হাতে দেবাশিস ধরা পড়েছিল–প্রতিশোধ তাদের বিরুদ্ধে নিতে হবে যে কোনও মূল্যে । যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির মত বালিচক, শ্যামচকে সারা রাত বাড়ি বাড়ি গিয়ে চলতে থাকে ঠিকাদার কর্মী স্থানীয় সিটু সমর্থকদের নাম সংগ্রহের কাজ । ক্ষুব্ধ এক টি টি ই–র মুখে শোনা গেল, একটা অন্যায়–এর পক্ষে কতবড় লজ্জাজনক ভাবে আরেক অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া ।

ডিসেম্বরের আট তারিখ । সকালে সূর্য ওঠার আগেই শীতের সকালে কয়েকশ সশস্ত্র জনতা এসে হাজির হল বালিচক স্টেশনে । অসাধারণ একতা । সবাই যেন এই শপথ নিয়েছেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' । লাঠি, টাঙি, তীরকাটা, শাবল ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত প্রতিবাদী তুর্কীরা । অপেক্ষা শুধু শিকারের জন্য । প্রায় সাতটা তিন চার নাগাদ এম এইচ ১০৬ নম্বর ডাউন ই এম ইউ কোচটি পৌঁছতেই প্রায় কয়েকশ উন্মত্ত সশস্ত্র যুবক এগিয়ে এল কম-পার্টমেন্টের দিকে । টি. টি. ই এম এস ঘোষকে প্লাট-ফর্মে দেখতে পেয়েই চকিতে ঘিরে ফেলল সবাই প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়লেন মিঃ ঘোষ । ব্যাপারটা কি আঁচ করতে পারছেন না ততক্ষণে ক্ষিপ্ত কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর উপর ।

একদিকে এলোপাথাড়ি নির্দয় ভাবে শারীরিক নির্যাতন চলছে মিঃ ঘোষের উপর, অন্যদিকে একই [illegible] আসা আরও কয়েকজন টি টি ই এ. আর. [illegible], এস আর রায় ও হাওড়া–খড়্গপুর ডিভিসনের সি টি আই ইনচার্জ মিঃ এস সি [illegible] বলপূর্বক নামানো হয়েছে প্লাটফর্মে । বেশ কিছু উত্তেজিত যুবক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর করতে শুরু করে অমানবিকভাবে । মিঃ [illegible] বুঝতে পারেন না যে আগের দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত [illegible] পারে । পরে অবশ্য এদের স্থানীয় সিটু [illegible] অফিসে নিয়ে গিয়ে আটক করে

রাখা হয় । এরপর মাদপুর থেকে শুরু করে হাউর পর্যন্ত বিভিন্ন ট্রেন থেকে টি টি ই-দের বালিচক স্টেশনে নিয়ে আসা [illegible] ৭ জনকে আটক করে রাখা হয় সিটু অফিসে । এদের মধ্যে [illegible] (টি টি আই), বি [illegible] প্রধান (টি টি ই), ডি কে দাস (ভলেন্টিয়ার), গোস্বামী [illegible] মাইতি সহ বেশ কিছু রেলওয়ে চেকিং স্টাফের উপর অন্যায়ভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয় । ঘটনা এখানেই শেষ নয় । আক্রমণকারীরা আক্রান্তদের কাছ থেকে রেলওয়ে পাস, [illegible] কিছু টাকা, পয়সা, [illegible] ঘড়ি, আংটি, চাদর ছিনিয়ে নেয় । এই ঘটনার প্রতি

চেকিং চলছে

বাদে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নিত্যযাত্রী সোচ্চার হলে তাঁরাও রেহাই পান নি হঠকারী ঠিকাদার কর্মীদের হাত থেকে। ফলে আর কেউ সাহস করেন নি এগিয়ে যেতে। খুবই পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ যে হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে গেল যখন ডেবরা পুলিশ স্টেশনে আক্রান্তকারীর কয়েকজন যোগাযোগ করেন। তাদের নিস্পৃহতা এবং নিস্ক্রিয়তাই প্রমাণ করে শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। এই অভিযোগ টি টি ই-র প্রধান অধিরক্ষক মিঃ হেমব্রমের। শুধু তাই নয়, রাধামোহনপুরে নিরাপত্তার অভাবে তিনজন টি টি ই মিঃ জি কে ঘোষাল, জে কে দত্ত, জে আর পাল এস এস এ-র ঘরে আশ্রয় নেন কিন্তু ওই শ্রমিক ইউনিয়ন ফের হামলা চালায় সেখানে এই ঘটনা মিঃ হাঁসদা সঙ্গে সঙ্গে এ সি এস ওয়েস্টকে ফোনে জানান। এছাড়াও বিক্ষোভকারীরা যে ট্রেন অবরোধ করে রেখেছে এবং আশ্রিত ওই তিজনকে তাদের হাতে তুলে দে ার দাবি করছে একথাও তিনি জানান। উত্তরে এ সি এস ওই তিন ব্যক্তিকে জন-রোষের সামনে ছেড়ে দিতে বলেন নির্দেশ মত তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং নির্মমভাবে তাদের মারধোর করলে জি কে ঘোষাল গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

ঘটনার চার ঘন্টা পর খড়্গপুর থেকে এ এস পি, ডি এস, আর পি এবং আই আর পি সহ বেশ কয়েকজন জি আর পি-কে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেই সময় প্লাটফর্মের উপর স্থানীয় সিটু নেতা রাসবিহারী পাত্র ও গোচরণ মণ্ডল এর নেতৃত্বে মিটিং চলছে রেলওয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ও মিঃ হোসেনের শাস্তির দাবি জানিয়ে মিটিং এ মিঃ হেমব্রমকে কবুল করতে বাধ্য করানো হয় যে বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরা তাদের অপরাধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ওই ঠিকাদার শ্রমিকদের কোনও টিকিট চাওয়া চলবে না ইত্যাদি। এর কিছু পরে আটকে রাখা চেকিং স্টাফদের শর্তসাপেক্ষে ছাড়া হয়।

আহত ট্রেন টিকিট এগজামিনারদের নিয়ে খড়্গপুরে ফিরে আসেন মিঃ এস সি হেমব্রম। এর মধ্যে জি কে ঘোষাল, এস এম ঘোষ, এ কে দালালকে স্থানীয় রেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং জি আর পি খড়্গপুরে একটি এফ আই আর করা হয়। নম্বর ৬৫/৯০, তারিখ ৮ ১২.৯০ এই ঘটনায় সমস্ত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চেকিং স্টাফরা ক্ষোভে দুঃখে মর্মাহত। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনটি চেকিং স্টাফ ইউনিয়ন যৌথভাবে ডি আর এম-এর অনুপস্থিতিতে এ ডি আর এম-কে নিরাপত্তা কোটা কালেকশন না দিতে পারায় বিভিন্ন স্টাফদের শাস্তিদান, চেকিং-এর নিরাপত্তা ইত্যাদির দাবিতে প্রায় দেড়'শ চেকিং স্টাফ দাবি সনদ পেশ করেছেন। মিঃ হেমব্রম খুবই দুঃখের সঙ্গে জানালেন, 'নিরাপত্তার অভাবে রানিং চেকিং স্টাফরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারছেন না।'

এস সি হেমব্রম

হাওড়া স্টেশনের কর্তব্যরত হেড টি টি মিঃ মানব চৌধুরী, সি আই টি সি কে মণ্ডল, সি আই টি এ কে দাস, এন সি মণ্ডল, মিঃ এ কে ঘোষাল সহ বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি রেলওয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

চেকিং স্টাফদের নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা বিতর্কের অবতারণা হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর বিভাগের নিয়ন্ত্রণে প্রায় পাঁচ'শ পাঁচ জন চেকিং স্টাফ এবং পূর্ব রেলে পাঁচশ কুড়ি। এঁদের প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন প্রায়শই হতে হয় খোদ হাওড়া স্টেশনে যাত্রী ও টি সি দের মধ্যে কত অভিনব ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন পর্যায় ক্রমে হেড টি সি সহ ১৭৮ জন টি সি-র জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে নানা ঘটনা। এই তো গত বছরই একজন টি সি অবাধে বেআইনীভাবে রোজগারের দায়ে হাওড়া জি আর পি-র সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। ঘটনা উঠে এল দৈনিক পত্রিকার। এর আগেও অবশ্য বছর তিনেক আগে এই হাওড়াতেই ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটেছিল টি সি জি আর পি-র মধ্যে। আসলে যাঁরা কর্তব্যরত অবস্থায় থাকেন তাঁদের অনেক দায়িত্বশীলও হতে হয় কিন্তু নানা অবস্থার মাঝে পড়ে তা অনেকেই পালন করতে সক্ষম হন না। বর্তমানে রেলওয়ে জরিমানা দশ থেকে বেড়ে গিয়ে পঞ্চাশে পৌঁছেছে এবং লাগেজ-এর ক্ষেত্রে পনের টাকা ফলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট কোটা পূরণ -এর জন্য তাঁদের অনেক ঝুঁকি নিতে হয় আবার কেউ কেউ স্রোতে গা ভাসায় বর্তমানে বহুসংখ্যক উৎসাহী যুবক যোগ দিয়েছেন টি টি ই বা টি সি-র চাকরিতে। কিন্তু প্রশাসনিক খামখেয়ালিপনা এবং প্রতিকূল কাজের পরিবেশ তাঁদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে ফলে অনেকে কেরাণী পদে ফিরে যেতে চাইছেন এবং যাচ্ছেনও অনেক টি সি অভিযোগ করে বললেন, 'দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা অসহ্যকর। তার উপর কর্তৃপক্ষ যে ইউনিফর্ম দেন তা অনেক সময় জোকারের মত লাগে।'

হাওড়া স্টেশনের কর্তব্যরত হেড টি টি মিঃ মানব চৌধুরী, সি আই টি পি কে মণ্ডল, সি আই টি এ কে দাস, এন সি মণ্ডল, মিঃ এ কে ঘোষাল সহ বহু দায়িত্বশীল ব্যক্তি রেলওয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ প্রতিদিন যাত্রী সাধারণের সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হয় ই এম ইউ ট্রেন বা দূরপাল্লার ট্রেনের সমস্যা একটু আলাদা। যেমন দূর পাল্লার ট্রেনগুলির জেনারেল কমপার্টমেন্ট একটি কিংবা দু'টি সেক্ষেত্রে রেল কয়েক হাজার টিকিট বিক্রি করে থাকে নিরুপায় যাত্রীরা সংরক্ষিত কামরায় গিয়ে উঠে পড়ে। বাস্তবে সমস্ত ঝামেলা পোহাতে হয় ওই টি টি ই-দেরই। হয়রানি হয় যাত্রীদেরও। এছাড়া বাহাত্তর বার্থের কমপার্টমেন্টে প্যাসেঞ্জার অ্যালট করা হয় উন-আশি জনকে। যার মধ্যে এগারো জন আর এ সি সিটিং এ্যাকোমডেশন শেষ অবধি পাঁচ জনকে বাথ দেওয়া সম্ভব হয়। বাকীরা কোথায় যাবেন এর সদুত্তর কিন্তু রেল প্রশাসন জানেন না। লক্ষ লক্ষ যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া উচিত। তবেই নির্বিঘ্নে কাজ করা সম্ভব হবে সকলের

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চেকিং স্টাফদের চাপা ক্ষোভ জমাট বেঁধে আছে দীর্ঘ দিন। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের টিকিট এগজামিনার এবং টিকিট কালেক্টরই শুধু নয়, পূর্ব রেলওয়ের সব বিভাগের চেকিং স্টাফদের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে খুবই জোরাল, যেন একই সুরে বাঁধা সেতার

আব্দুল কাইউম

ছবি কাজী আব্দুর মোহিত ও বিকাশ চক্রবর্তী

ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডে বেআইনী কাজকর্মের অফিসার চক্র

ই সি এল-এর হেড অফিস

ছবি বিকাশ চক্রবর্তী

'আলোকপাত' এ প্রকাশিত ই সি এল স্টোরির প্রেক্ষাপটে সি বি আই এর হাতে কর্মকর্তা টিকে সিং গ্রেপ্তারের পরও ওই প্রতিষ্ঠানে চালু বেআইনী কাজকর্মের অফিসার চক্র সরব কাদের মদতে?—গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহযোগে তদন্ত রিপোর্ট।
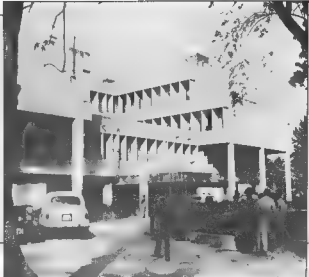
ব্যুরো অফ্ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের সিলেকসন বোর্ডের মনোনয়ন যে কত দুর্নীতিপূর্ণ তার বলিষ্ঠ উদাহরণ টি·কে সিং। কোল ইন্ডিয়ার অধিন্যস্ত সংস্থাগুলির ডাইরেকটার (পার্সোনেল) পদের প্যানেল তৈরির জন্য যে ইন্টারভিউ হয় তাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন টি·কে সিং, সম্প্রতি যাঁকে সি বি আই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে আটক করেছেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, টি কে সিং-এর পক্ষে ইন্টারভিউ-এ প্রথম হওয়াটা কিন্তু খুব সহজে হয় নি। রাজনৈতিক দাদা আর টাকার জোর থাকলে যে সব কিছুই হয় সি বি আই এর বাজেয়াপ্ত তথ্য মোতাবেক তা প্রমাণ করেছেন শ্রী সিং।

টি কে সিংকে ইন্টারভিউ–এ ডাকা এবং মনোনয়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন কেন্দ্রিয় সরকারের তৎকালীন শক্তিমন্ত্রী বসন্ত সাঠে এবং তাঁর দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পি ডি পাঠক। চাপ এতই প্রবল ছিল সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগের আগে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশনের কোন ছাড়পত্র নেওয়া হয়নি। নিজে চরম দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দু-দুবার বরখাস্ত হওয়া বিতর্কিত টি কে সিং-এর পক্ষে আর ওই পদে আসীন হওয়া কোনমতেই সম্ভব হত না।

এদিকে টি কে সিংকে ই সি এলের ডাইরেকটার (পার্সোনেল) করে পাঠানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম পি নারায়ণন। কারণ তিনি শ্রী সিং-এর অতীতের

টি·কে·সিং

যাবতীয় দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন

ঠিক ছিল টি কে সিংকে প্রথমে ই সি এলের ডি (পি) করে পাঠানো হলেও পরে অন্যত্র বদলি করা হবে কারণ ওই সময় একমাত্র ই সি এলেই ডি (পি)-র পদ শূন্য ছিল। টি কে সিংও জানতেন যে তাঁকে অন্য কোথাও বদলি করা হবে কিন্তু সব কিছুর বাদ সাধলেন ই সি এলের সি এম ডি এস পি মাথুর স্বয়ং। ওই সময় তাঁরও আশঙ্কা হয়েছিল যে কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হয়তো তাকেও অন্যত্র বদলি করে দেবেন বলা বাহুল্য, এই ধারণাটি মাথুর সাহেবের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ওই টি কে সিংই। শ্রী সিং এস পি মাথুরকে আরও বুঝিয়েছিলেন যে, ই সি এলের প্রাক্তন সি এম ডি জে এন উপ্পলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের নেই তাছাড়া

শ্রী উৎপলই কোল ইন্ডিয়ার পরবর্তী চেয়ারম্যান হতে চলেছেন।

এই ধারণার বশবর্তী হয়েই এস পি মাথুর ই সি এলের ডাইরেকটার (টেকনিকাল) নির্মলেন্দু সরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লবি করার জন্য টি কে সিংকে সবুজ সংকেত দেন। কারণ এস পি মাথুরকে সরিয়ে দিলে নির্মলেন্দু সরই হতেন ই সি এলের পরবর্তী সি এম ডি। শ্রী সরকে রুখতেই মাথুর-সিং জুটি কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন এক্ষেত্রে মাথুরের প্রধান মন্ত্রণাদাতা হয়ে ওঠেন টি কে সিং। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এরপর থেকেই এস পি মাথুর কোল ইন্ডিয়ার সব আদেশকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করেন। টি কে সিং-এর পরামর্শে প্রাক্তন সি এম ডি উৎপলের 'ইয়েসম্যান'-দেরই নিজের ঘনিষ্ঠজনে পরিণত করেন। এস এম ভট্টাচার্য, সুধীর মুখার্জি এবং মিত্তালের মত বিতর্কিত ব্যক্তিদের টেকনিক্যাল সেক্রেটারি ও ভিজিলেন্স দপ্তরের দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান। উৎপলের বিরুদ্ধে যাবতীয় দুর্নীতির নথিপত্র উধাও করাতেই মিত্তালকে ভিজিলেন্স দপ্তরে পাঠানো হয়। অন্যদিকে টেকনিকাল সেক্রেটারি হিসাবে এস এস ভট্টাচার্য এর উপর দায়িত্ব বর্তায়—কয়লা—মন্ত্রক থেকে উৎপলের বিরুদ্ধে কোন তথ্য জানতে চাইলে তা যেন উৎপলের স্বার্থরক্ষা করেই পাঠানো হয়।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বপদে আসীন হয়েই টি কে সিং তার 'ইয়েসম্যান' অফিসারদের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান। ই সি এলে সবচেয়ে দুর্নীতির অভিযোগ যে দুটি দপ্তরের বিরুদ্ধে সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল বিভাগে কর্ণধার করে দেন তারই দুই বশংবদ অফিসার ডি কে সেনগুপ্ত এবং ডাক্তার পি কে রায়কে। সাঁকতোড়িয়া সদর হাসপাতাল এবং কাল্লা হাসপাতালকে নিয়ে ই সি এলের মেডিকেল বোর্ড পুনর্গঠিত করে কেন্দ্রীভূত করলেন, সি এম ও ডাক্তার পি কে রায় ও পার্সোনেল অফিসার ডি কে ভাদুড়িকে নিয়ে কাল্লা হাসপাতালের জন্য এবং সি এম ও ডাক্তার এ কে মুখার্জি ও পার্সোনেল ম্যানেজার অমিতাভ সিনহাকে নিয়ে সাঁকতোড়িয়া সদর হাসপাতালের জন্য দুটি পৃথক মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন। (অফিস অর্ডার নং ই সি এল এইচ কিউ ডি (পি) টি কে এস ০১৪ (এ) ১৬৮৭৩, তারিখ ৩১·৫·৯০।

টিকে সিং—এর যাবতীয় বেআইনি কাজ-কর্মকে সংস্থারই চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার কে সি নন্দকিওয়ার যাতে বাধা দিতে না পারেন তার জন্য তার বিরুদ্ধেও সি এম ডিকে দিয়ে কোল ইন্ডিয়াতে গোপন চিঠি পাঠান জনস্বার্থে গোপন চিঠির ফটোকপি পরের পাতায় প্রকাশ করা হল

সি এম ডি ওই গোপন নোটে লিখেছেন, 'কাজের সময় কে সি নন্দকিওয়ারকে তার দপ্তরে পাওয়া যায় না'। যদিও এর আগে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং অফিসার সি এম ডি'র কাছে ডি (পি)-র বিরুদ্ধে ওই একই অভিযোগ এনে বলেছিলেন যে, টি কে সিং তার বাড়িতে বসেই অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম করেন তাঁরই একান্ত কেরানি সরযূ প্রসাদকে নিয়ে। সি এম ডি এই অভিযোগকে কোন আমলই দেন নি। টি কে সিং-এর আমলে (জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত) মেডিকেল বোর্ড বসেছে কমপক্ষে এগারবার।

সূত্রগুলি হল : ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (সি) মেড ৯০ ১৪৮ তাং ২·৭ ৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (সি) মেড ৯০ ২৮৩ তাং ২৮·৮·৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (সি) মেড ৯০ ৩ তাং ৩১·৮·৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (সি) (আর) মেড ৯০ ২৮৫ তাং ৩১·৮·৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ (আর) মেড ৯০ ২৮৭ ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (আর) মেড ৮০ ১৫ তাং ২২ ৯ ৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (আর) মেড ডব্লু বি ই ৮ এ ৬০, তাং ১৩·৯·৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (আর)। ডব্লু বি ই ৮ এ ১৪ তাং ১১·৯·৯০, ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (আর)। ডব্লু বি ই ৮ এ ৭২ তাং ১৭·৯ ৯০ এবং ই সি এল সি এম ডি সি-৬ বি (আর) ডব্লু বি ই ৮ এ ১১ তাং ৭ ৯ ৯০। মাত্র ২·৫ দিন চাকরি আছে এমন কর্মীরও ভি আর মঞ্জুর করা হয়েছে স্রেফ টাকা খেয়ে এমন অভিযোগও উঠেছে টি কে সিং-এর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সি এম ডিকে জানালেও সি এম ডি কোন কর্ণপাত করেন নি।

ডি (পি) টি কে সিং যে কিভাবে ই সি এলের প্রশাসনে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য ই সি এলের চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার কে সি নন্দকিওলিয়র সি এম ডি একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দেন গত বছরের ২৫ আগস্ট।

"……One Sri Kallol Mukherjee, a local bigwig, came in close contact with D (P) and sought to disrespect me ow several occasions even in the Chamber of D (P). I simply kept off Sri Mukherjee but ultimately oneday Sri Mukherjee talked to me virtually abusing me and threatened as well, while Sri Prabuddha Laham MLA was standing there. I did protest instantly. The past one, however is that on 15th August, while a number of officials alongwith CMD and Directors, were having tea in the residence of Commandant, CISF, D (P) mentioned something about Coal Field Times and when advised by Sri T·K Deb to ignore the same, D (P) remarked as to why everybody rushed to the rescue of the Editor The matter came to an end with the intervention of the CMD……"

নির্মলেন্দু সর

টি কে সিং এর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ কয়লা শিল্প জাতীয়করণের সময় থেকে ১৬ জন কর্মী ই সি এল-এর কলকাতা অফিসে ডেলি রেট-এ কাজ করছেন এদের স্থায়ীকরণের প্রস্তাবের ফাইলটি টি কে সিং আটকে রেখেছেন। কেন? তা সহজেই অনুমেয়। বদলী সংক্রান্ত ব্যাপারেও টি কে সিং মাথা চালান বলে অভিযোগ। সম্প্রতি সিরসা এরিয়ার ১৭ জন কর্মীকে সাউথ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এ বদলী করার জন্য শক্তিমন্ত্রীর আদেশ নিয়ে ই সি এলকে নির্দেশ দেয় কোল ইণ্ডিয়া

চেয়ারম্যান এম পি নারায়ণন

কোলইণ্ডিয়ায় অদল-বদলের নেপথ্যে

কেন্দ্রের ক্ষমতায় চন্দ্রশেখর সরকার এসেই বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও উপরতলার আমলাদের ব্যাপক রদবদল করার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ নজর দিলেন কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সহযোগী সংস্থাগুলির ওপর নয়া মন্ত্রীসভায় শক্তিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েই কল্যাণ সিং কালভি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন কোল-ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ঢিলে ঢালা উৎপাদন, বিশৃঙ্খল প্রশাসন, ব্যাপক দুর্নীতি দেখে (যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত বিগত সংখ্যাগুলিতে আলোড়ন তোলা অন্তর্তদন্ত রিপোর্ট ছেপেছিল) এই ক্ষোভের কথা জানাতে গত ১৭ ডিসেম্বর '৯০ স্বয়ং শক্তিমন্ত্রী নয়া দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন কোলইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম পি নারায়ণ এবং ই সি এলের বর্তমান সি এম ডি (অ্যাকটিং) ও ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) নির্মলেন্দু সরকে। সেই বৈঠকে শক্তিমন্ত্রী শ্রী কালভি ঠিক করেন আগামী তিন মাসের মধ্যে ই সি এলের হাল ফেরানোর লক্ষ্যে নির্মলেন্দু সরকে ডাইরেকটর ইনচার্জ ও অ্যাকটিং সি এম ডি-র দায়িত্ব অর্পণ করতে চান। সেই মত ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে কোল ইণ্ডিয়াতে ব্যাপক রদবদলের কাজে নেমে পড়েন শ্রী কালভি।

তারপর কেন্দ্রিয় শক্তিমন্ত্রী কল্যাণ সিং কালভি-র অনুমোদনক্রমে ই সি এল-এর সি এম ডি, এস পি মাথুরকে করা হল কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 'অফিসার-অন-স্পেশাল ডিউটি'। আর ই সি এল-এর ডাইরেকটর ইনচার্জ ও অ্যাক্টিং সি এম ডি-র দায়িত্ব পেলেন নির্মলেন্দু সর। একই সঙ্গে আর বি মাথুর এলেন ভারত কোকিং কোল লিমিটেড-এর ডাইরেক্টর ইনচার্জ ও অ্যাক্টিং সি এম ডি-র পদে।

সেন্ট্রাল মাইন প্ল্যানিং অ্যাণ্ড ডিজাইন ইন্সটিটিউট-এর ডাইরেকটর ইনচার্জ ও অ্যাক্টিং সি এম ডি-র দায়িত্ব পেলেন আর এন মিত্র। আর কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) হলেন এস পি ভাটা অন্যদিকে ই সি এলের চীফ জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোন্যাল) করে পাঠানো হল এ নটরাজন-কে। এই পদে আগে ছিলেন টি কে সিং যিনি দুর্নীতির দায়ে সি বি আই-র হাতে ধরা পড়েন। পরে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সেই স্টে-অর্ডার পরে আদালতে খারিজ হয়ে যায়। তাঁকে এখন অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। রাজধানীর ওয়াকিবহাল মহলের খবর, এই টি কে সিং-এর বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত শুরু করলে তা ধামা চাপা দেওয়ার লক্ষ্যে সি এম ডি এস পি মাথুর সি বি আই-র সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করছিলেন না। এমন কি কাগজপত্রেও ঠিকঠাক ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। যার জন্য এস পি মাথুরকে সরে যেতে হল। স্বয়ং শক্তিমন্ত্রীও এস পি মাথুরের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ ই সি এলের নয়া সি এম ডি নির্মলেন্দু সরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়েই তিনি সরে গেছেন এর পেছনে যে কলকাঠি নেড়ে ছিলেন আগের ডাইরেকটর (পার্সোন্যাল) টি কে সিং এমন অভিযোগ খনি অঞ্চলের অনেক অফিসারের। বস্তুতঃ মিঃ সিং এস পি মাথুরের খুবই ঘনিষ্ঠ তাই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে টি কে সিং-এর পরামর্শ অনুযায়ী ছুটির দরখাস্ত করেন। পরে অবশ্য কয়লা মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব এস ব্যানার্জি এক জরুরি বার্তায় এস পি মাথুরকে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তিনি শীঘ্রই নির্মলেন্দু সরকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন।

কলকাতা ব্যুরো।

টি কে সিং-এর জন্য ই সি এলের কাজের পরিবেশটাই বদলে গেছে। সংস্থার শতকরা নব্বই শতাংশ কর্মীই আজ টি কে সিং-এর উপর বীতশ্রদ্ধ। তিনি তাঁর 'ইয়েসম্যান' দের দিয়েই অফিস চালাচ্ছেন বলে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কর্তৃপক্ষ এখানে উক্ত ১৭ জন কর্মী টি কে সিংকে 'ঘুষ' দিতে অস্বীকার করায় তাদের রাজমহলে বদলী করে দেওয়া হয়েছে

অন্যদিকে টি কে সিং-এর জন্য ই সি এলের কাজের পরিবেশটাই বদলে গেছে। সংস্থার শতকরা নব্বই শতাংশ কর্মীই আজ টি কে সিং-এর উপর বীতশ্রদ্ধ তিনি তাঁর 'ইয়েসম্যান' দের দিয়েই অফিস চালাচ্ছেন বলে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

গত ১৮ অক্টোবর '৯০ তারিখে টি কে সিং তাঁর নাগপুরের বাড়ি যাবার পথে নগদ টাকা এবং গহনা সহ কয়েক লক্ষাধিক টাকা সমেত সি বি আই-এর হাতে গ্রেপ্তার হন। জামিনে মুক্তি পাবার পর তিনি শারীরিক অসুস্থতার অছিলায় ছুটি নিয়ে রাজনৈতিক লবি করার জন্য আত্মগোপন করেন। সেই সময় সি এম ডি পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেন ডাইরেকটর ইনচার্জ, ডিভিশন, টি কে দেব-কে। শ্রী দেব প্রথমেই টি কে সিং-এর গঠন করা মেডিকেল বোর্ড বাতিল করে নতুন বোর্ড গঠন করার নির্দেশ দেন (অর্ডার নং—ই সি এল এইচ কিউ/ টি (পি)/ ৪৭/৭১৬৭ তাং ২২ ১১ ৯০)।

এদিকে টি কে সিং ৭ নভেম্বর কলকাতা

হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে অগ্রিম জামিনের আবেদন করলে তা না-মঞ্জুর হয় এরপর ২১ নভেম্বর পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকার পর পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এস কে রাজখোয়ার আদালতে আবেদন করে সি বি আই তদন্ত পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখার স্থগিতাদেশ পান এই আদেশ নিয়ে ২৬ নভেম্বর ই সি এল-এ কাজে যোগ দিয়ে সি এম ডি এস পি মাথুর-এর আশীর্বাদ নিয়ে আবার বেআইনি

সি এম ডি এস-পি মাথুর

এস-সি- মাথুরের গোপন চিঠি

কে সি নন্দ কিওলিয়র-এর রিপোর্টের কিছু বিশেষ অংশ
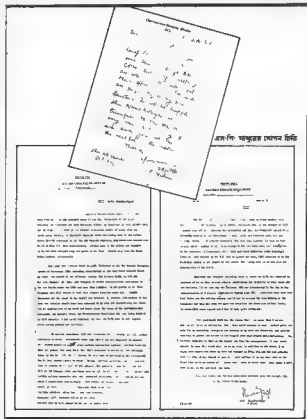
গত ৩০ নভেম্বর ই সি এলের চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার কে সি নন্দকিওলিয়রকে এমনই এক হুমকি দেওয়া হয়। শ্রী নন্দকিওলিয়র স্থানীয় থানায় এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে তার অনুলিপি কোল ইন্ডিয়া এবং সি বি আই কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছেন।

কার্যকলাপ করে চলেছেন। যেসব অফিসার তার বেআইনি কার্যকলাপকে সমর্থন করছেন না তিনি তাদের বদলী করে দেবার হুমকি দিচ্ছেন আর যে সব অফিসার সি বি আইকে সহযোগিতা করেছেন তাদের মাফিয়া দিয়ে খুন করানোর হুমকিও দিচ্ছেন বলে অভিযোগ গত ৩০ নভেম্বর ই সি এলের চীফ পার্সোনেল ম্যানেজার কে সি নন্দ-কিওলিয়রকে এমনই এক হুমকি দেওয়া হয়। শ্রী নন্দকিওলিয়র স্থানীয় থানায় এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে তার অনুলিপি কোল ইন্ডিয়া এবং সি বি আই কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছেন

টি কে সিং কাজে যোগ দিয়ে অফিসারদের এমন ভাবে দেখাতে শুরু করেছেন যে, মন্ত্রী-আমলা সি বি আই সবাইকে তিনি ম্যানেজ করে এসেছেন। এখন কেউই তাঁর টিকিটি পর্যন্ত ছুঁতে পারবেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রীও তাঁর পকেটে।

সম্প্রতি কেন্দ্রে মন্ত্রীসভায় রদবদল হয়ে গেল নতুন শক্তি মন্ত্রী হয়েছেন কল্যাণ সিং কালভি। টি কে সিং-এর যাবতীয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কে শ্রী কালভি এবং প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বেশ কয়েকজন সাংসদ।

প্রবীরকুমার সরকার।

সামনে মাঠ, ওপাশে নদী, নদীর ধার ঘেঁষে মেঠো পথ আর সারি সারি গাছ। নদী যেখানে পূব দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে মস্ত পিপুল গাছের নিচে নরম ঘাসে ঢাকা একটুকরো জমিতে ফুটে আছে ঘাস ফুল আহ্, কি চমৎকার, বাবার হাত ধরে অবাক চোখ মেলে দেখে ছোট্ট মেয়েটি নীল আর সাদায় মেশানো এই একরত্তি ফুলে যেন সারা বিশ্বের সৌন্দর্য প্রকৃতি যেন ঢেলে দিয়েছে তার রূপ সবুজ ঘাসের মাঝে, ছোট্ট ফুলটি দেখে মনের কোথায় এক শিহরণ জেগেছিল মেয়েটির। পুলক লেগেছিল তার সবাঙ্গে, তবে কি তখনই জন্ম নিয়েছিল চেতনা? সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পবোধের পরবর্তিকালে যা তাকে টেনে এনেছে এক বিশাল জগতে, সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি হয়ে উঠেছে আজকের ফুলের জগতের একচ্ছত্র অধিকারিণী উমা বসু

শুধু ফুল নয়, বিশ্বের যে কোন সৌন্দর্যই উমাদেবীর চোখকে টানে মনকে নাড়া দেয়। যা কিছু সুন্দর তাকেই তিনি ধরে রাখতে চান তাঁর কাজে, তাঁর সৃষ্টিতে। তাই তাঁর সাজানো ফুলের স্তবকে বুনো ফুল থেকে শুরু করে ক্রিসেনথিমাম ডালিয়া সবার স্থান উমাদেবী বলেন, 'আসলে দেখবার চোখটি থাকা চাই। তাহলে এক একটি ছোটখাট জিনিসের ভিতর কি অসীম সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা অনুভব করা যায় আর এই দেখবার চোখ তৈরি হয় ছেলেবেলা থেকেই যেমন আমাকে দেখতে শিখিয়েছিলেন আমার বাবা।'

পূববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার ছোট্ট একটি গ্রামে উমাদেবীর পৈতৃক বাড়ি। মা ছিলেন কলকাতার মেয়ে। তাই কলকাতায় আসা যাওয়া ছিল অহরহ 'পরে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাবা বাড়ি কিনলেন আমাদের পড়াশোনা করাবার জন্য।' পড়াশোনা শুরু হল কিন্তু নিয়ম করে বছরে দু'বার দেশের বাড়িতে যেতেন ওঁরা 'বাবা আমার হাত ধরে কখনও নদীর ধার দিয়ে কখনও গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন কত সব বিচিত্র ফুলের রঙ চেনাতেন, পাতার নাম বলতেন, বলতেন এই গাছ। কত তুচ্ছ জিনিসকে কত ভালবেসে দেখতে শিখেছিলাম সেদিন আর সেই পুঁজিকেই সম্বল করে দীর্ঘ পথের অনেকটাই পেরিয়ে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি।'

উমাদেবীর কাজে আছে নিজস্বতা। তাঁর সাজানো প্রতিটি ফুলের স্তবকে ফুটে ওঠে সেই অন্তঃরীণ নিজস্বতা যা একজন স্রষ্টার মূলধন শিল্পের যেমন কোন নির্দিষ্ট আকার নেই তেমনি শিল্পীরও নেই কোন নির্দিষ্ট পথ মন যা চায় যেভাবে চায় সেইভাবে ভাবটি ফুটিয়ে তোলাতেই শিল্পীর সার্থকতা এভাবেই প্রাণ পায় শিল্পীর সৃষ্টি তাই তাঁর সাজানো ফুলের জগতে শুধু ফুল নয় সেইসঙ্গে পাতা ঘাস গাছের ডাল সব কিছুরই সমান ব্যবহার, আর তাই তিনি প্রচলিত পথ থেকে সরে এসে বেছে নিয়েছেন এই একান্ত আপন ধারাটিকে।

'প্রথমে অবশ্য গিয়েছিলাম ইকেবানা শিখতে সেটা ১৯৬০ সাল। সবে আমার বিয়ে হয়েছে স্বামীর চাকরির সুবাদে থাকতাম দিল্লিতে সেখানেই প্রথম শুরু করলাম সাজানো।' কিন্তু এরকম বাঁধাধরা নিয়ম ভাল লাগল না উমাদেবীর। এখানে শিল্পীর স্বাধীনতা কোথায়? না, এ পথ ওঁর পথ নয় এরপর স্বামী ট্রান্সফার হলেন মাদ্রাজ, উমাদেবীও এলেন সঙ্গে মনে হল কিছু একটা করতেই হবে মনের ভিতর যে শিল্পবোধ শিল্প চেতনা আছে তাকে মূর্ত করে তুলতে বদ্ধ পরিকর হলেন তিনি

'এ সময়ে বই পড়তে শুরু করলাম ভারতীয় ইতিহাস শিল্পকলা সব বিষয়েই পড়লাম দেখলাম আমাদের দেশে ফুল সাজানোর ব্যাপারটা তো নতুন নয় সেই কত শত যুগ আগে থেকে চলে আসছে ঘটের ওপর ফুল পাতা সাজানো তো গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে বহুযুগ থেকেই প্রচলিত।'

এইসব পুরানো এবং নতুন সংস্কৃতির ভিতর আপন ভাবধারাটির সমন্বয় ঘটিয়ে উমা বসু রচনা করলেন তাঁর নিজস্ব পৃথিবী। প্রথমে দিল্লিতে তারপর মাদ্রাজে ও পরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল তাঁর একজিবিশন, ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে পুরুলিয়ার খরা অঞ্চল নিয়ে এক প্রদর্শনী করলেন তিনি 'ড্রাউট' এক অভিনব পন্থায় ব্যক্ত করলেন এই প্রদর্শনীর মূল কথাটি দুর্ভিক্ষের প্রতীক স্বরূপ ভাঙা মাটির হাঁড়িতে একটি ক্যাকটাস লাগিয়ে দিলেন, ফেটে যাওয়া মাটিতে লাগালেন কয়েকটি ধানের শিষ এভাবেই '৬৮ সালে ভারতের চারটি ঐতিহ্যমণ্ডিত নগরীকে রূপ দিলেন তাঁর পুষ্পসজ্জায় ফুল লতা পাতা ছাড়াও নিজের আঁকা ছবি কাঠ ও পাথরের জিনিসপত্রও ব্যবহার করেছিলেন তিনি শুধু ভারতেই নয় জাপান এবং সুদূর ইংল্যান্ডেও তাঁর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কবিসাহিত্যিক যেমন তাঁর মনের ভাবটিকে প্রকাশ করে ভাষায় চিত্রকর

যেমন ফুটিয়ে তোলে তাঁর চিত্রে তেমনি পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে উমাদেবী ব্যক্ত করেন তাঁর নিজস্ব চিন্তা ধারাটি তাই তিনি তাঁর ছাত্র ছাত্রীদের নির্দিষ্ট কোন ছকের মাধ্যমে কোন কিছু শেখান না। শুধু মনের ভাবটিকে ফুল সাজানোর মাধ্যমে প্রকাশ করতে সাহায্য করেন একই সঙ্গে দেখতে শেখান এবং ভাবতে শেখান ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী খাঁটি ভারতীয় পুষ্পসজ্জার এক স্বতন্ত্র রূপ দিতে সচেষ্ট উমাদেবী তাই পুষ্পবিন্যাস শিক্ষা কেন্দ্র 'কুসুমিকা' সংস্থাটি তৈরি করেছেন কিন্তু শুধু এতেই তাঁর মন ভরে না। -'আরও কিছু করতে চাই, আরও অনেক কিছু, ভারতীয় পুষ্পবিন্যাসের এই ঐতিহ্যকে পৌঁছে দিতে চাই সর্বভারতীয় স্তরে এমন কি বিশ্বের দরজায়।' এক সময় এই ভারত থেকেই পুষ্পবিন্যাসের মূল রীতিটি ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য প্রাচ্য দেশগুলিতে ইকেবানার জন্মও এই ভারতবর্ষে তাই ভারতবাসী হয়ে অন্যের দারস্থ হতে হবে কেন? অথচ আমাদের দেশে এই দেশীয় পুষ্পবিন্যাসের চর্চাই নেই, কেউ সেভাবে ভাবেনই না সরকারও সেভাবে সাহায্যের হাত বাড়ায় না ' জীবনের অনেকগুলো বছর উমা বসু পেরিয়ে এসেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি এখনও ক্লান্ত নন, একটুখানি সমর্থন, মানুষের একটুখানি আগ্রহে এখনও তিনি পাড়ি দিতে পারেন অনেক পথ। সার্থক করে তুলতে পারেন তাঁর স্বপ্ন

-আলপনা ঘোষ

রঙ আর তুলি দিয়ে নয়, সূঁচের ফোঁড়ে ফোঁড়ে কি অসাধারণ কাজ করে চলেছেন। এবং অবাক হই তখন যখন দেখি বয়স যতই বাড়ছে ততই সূচিশিল্পের শিল্পকর্মে নতুন মাত্রাও সংযোজিত হচ্ছে, ফোঁড়ের বাহার বাড়ছে।

শিল্পী রেখা চক্রবর্তী, কারুশিল্পকে শিল্প মাধ্যম করে প্রতিভা ও শিল্প চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন আজ থেকে দশ বছর আগে ১৯৮০ সালে ১৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থী শিল্পী নিয়ে একটি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র 'রেখাচিত্রম' এর সূচনা। দশ বছরের ব্যবধানে সেদিনের শিশু আজ পরিপূর্ণ কিশোরী।

বর্তমানে রেখাচিত্রমে ৭৫০ জন ছাত্র ছাত্রীকে কারু শিল্পে তালিম দেওয়া হয় সংখ্যায় নয়, সমৃদ্ধিতে এই প্রতিষ্ঠান আজ নবশহুরবাসীর কাছে যথেষ্ট সমাদৃত সি এ মার্কেট, বিধাননগর, কলকাতা-৬৪-তে অবস্থিত 'রেখাচিত্রম' এর কর্ণধার শিল্পী রেখাদেবী আজ ভারত তথা কলকাতার শিল্প, সাহিত্য ও গুণীজন মহলে এক বিশেষ পরিচিতি নাম

শিল্পী যখন চোদ্দ পনের বছরের কিশোরী, তখন থেকেই এই শিল্পের প্রতি এক বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয় শৈশবে মা'র কাছেই সিঁচের শিক্ষাগ্রহণ। পরে অর্থাৎ বয়স যখন ১৮-১৯ সেই সময় উষা কোম্পানি থেকে সেলাই-এ এক বছরের ডিপ্লোমা ও ২৭-২৮ বছর বয়সে লেডি ব্রাবোন থেকেও কারুশিল্পে ডিপ্লোমা নেন শিল্পী। এরই ফাঁকে কলা বিভাগে স্নাতক হন। এরপর থেকে শিল্পীকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। শুধুই কেবল এগিয়ে চলা অবিশ্রান্ত এই শিল্পী আজ পরিপূর্ণতায় মুগ্ধ। চোখে মুখে হাসি।

বয়স ৫৮ হলেও তাঁর প্রতিটি শিল্প কর্মের মধ্যে তারুণ্যের ছাপ। অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে সুযোগ্য পুত্র অরুণ চক্রবর্তীকে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে তৈরি করে চলেছেন নম্র, শান্ত অথচ বিনয়ী এই শিল্পীর মধ্যে এখনও যে অতৃপ্তি লুকিয়ে আছে তা তাঁর কথাবার্তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না

গত কয়েক বছরে সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের যত নক্ষত্র সমাবেশ ঘটেছে রেখাচিত্রমে, তা এককথায় অভূতপূর্ব সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, চিন্তামণি কর, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদা শংকর রায়, সুচিত্রা মিত্র, রাম বসু, ইন্দ্র দুগার থেকে জ্যোতি বসু পর্যন্ত সমসাময়িক এমন খ্যাতিমান নেই যিনি রেখা চক্রবর্তীর শিল্প প্রতিভা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন নি। বিভিন্ন সময়ে এঁদেরই প্রতিকৃতি সূঁচের ফোঁড়ে তৈরি করে উপহার তুলে দিয়েছেন শিল্পী খ্যাতিকুশী এই শিল্পী সম্পর্কে লেনিন কেন্দ্রিয় সংগ্রহশালায় শ্রীযুক্ত এ ম্যাকসিমভ মস্কো থেকে প্রকাশিত সোভিয়েত পত্রিকা প্রাভদায় বলেন, 'লেনিনের যে প্রতিকৃতি রঙীন সুতোয় এঁকেছেন শ্রীমতী আর চক্রবর্তী তা এক কথায় অনবদ্য ' অন্যদিকে রেখাচিত্রমের গ্যালারিতে ঢুকলে বোঝা যায় তাঁর শিল্প মাধ্যমে জনজীবনের কি গভীরে প্রবিষ্ট। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টির দুর্লভ দৃষ্টান্ত রেখেছেন নজরুল ইসলাম, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, সঞ্জীব রেড্ডি, সুনীল গাভাসকর, রাজীব গান্ধী প্রমুখের নিখুঁত প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাকে নজরুলের প্রতিকৃতি উপহার দেন এবং ওই বছরই শিল্পীকে নেহরু অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয় ওই '৭৮ সালে স্বামীকে হারিয়ে দাদা জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী ও বৌদি মিনতী চক্রবর্তীর সংসারে একমাত্র সন্তান অরুণকে নিয়ে মিলে মিশে আছেন খুবই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দাদা-বৌদির আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কথা স্মরণ করলেন

আজকে রেখাচিত্রম-এর এই খ্যাতি অর্জনের পেছনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার মনসুর হবিবুল্লার কথা অকপটে স্বীকার করলেন রেখাদেবী।

জীবনে সব থেকে যে ঘটনাটি দাগ কেটেছে সেটি হল পি-এল-ও প্রধান ইয়াসার আরাফৎ এর সান্নিধ্যে যাওয়া। -'ভারত সফরকালে কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে দেখা করতে গেছিলাম তাঁরই প্রতিকৃতি তৈরি করে উপহার দিতে। উনি ছবিটি দেখে আনন্দে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন আমিও তাঁর শিশুসুলভ আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।' আজ শুধুই কাজ আর কাজ এই বয়সে পৌঁছে অবসর নেওয়ার কথা ভাবেন না তিনি। মৃণাল সেনের ভাষায় 'দেখি আর ভাবি, অনেক দিন পরে, আরো অনেক দিন পেরিয়ে গেলে শিল্পী যখন এক সময় বুড়ো হয়ে যাবেন, তখন কাপড়ে ফোঁড় তুলতে হাত একটু আধটু কাঁপবে একটা বয়সে যা সাধারণত ঘটে থাকে। তখনও কি এই কাঁপুনির মধ্যেই আরও এক নতুন মাত্রা ফুটে উঠবে? হয়তো উঠবে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।' আমরাও সবাই চেয়ে থাকব সেই নতুন মাত্রার দিনগুলির দিকে।

-আবদুল কাইউম।

কাগজের কাজ: কুমকুম নন্দীর অরিগ্যামি

কাগজের এক একটি ভাঁজ যে প্রকৃত বস্তুটির চেয়ে কত নিখুঁত হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল, শিষ্য পরিবৃত বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তির প্রতিরূপ কিংবা ৩০০ বছর আগেকার কলকাতায় ঘোড়ায়টানা ট্রাম আর গ্যাসের বাতি। দূর থেকে দেখলে কি মনে হবে যে একটি মাত্র কাগজ দিয়েই ওগুলি তৈরি হয়েছে? তাও আবার কাঁচি, ব্লেড কিংবা আঠার সাহায্য ছাড়া? এখানে অরিগ্যামির বিশেষত্ব। উদ্যোক্তা-শিল্পী কুমকুম নন্দীর নিরলস প্রচেষ্টায় কাগজের এক একটি ভাঁজ যে কতটা বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন কলকাতাবাসী আরও একবার প্রত্যক্ষ করলেন তাঁরই শিল্পকর্ম ক্রিশমাস ট্রি ও অ্যাকটিভিটিজের শাখা-প্রশাখায়। হ্যাঁ, বছরটাই যে কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তির উদ্‌যাপনের আর তাই কলকাতার চারিপাশে উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মেলা। অরিগ্যামির এরকমই একটি প্রদর্শনী হল কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে এই উৎসবেরই অঙ্গ হিসেবে। বলাবাহুল্য, এই প্রথম অরিগ্যামির আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হল কলকাতায়।

সামাজিক অর্থনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেমন বদলে গেছে বাঙালির আচার-আচরণ, ঠিক তেমনি শিল্প ও সাংস্কৃতিক চেতনাতেও এই পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। তাই আজ ট্রাডিশনাল শিল্পের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক বিদেশী শিল্পকর্ম। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে'র মতই নানাদেশের হস্তশিল্প আজ বাঙালির ড্রইংরুমেরই শুধু শোভা বাড়ায় না, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও রীতিমত জায়গা করে নিয়েছে। এমনই একটি শিল্প অরিগামি। কবে কিভাবে যে এর উৎপত্তি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে জাপানী মেয়েদের অবসর যাপনের একটি অন্যতম উপায় এই অরিগ্যামি, যা আজ শহর কলকাতার কেতাদুরস্ত শৌখিন বাঙালির কাছে রীতিমত চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ের ঘরকুনো বাঙালি মা-ঠাকুমারা যেমন মধ্যাহ্নের অলস আসরে সামান্য সূঁচ আর সুতোর কারিকুরিতে সূচীশিল্পের জগতে অবাক বিস্ময় সৃষ্টি করতেন ঠিক সেরকমই অলস অবসরে এক টুকরো কাগজকে ভাঁজের মধ্যে দিয়ে জাপানী মেয়েরা তৈরি করেন অপূর্ব সৌন্দর্যময় নানারকম শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প হিসেবে ঘর সাজানোয় যার জুড়ি মেলা ভার। এই ঘরোয়া শিল্প আজ মেট্রো শহরগুলিতেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কল্লোলিনী কলকাতাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। জাপানী শিল্প 'অরিগামি' কথাটিও জাপানী শব্দ। 'অরি' অর্থাৎ ভাঁজ করা আর 'গামি' মানে কাগজ। সুতরাং শব্দের মধ্যেই শিল্পটির পদ্ধতিগত অর্থ নিহিত আছে। এ শিল্পের সৃষ্টিকর্তা আকিয়াইউসিয়াওরা। এই শিল্পের প্রসারে তোশিয়ে তাকাহামার মত জাপানীদের অবদান কিছু কম নয়। অরিগামির জন্য জাপানে হলেও এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়াসিম পেপার পাওয়া যায় চীনে। আমাদের দেশে এই শিল্পের ক্ষেত্রে হ্যাণ্ড মেড ও মার্বেল পেপার ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। যেহেতু অরিগ্যামি শিল্পটি সম্পূর্ণভাবে কাগজের ওপর নির্ভরশীল কাজেই এর সংরক্ষণের দিকটি বিশেষভাবে ভাবতে হবে। কেননা একটি কাগজের স্থায়িত্ব আর কতদিন? তাই আজকাল কাগজের পরিবর্ত হিসেবে প্লাস্টিক সিট ও মেটাল সিট ব্যবহারের কথা ভাবা হচ্ছে। শিল্পটিকে ব্যাপক রূপ দেবার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কাঁচি, পিরিষের আঠার মত ছোটখাট দ্রব্য।

বালিগঞ্জের ইন্দো-জাপান-ওয়েল ফেয়ার কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনে এই বিষয়টি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন কুমকুম নন্দী। এক সময় শিক্ষয়িত্রীও তিনি ছিলেন। কুমকুম নন্দী কিন্তু কারুর কাছে শেখেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টা আর আগ্রহই তাঁকে এই শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে তোলে। তাঁর নিজের ভাষায়-'আসলে আমার স্বামীর জন্য বর্মায়। বিয়ের পর হঠাৎ একদিন এক টুকরো কাগজ ভাঁজ করে দারুণ সুন্দর একটি পাখি তৈরি করে উনি আমাকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিলেন এবং আমাকে আশ্চর্য দেখে বললেন এগুলি তাঁর জাপানী বন্ধুদের কাছে শেখা। ভারি অদ্ভুত লেগেছিল সেদিন। সম্ভব-অসম্ভবের টানাপোড়েনে মনে হয়েছিল উনি পারেন আর আমি পারব না? সেদিন থেকে ওঁর জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে আরও বেশি মিশতে লাগলাম। শুরু করলাম জাপানী ভাষা শেখা। সঙ্গে সঙ্গে অরিগ্যামির বিভিন্ন বই কিনে নিজে নিজেই অভ্যাস করতে লাগলাম। তাছাড়া স্বামী তো আছেনই।' —এভাবেই শিখতে শিখতে একদিন শিক্ষয়িত্রী হয়ে গেলেন মিসেস নন্দী। ১৯৮৭ সালে যোগ দিলেন ইন্দো জাপান ওয়েলফেয়ার কালচারাল অ্যাসো- সিয়েশনে অরিগ্যামির শিক্ষয়িত্রী হিসেবে। কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় সল্টলেকে গড়ে তুললেন অরিগ্যামি অ্যাকাডেমি অব ইণ্ডিয়া। সেই শুরু, আর ফিরে তাকান নি। প্রশিক্ষণ দানের সঙ্গে সঙ্গে অরিগ্যামির ওপর একটি ছোট্ট লাইব্রেরিও করেছেন। জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল-এর অরিও-ত্রিস্যাঙ্ক কাপের অরিগ্যামি সংক্রান্ত প্রথম পুরস্কারটি গেছে তাঁর ঝুলিতে। শুধু তিনিই নন, এখন তাঁর হাতে তৈরি অনেক ছাত্র ছাত্রীই অরিগ্যামির কলাকৌশলে সবাইকে মুগ্ধ করে জয় করে নিচ্ছেন মানুষের নান্দনিক মন এবং বহু পুরস্কার।

এক টুকরো হালকা কাগজে শুধু ভাঁজে ভাঁজে তৈরি হয়ে ওঠে যে শিল্প, তার মাধুর্যে আমরা অভিভূত হই। সামান্য আঙুলের স্পর্শে দু-একটি ভাঁজের মধ্যে দিয়ে তা কখনও হয়ে ওঠে পাখি, গাছ, ভয়ঙ্কর দানব কিংবা মনোহরণকারী ফুল।

আলো চৌধুরী

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যালয়

সেমসাইড

রাজনৈতিক দলাদলি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হয়ে গত তিন বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি লিট, ডি এস সি ডিগ্রির জন্য থিসিস জমা দেবার অনুমতি কেউ পাচ্ছেন না। সম্প্রতি ২৫ জন পোস্ট ডক্টরাল থিসিস জমা দিতে পারলেও পি এইচ ডি বিভাগে অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্তের প্রিয় ছাত্র স্বপন চক্রবর্তীর থিসিস সি পি এম-এর ক্রীড়াপ্রিয় নেতার নির্দেশে আটকে রাখা হয়েছে, সব কিছু জেনেও কি অর্থমন্ত্রীর কিছু করার নেই?

নৃত্য একাডেমি

সুধা সংবাদ

কলকাতার নাচমহলে সুধা বর্ষী সংবাদ হচ্ছে নৃত্য পটীয়সী সুধাচন্দ্রন টালিগঞ্জ স্টুডিও-এ পা দেবার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতায় তিনি নৃত্য একাডেমি গড়ে নতুনদের মাঝে মধ্যে তালিম দেবেন। তিনশ বছরের কলকাতার ভাগ্য ভাল তবে!

খাদ্য দপ্তর

চাল বেচাল

রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী নাকি খবরের কাগজের শিরোনাম হবার সুযোগ নিতে জনতা (দ) সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথমদিন থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছেন—এই সরকার কংগ্রেসের চেয়ে ভয়ংকর কারণ এরা এসেই পশ্চিমবঙ্গের চালের কোটা কমিয়ে দিয়েছে —কিন্তু রাজ্য সরকারি তথ্য বলছে ভি পি সিং এর বন্ধু সরকারই পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য তিনটি কংগ্রেস (ই) শাসিত রাজ্য ও রাজ্যের চালের কোটা কমিয়েছে।

স্টুডিও

পাত্র চাই

ক্রিকেটার সন্দীপ পাটিল, চিত্রতারকা প্রসেনজিৎ, টি ভি তারকা অর্জুনকে নিয়ে টলিউডের স্বপ্নকন্যা দেবশ্রী রায়কে প্রেম করার বদনাম সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু এতদিনেও কেউ পাণিপ্রার্থী না হওয়ায় লেকপ্রিয় পার্কের রায় পরিবার খানিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেবশ্রীর মা তাই রায় পরিবারের এই আইবুড়ো কন্যেটির জন্য পাত্র খুঁজছেন —উৎসাহী পাঠকরা যোগাযোগ করতে পারেন

মহাকরণ

হিসাবে দ্বিধা

বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তাঁর বাইপাস সার্জারির জন্য বাম সরকারের তরফ থেকে ৭ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। বিধি অনুযায়ী রাজ্য সরকার এখনও ওই টাকা খরচের হিসাব পান নি কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের কাছে হিসাব চেয়ে যোগাযোগ করার সাহসও সরকারের হচ্ছে না

ক্রিকেট ক্লাব

মাঠে মাধুরী মধু

রোটারি ক্লাব অব ক্যালকাটা'র উদ্যোগে ব্যাটবল হাতে পাড়াসকারের সঙ্গে ইডেনে ক্রিকেট খেলতে নেমেছেন বম্বে সিনেমার হট লেডি মাধুরী দীক্ষিত ক্লাবের ফান্ড রাইজিং স্কীমটিকে সফলপোক্ত করতে কলকাতার অভিজাতবাহিনী নেমে পড়েছেন সবরকমের প্রস্তাব নিয়ে ফিল্মী ক্যারিসমা আর ক্রিকেটীয় পৌরুষ, জমবে দারুণ

লালবাজার

আলিমুদ্দিনী দাওয়াই

আলিমুদ্দিনের কর্তারা এবার প্রশাসনকে কবজা করার জন্য পুলিশের ওপর মহলে হাত দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আলিমুদ্দিনে একটি ব্লু-প্রিন্ট রচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ব্লু–প্রিন্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে সব আই পি এস অফিসারদের কাজে লাগানো যাচ্ছে না বা যাদের জন্যে বামফ্রন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তাঁদের কার্যত অকেজো করে রাখা হবে। আলিমুদ্দিনের ক'জন নেতা মনে করছেন ডি সি (সাউথ) সর্বেশচন্দ্র এর অপদার্থতার জন্যে শাজু আলমের মত তাঁদের এক প্রথম সারির ক্যাডারকে জেল খাটতে হচ্ছে তাই তাঁর বদলী পাকা হয়ে গিয়েছে। অকেজো করে রাখা হয়েছে নজরুল ইসলাম, তুষার তালুকদারকে। রচপাল সিং (প্রাক্তন ডি সি সেন্ট্রাল)–এর কাজকর্ম অপছন্দ হওয়ায় তিনিও কোণঠাসা আই পি এস–দের দাওয়াই এর লিস্ট পাকা

কর্পোরেশন

মমতাময়ীর শিক্ষা

যুব মহাপ্রকোপে নির্বিকার কলকাতা কর্পোরেশনকে শিক্ষা দিতে যুব কংগ্রেসী বাহিনীকে নিয়ে মশা মারতে এবং জমা জল সরাতে কোমরে কাপড় বেঁধে নেমে পড়েছেন জঙ্গীনেত্রী মমতা ব্যানার্জি অথচ মশক নিবারণ অভিযানে নামার কথা কলকাতা কর্পোরেশনের। কিন্তু ডেঙ্গুতে ৩৪ জন শিশুর মৃত্যুর পরেও ঘুম ভাঙেনি পুরসভার কলকাতার মায়েদের জন্য প্রাণ কেঁদেছে একমাত্র মমতারাই

ত্রিপুরা ভবন

গ্যাস বার্তা

যে যশোবন্ত সিংহ ত্রিপুরা সরকারকে খারিজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ভি পি সিং-কে, সেই যশোবন্তই অর্থমন্ত্রী হিসেবে ত্রিপুরায় ৬ টাকা প্রতি কিউবিক মিটারএর দাম ঠিক করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদারের পরামর্শক্রমে অথচ দেশের অন্যান্য রাজ্যে এর দাম ১০ টাকা করে। এর ফলে ত্রিপুরায় পুঁজি লগ্নীর সম্ভাবনা তথা চাকরি-ক্ষেত্র তৈরির সম্ভাবনা বেড়ে গেল অনেক গুণ।

দূরদর্শন

বাঘবন্দী খেলা

বম্বের টি ভি সুন্দরী অর্চনা যোগলেকর সম্প্রতি টলিউডে এসে প্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বাঘবন্দী' ছবি করলেন। কিন্তু বহুদিন টি ভি নেটওয়ার্কে তাঁর মুখ নেই কেন? সুনীল দত্তের শান্তি মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্যই কি ভি পি সিং–এর শান্তি হাউস অর্চনাকে চেপে রেখেছিল এখন চন্দ্রশেখর সুবোধ হাওয়ায় শান্তি হাউসের বাঘবন্দী খেলা শেষ হচ্ছে পালাবদলের পালায়!

জাতীয় গ্রন্থাগার

কবন্ধ

আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে ৪-৫ মাস ধরে ডাইরেক্টর নেই। ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর অমীন দাশগুপ্ত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগ দেবার পর থেকে পদটি শূন্য। এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অধ্যক্ষ হীরেন চক্রবর্তী যিনি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভাই এবং প্রাক্তন ডাইরেক্টর স্ত্রী মীরা দাশগুপ্ত যিনি বর্তমানে কলকাতার মার্কিন শিক্ষা ফাউন্ডেশনের কর্তাব্যক্তি, এঁদের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা। হীরেনবাবুর ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ার সুযোগ প্রবল

–চন্দন নিয়োগী
রমাপ্রসাদ ঘোষাল।

ঘনশ্যাম
রবিশংকরের চোখে দেখা চরিত্রগুলি

রবিশংকরের মিউজিক থিয়েটার 'ঘনশ্যাম' নিয়ে যে তোলপাড় করা [illegible] কাহিনী পরিবেশিত হল [illegible] সঙ্গে [illegible] এবং জীবনকথার প্রেক্ষাপটে।

চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক সুন্দরী তরুণী, যেমন তার দুধে আলতা গায়ের রঙ তেমনই তাঁর মুখশ্রী, যেন পটে আঁকা ছবি তরুণীটি সন্তানসম্ভবা। তাই তার প্রতি বাড়ির লোকজনের একটু বিশেষ যত্ন, বিশেষ দেখভাল। কিন্তু হলে হবে কি, তরুণী যেন সদাই বিষণ্ণ, ক্ষীণ ডাক্তার বদ্যি কিছুই বাকি রইল না। অবশেষে একদিন বিপদ বুঝে ডাকা হল ওঝা ওঝা বলল, দুষ্ট আত্মা ভর করেছে, ঝাড়তে হবে চলল ঝাড়ফুঁক। শেষ পর্যন্ত উঠোনের নিমগাছের ডাল ভেঙে নজির রেখে চলে গেল প্রেতাত্মা। কিন্তু হায়, তবুও বাঁচলেন না সেই সুন্দরী তরুণী দুষ্ট আত্মা শরীর ছেড়ে চলে যাবার পরই প্রেতাত্মার স্পর্শদোষলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি—সেই কোন ছেলেবেলায় ছোট্ট রবিশঙ্কর অবাক হয়ে গল্পটি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের মুখে। সেই সুন্দরী তরুণীটি ছিলেন তাঁর দিদিমা তারপর কেটে গেছে কতদিন, জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত ঝড়, কত সুন্দর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে, কিন্তু স্মৃতির পাতা থেকে কখনই মুছে যায় নি ঘটনাটি। এরও অনেকদিন পর ১৯৮৯ এ বার্মিংহাম টুরিং অপেরা কোম্পানির ডাইরেক্টর গ্রাহাম ভিক যখন রবিশংকরের আধুনিক দর্শকদের জন্য সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক কোন কিছু করার কথা বললেন তখন রবিশংকর পড়লেন ভাবনায়, সত্যিই তো নিজের দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কিছু, শিক্ষামূলক কিছু করা দরকার স্বদেশের জন্য স্বজনের জন্য যিনি কিছু করেন তিনিই তো সার্থক শিল্পী। কিন্তু কতই তো সমস্যা আধুনিক সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে; তার ভেতর থেকে কোন সমস্যাটি তিনি দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন? হঠাৎই মনে হল ড্রাগ নিয়ে করলে কেমন হয়? সর্বনাশা ড্রাগের নেশা আজ খুব সমাজের অনেকখানিই তো গ্রাস করতে চলেছে। আর তাই তাঁর হাত, যা বিগত তিন শতাব্দী ধরে অবিরাম সেতারের ঝংকারে শ্রোতাদের নতুন নতুন সুর উপহার দিয়েছে, এবার দেশের মানুষের জন্য ধরলো কলম ড্রাগ বা নেশাগত সমস্যার সঙ্গে সেই বহু বহু দিন আগে মা'র মুখে শোনা গল্পটির সামাজিক প্রেক্ষাপটটির অদ্ভুত সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তৈরি করলেন 'ঘনশ্যাম'। মানুষের নেশাগত সমস্যা এবং সংস্কারগত সমস্যার ওপর তৈরি হল হিউম্যান ট্র্যাজেডি।

"শুধু মা'র মুখে শোনা দিদিমার গল্পটিই নয় ঘনশ্যামের প্রতিটি চরিত্র জীবনের কোন না কোন সময় আমার দেখা এবং জানা, তাই ঘনশ্যাম লিখতে বসে চরিত্র-চিত্রণে এতটুকু অসুবিধের সম্মুখীন হইনি 'ঘনশ্যাম' কেবলমাত্র থিয়েটার নয়, নাচ, গান ও থিয়েটারের সমন্বয়ে এক মিউজিক, যার নায়ক ঘনশ্যাম ও তাঁর স্ত্রী ললিতা বন্ধু রমণ এবং বন্ধুপত্নী কান্তা ওদের দুই একই গ্রামের বাসিন্দা প্রাচীন শিক্ষারীতিতে নৃত্য-শিক্ষাদানই ওদের পেশা। শিষ্যদের ঘিরে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কেটে যায় এই দুই গুরু দম্পতির কিন্তু হঠাৎ ছেদ পড়ল এই অনায়াস জীবনে দোলের দিন ভাঙ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল ঘনশ্যাম ধীরে ধীরে এই সর্বনাশা নেশা গ্রাস করে

রবিশংকর, অমলাশংকর এবং সুকন্যার সঙ্গে

ছবি: উত্তম রায়

ফেলল ওকে। একসময় ন্যূনতম মানবিক বোধও হারিয়ে ফেলল সে। বন্ধুর স্ত্রী কান্তার স্নানের দৃশ্য দেখার সময় স্ত্রীর হাতে নাতে ধরা পড়ল ঘনশ্যাম অবশ্য এই লাগাম ছাড়া জীবন চলল না বেশিদিন মারা গেল সে। কিন্তু তার অশুভ আত্মা এসে ভর করল বন্ধু পত্নী কান্তার উপর। ডাকা হল ওঝা। ওঝা বলল, একমাত্র অন্য কারুর শরীরে এই প্রেতাত্মার প্রবেশ ঘটিয়ে কান্তাকে বাঁচাতে পারি। যার শরীরে প্রেতাত্মা ভর করবে মারা যাবে সে। কিন্তু কে রাজি হবে এতে! স্বইচ্ছায় এগিয়ে এল ললিতা এবং তাঁর মৃত্যু হল।' কাহিনীর শেষ এখানেই, কিন্তু ঘনশ্যামের লেখক তো শুধু লেখক নন মনে প্রাণে তিনি একজন শিল্পী। তাই ললিতার মৃত্যুর পরও কাহিনীকে নিয়ে গেছেন আর একটু দূরে যেখানে ঘনশ্যামের বন্ধু দম্পতি মন্দিরের পুজো সেরে প্রদীপ জেলে দিল বন্ধুর ঘরের দুয়ারে। প্রণাম করে শিষ্যরা শুরু করল নৃত্যশিক্ষা ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে এল মঞ্চ, তখনও ঝলমল করে জ্বলছে দুটি প্রদীপ

কত্থক ভরতনাট্যম কথাকলি সেইসঙ্গে গান

রবিশংকরের সাক্ষাৎকার

প্র: 'ঘনশ্যাম মিউজিক থিয়েটার' এর সঙ্গে আগের প্রযোজনার বিশেষ পার্থক্য আছে? আপনি এই ধরনের একটি পরিকল্পনা নিলেন কেন?

উ: আসলে ব্যাপারটা আমার মাথায় এসেছিল ১৯৮৯ সালেই। আমার বন্ধু গ্রাহাম ভিক, 'সিটি অফ্ বার্মিংহাম ট্যুরিং অপেরা' কোম্পানির পরিচালক। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন এমন কোন বিষয় নিয়ে কাজ করতে, যা আধুনিক মানুষের মনের কাছাকাছি। আর আজকের প্রজন্মের কাছে ড্রাগের মত জ্বলন্ত সমস্যা আর কি আছে বলুন? 'ঘনশ্যাম'-এর গল্প জাতক থেকে নেওয়া। সাজিয়েছি আমি নিজেই। কত্থক, ভারতনাট্যম আর কথাকলি ব্যবহার করে ড্রাগ বিরোধী বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছি।

প্র: অনেকেই বলছেন 'ঘনশ্যাম'-এ উদয়শঙ্করের কল্পনা'-র প্রভাব খুব বেশি—যদিও আপনার প্রযোজনার মান নাকি উদয়শঙ্করের মত অতখানি উন্নত নয়?

উ: উন্নত বা অনুন্নতের বিচার আমি এখানে করব না। তবে একথা অকপটে স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে আমার সবকটি প্রযোজনায় শুধু দাদা নয়, বাবার প্রভাবও অসীম। আর আজকে যে সমালোচনা হচ্ছে তাকেই চিরসত্য বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। দর্শকের মতামত পরে পাল্টাতেও পারে

প্র: 'ঘনশ্যাম মিউজিক থিয়েটার'-এর অনেক জায়গাতেই নাকি কমার্শিয়াল হিন্দি সিনেমার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। আপনি কি একথা স্বীকার করেন?

উ: দেখুন নাটকে 'কঁহা গয়ো ঘনশ্যাম' বলে পূরব অঙ্গের ঠুমরিতে লেখা আমারই একটা গান আছে। ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ললিতা গাইছে গানটি। তখন তার গায়ে জড়ানো সাদা কাপড়। গাইতে গাইতে সে কিন্তু স্মৃতিচারণ করছে। গান প্রায় শেষ হয়ে আসার সময় হঠাৎ সে কল্পনায় দেখতে পায় ঘনশ্যাম সামনে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ললিতা সাদা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শুরু হয় উচ্ছ্বাসে ভরা যুগল নৃত্য। কিন্তু একটু পরেই ললিতা বাস্তবে ফিরে আসে। সে আবার সাদা কাপড় তুলে নেয়। কণ্ঠে নামে বিষাদের সুর। এখানে আমি বাস্তব আর কল্পনাকে একসাথে মিলিয়েছি এতে যদি কেউ হিন্দি ছবির ছোঁয়া খুঁজে পান তাহলে কিছু বলার নেই।

ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তী

প্র: 'ঘনশ্যাম'-এর প্রথম অঙ্কে সাধু আর দ্বিতীয় অঙ্কে ওঝার দৃশ্য কি আজকের জগতের পক্ষে যথেষ্ট অবাস্তব নয়?

উ: আমি যে কোন বিনোদনের ক্ষেত্রে 'নব রসে'র সংমিশ্রণে বিশ্বাস করি। তাই এই ওঝা, ভণ্ড সাধু বা জমিদারকে রেখেছি খানিকটা কমিক্যাল ক্যারেকটার হিসাবে। আঙ্গিকও অনেকটাই দেশীয় যাত্রা বা রামলীলার ধরনে। তবে দৃশ্যগুলো অবাস্তব একথা আমি স্বীকার করি না আমাদের দেশের যে কোন মন্দির বা তীর্থস্থানে এই ধরনের ভণ্ড সাধুর কীর্তিকলাপ প্রচুর দেখা যায়।

প্র: আচ্ছা, শেষ প্রশ্নে একটু বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক। আপনার এখনকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন?

উ: এক কথায় ভরপুর সুকন্যাকে পাওয়া আমার জীবনের এক বিরাট প্রাপ্তি স্ত্রীর প্রেরণা আর সাহায্য আজ আমার প্রধানতম সম্বল। আমার প্রোডাকশন কন্ট্রোলার হিসাবে যেরকম শক্তভাবে হাল ধরে রেখেছে সুকন্যা, যে ভাবতে ভয় হয়, যে ও না থাকলে কি হত।

ও অভিনয়ের সংমিশ্রণে 'ঘনশ্যাম' একটি শক্ত বাঁধুনির নিটোল বাস্তবধর্মী কাহিনী যার প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে শিল্পসম্মত কাজ তাই ঘনশ্যামের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ললিতা যখন গাইছে 'কহাঁ গয়ো ঘনশ্যাম' তখন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই পুরনো দিনে, আনন্দের দিনে। আবার যখন সে বাস্তবে ফিরে আসে তখন তাঁর কণ্ঠে একই গান বিষাদের সুরে শোনা যায়। রবিশংকর বলেন, "ঘনশ্যামের পরিকল্পনায় মিশে আছে উদয়শংকর ও বাবা আলাউদ্দিন খানের দান। শুধু এতেই বা বলি কেন আমার জীবনের সর্বত্রই মিলে মিশে রয়েছেন ওঁরা, এখনও প্রতি মুহূর্তে টের পাই এঁদের উপস্থিতি।"

ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সঙ্গে প্যারিসে রবিশংকরের প্রথম দেখা হয় ১৯৩৪ সালে। তখন সবে আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরেছেন রবিশংকর। ইচ্ছে ধ্রুপদী নৃত্য শেখার সেই সময় এক সন্ধ্যায় ওস্তাদের সেতার শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল তাঁর অন্তরের সুর যেন ওস্তাদ আলাউদ্দিনের সেতারের মূর্ছনায় ঝরে পড়ছে। হৃদয়ের ঠিক তারটিতে কে যেন ছুঁয়ে দিয়েছে তাঁর যাদু কাঠিটি সেই মুহূর্তে রবিশংকর ভুলে গেলেন সব কথা, সব কাজ, দাদা উদয়শংকরের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষার দুটি বছর। ভুলে গেলেন কি উদ্দেশ্যেই বা ভারতে আসা। সোজা চলে গেলেন মধ্যপ্রদেশের মাইহারে, ওস্তাদ আলাউদ্দিনের মন্ত্রশিষ্য হতে "এরপর গুরুকন্যা অন্নপূর্ণা এল আমার জীবনে। যেমন এল তেমনি নিয়তির অমোঘ অঙ্গুলিহেলনে সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে একদিন আলাদাও হয়ে গেলাম আমরা।" দীর্ঘশ্বাস পড়ল একথার উচ্চারণে। আর ঠিক এরপরেই অন্তরের ব্যথাবেদনার তুমুল স্রোতে বাহ্যিক জগৎ ভুলে রবিশংকর ডুবে গেলেন তাঁর সুর সাধনায়

'তখন ফ্যাংশানেও বাজাতে শুরু করলাম। ফিল্ম মিউজিকে কাজও করলাম। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি', 'অপুর সংসার', 'জলসাঘর' তপন সিংহের 'কাবুলিওয়ালা' এইসবগুলিতেই আমার মিউজিক।' এইভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন রবিশংকর। কেটে গেল পঞ্চাশের দশক 'অবশ্য পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই আমার দেখা হয়েছিল বেহালা বাদক ইহুদি মেনুহিনের সঙ্গে। দুজনে তখনই শুরু করলাম এক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' যা তাঁদের যুগ্ম পরিবেশনার মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল প্রথমে ১৯৬৬–র বাথ উৎসবে ও পরে '৬৭ সালে নিউ ইয়র্কে শুরু হল জয়যাত্রা সমস্ত বিশ্ববাসী যেন শিল্পীকে তাঁর উত্তরণের পথটি দেখিয়ে বললেন, এই গো জয়রথে তব জয়যাত্রায় যাওগো। কোথায় গেল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মাদকতাময় পপ গানের আসর? রবিশংকরের সেতারের এক একটি মূর্ছনা কেড়ে নিল সবার মনপ্রাণ হৃদয়

এসময় তাঁকে সমালোচনাও সহ্য করতে হল প্রচুর। অনেকেই বললেন, রবিশংকর নাকি পাশ্চাত্য সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের অবমাননা করছেন। "অনেকে আমাকে বিটলস এর সঙ্গেও তুলনা করলেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমেরিকান ধারার সঙ্গে মিশিয়ে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির দিকেই নাকি এগোচ্ছি আমি " কিন্তু রবিশংকর গায়ে মাখলেন না কিছুই জীবনে যা কিছু সুন্দর অপার্থিব তাকে পেতে হলে যন্ত্রণার পথ তো পেরোতেই হবে। কিন্তু সেতারের তার ছোঁয়ামাত্রই যাঁর হাত কথা বলে, হাজার হাজার শ্রোতাকে যিনি মুহূর্তেই পৌঁছে দিতে পারেন সুরের রাজ্যে তাঁকে ধরে রাখবে এমন সাধ্য কার। 'আমি কিন্তু কখনই ওদের সঙ্গে আপোস করিনি। অনেক ক্ষেত্রেই ওদের আচার ব্যবহার আমার মনমত হয় নি। আর যখনই তা হয়েছে সেই মুহূর্তেই প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমার নবনির্মিত 'ঘনশ্যাম'তে বেজেছে সেই প্রতিবাদী সুর।' সেতার শুনতে বসে কেউ যদি ধূমপানও করতেন বিরক্ত হতেন রবিশংকর। সেতার বাজানোর সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি না হলে আসর ছেড়ে উঠেও যেতেন তিনি। 'তবে ওদেশের মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে মিলেমিশে ভালো কাজও করেছি কিছু। জর্জ হ্যারিসন, বব ডেলানি, হ্যারিক ক্যাপটেনের সঙ্গে আমি এবং আলি আকবর খান একসঙ্গে একটি শো করি উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা। একরাতে প্রায় আট মিলিয়ন ডলার রোজগার হয়েছিল সেবার। তার সবটুকুই ব্যয় করেছি উদ্বাস্তুদের জন্য "

তাঁর জীবনের এক একটি পর্যায় কেটেছে এক এক ভাবে কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা সেতার বাজিয়ে হাজার দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়ে রেখেছেন আবার কখনও ব্যালে নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন দেশে বিদেশে, তেমনই ক্লাসিক্যাল ফিল্মের মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবেও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর। সেই ফেলে আসা জীবনের টুকরো টুকরো হোঁচট খাওয়া মানবিক সমস্যাগুলিকে ভিত্তি করে আজ প্রায় একাত্তর বছর বয়সে পৌঁছে দর্শকের সামনে তিনি উপস্থিত করলেন 'ঘনশ্যাম' নাচ গান ও নাটকের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে তৈরি মানবীয় প্রয়োজনের মিউজিক থিয়েটার

ঘনশ্যাম নিয়ে যেমন প্রশংসা পেয়েছেন রবিশংকর, তেমনি সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর। রবিশংকর বলেন, "আমি তো রবীন্দ্রনাথ বা ইবসেনের গল্প নিয়ে কাজ করিনি যদি করতাম এ ধরনের সমালোচনা সহ্য করতে হত না। লেখক রবিশংকরকে মেনে নেওয়া বুঝি ভীষণ কষ্টকর?" ঘনশ্যাম শুধু রবিশংকরের নয়, রবিশংকরের স্ত্রী সুকন্যারও স্বপ্ন স্বপ্নের। আর সুকন্যা তো শুধু তাঁর স্ত্রী নন প্রেরণাদাত্রীও বটে। জীবনের অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এসে সুকন্যাকে পেয়েছেন রবিশংকর সুকন্যা তাঁর জীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

মাত্র এক বছর আগে ১৯৮৯ এ চিল্কার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে ওঁদের বিয়ে হয়। যদিও তার প্রায় দশ বছর সুকন্যা ওঁর অনুগামী। ন' বছরের মেয়ে অনুষ্কা পড়ে লন্ডনে। স্ত্রী এবং মেয়েকে ঘিরেই রবিশংকরের সাংসারিক জীবন স্রোতস্বিনী নদীর মত বয়ে চলেছে ন' বছরের ফুটফুটে মেয়েটিকে রবিশংকর ডাকেন 'কন্যা' বলে। ভীষণ আদরের মেয়ে তাঁর। 'সুকন্যাকে যখন বিয়ে করি তখনও অনেক কড়া সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল' কিন্তু ধীরে ধীরে সব সমালোচকের মুখই বন্ধ হয়ে গেছে সুকন্যা রবিশংকরের সুখের ঘরকন্না দেখে সুকন্যা রবিশংকরের সাম্প্রতিক প্রোডাকশনের কন্ট্রোলারও বটে।

এর আগে ঘনশ্যামের মত মিউজিক থিয়েটার না করলেও অনেক ব্যালে নাচের কোরিওগ্রাফি করেছেন তিনি, মেলডি এন্ড রিদম, নব রস রঙ এছাড়াও রয়েছে কয়েকটি নৃত্যনাট্য যাঁর কম্পোজিশন তাঁরই করা। মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড, ক্যানাডিয়ান ফ্যানটাসি, দ্য চ্যারিটি চেন এইসব ফিল্মগুলি উল্লেখযোগ্য প্রশংসাও অর্জন করে। রবিশংকরের 'ঘনশ্যাম' কিন্তু ভারতের তুলনায় ব্রিটেনে অনেক বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে যদিও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে 'ঘনশ্যাম' এক নতুন আঙ্গিকে করা একেবারে অন্যরকম এক উপস্থাপনা যাতে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সঙ্গে মিলে মিশে রয়েছে কিছু কমিক্যাল সিকোয়েন্স। "আসলে আমি ঘনশ্যাম এর এই অংশগুলিতে লোকনাট্যের ফর্ম ব্যবহার করেছি বিশেষ করে সাধু এবং গুন্ডার ঘটনাটিতে।' আবার কোথাও ভণ্ড সাধুর নেশাভাঙ করা, বা নেশার ঘোরে পরস্ত্রীর স্নানের দৃশ্য দেখার মত বাস্তবধর্মী ঘটনাগুলিকে সাজিয়েছেন। নেশার ঘোরে মানুষ যে বাস্তবিকই তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় এটা দেখাবারই উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। তবে মনে প্রাণে রবিশংকর তো একজন শিল্পী, তাই ঘনশ্যাম নাটকটিকে প্রতি মুহূর্তেই এক শৈল্পিক পর্যায়ে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তিনি তাই তাঁর নাটক মূলত ড্রাগবিরোধী হলেও মাঝে মাঝেই দর্শককে থমকে ফেলেছে প্রশ্ন এসেছে মনের মূল বক্তব্যটির থেকে সরে আসেননি তো রবিশংকর?

রবিশংকর বলেন, প্রতিটি শিল্পীরই দরকার উৎসাহ উদ্দীপনার, যা শিল্পী পায় তাঁর শ্রোতা এবং দর্শকদের কাছ থেকে। ঘনশ্যাম উপস্থাপনায় রবিশংকর ভারতের মানুষজনের কাছ থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পাননি ঠিকই কিন্তু তবুও তিনি নিরাশ নন। ভবিষ্যতে আরও নতুন কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর তখন হয়ত আগের চেয়েও আরও বেশি কাছাকাছি আসবেন সাধারণ মানুষের, মিশে যাবেন জনারণ্যে, তাঁর জয়যাত্রার আর একটি সোপান তিনি তৈরি করবেন তাঁর নিজের হাতে।

[illegible] ঘোষ

এই দেশের ভবিষ্যত কি? প্রশ্নটা এজন্যই যে,বাক সর্বস্ব মানুষজন জনসাধারণের সঙ্গে পোকা মাকড়ের মতই ব্যবহার শুরু করেছেন। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বন্ধন এদেশবাসীদের সঙ্গে এমনই একটি অপমানজনক আচরণের নামান্তর।

জ্যোতি বসু

এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যখন সংসদীয় প্রণালীর বিড়ম্বনার পরিণতি নির্বাচনে জনগণের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়ার বিপরীত হয়। চন্দ্রশেখরের সরকার গঠনও ঠিক এমনই একটি অবস্থা।

কুশিয়ার

যদি কোন রাষ্ট্রীয় চুম্বক থাকে তবে তিনি রাজীব গান্ধী।

এইচ·কে·এল·ভগত

চিন্তাধারার ক্ষেত্রে রাজীবের সঙ্গে আমার মতভেদ নেই বললেই চলে।

সুব্রহ্মন্যম স্বামী

যদি ভি·পি·সিং ও অজিত সিং আজ একজোট হয়ে থাকে তবে তার কারণ দুজনেই ভ্রষ্টাচারের সমান অংশীদার।

এম জে আকবর

জাতীয় স্বর্ণ সঞ্চয়-এর ব্যাপারে ভি পি সিং দেশের সাথে এমনই কুসন্তানের মত আচরণ করেছেন যে, সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট করার পরেও ঘরের ছোট খাটো জিনিসপত্র বিক্রী করা শুরু হয়েছে।

'সুন্যকাল' কং-ই বুলেটিন

মুলায়ম সিং বিভিন্ন জায়গাতে বিভ্রান্তিকর ভাষণ দিয়ে সমস্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছেন।

আলিগড়ের মুসলিম প্রতিনিধিদল, যাঁরা ৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী সুবোধ কান্ত সহায়-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

আমি তাদেরকেই বেসামাল করছি যারা হুক করে দেশকে বেসামাল করছে।

প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর

কম্প্যুটারের সাহায্যে জোড়া-তালি দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে তা সবই ফলপ্রসূ হবে, কারণ রিমোট কন্ট্রোল রাজীব গান্ধীর হাতে।

অনেক কং নেতা

দিল্লির 'তাজ' দিল্লিতে নয়, আছে বোম্বাই ও কলকাতার দৌলতখানায়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং

যেই প্রধানমন্ত্রী হোক, যেই শাসন করুক, আমরা তো কেবল আদেশ পালন করব।

ধীরুভাই আম্বানী, রিলায়েন্স প্রধান

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ তামিল বা অনুমোদন ক্ষমতা কারোরই নেই

লালু যাদব, মুখ্যমন্ত্রী (বিহার)

আমি বিদেশ দপ্তর কিংবা অর্থদপ্তর চাইনি। এগুলি সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। কিন্তু বাণিজ্য দপ্তর আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। বাণিজ্য, আইন ও ন্যায় এক অদ্ভুত সংযোগ নয় কি?

বাণিজ্যমন্ত্রী, সুব্রহ্মন্যম স্বামী

যদি আপনি দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করতে চান তাহলে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিন।

মেনকা গান্ধী, পরিবেশ রাজ্যমন্ত্রী

দেবীলাল তাঁর বয়সের জন্যই প্রধানমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিয়েছেন। এখন উনার বয়স ৭৬ বছর।

কে কে দীপক, দেবীলালের ঘনিষ্ট সহযোগী

আমার চালেই কেন্দ্রে ভি পি সিং-এর সরকার টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে-

মুলায়ম সিং যাদব, মুখ্যমন্ত্রী (উত্তর প্রদেশ)

জ-কংগ্রেস-বাদ শেষ হয়ে গেছে, ফলে কেন্দ্র থেকে কং-এর সমর্থন তুলে নেবার প্রয়োজন নেই–

কমল মুরারকা

এটা খুবই লজ্জার, কল্যাণ সিং কালবী যিনি সতীপ্রথার সমর্থন-কারীদের মদত দিয়েছিলেন তিনিই মন্ত্রিসভায় আছেন।

সুভাষিনী আলি, সি·পি·এম সাংসদ

এখানে সরকার 'দত্তক' নেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী রাম জন্মভূমি না দেখেই কি করে প্রমাণ চাইছেন? প্রথমে উনি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডল সহ রামজন্মভূমি দেখুন—হয়তো তখন আর প্রমাণ চাইবেন না।

গিরিধারী লাল ভার্গব, সাংসদ

কোরাণ সততই মসজিদ ভাঙা বা সরানোতে অনুমতি দেয়। কিন্তু মুসলমানেরা চায়, অযোধ্যাতে যাই হোক না কেন তা হিন্দু ও মুসলিম উভয়েরই সৌভ্রাতৃপূর্ণ পরিবেশে হোক।

নুরুল হুদা, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল

আমরা ভারতের মুসলিমদের বিরুদ্ধে নই, ভারতে মুসলিমবাদের বাল থ্যাকারে

আমি সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগাচ্ছি।

লালকৃষ্ণ আদবানী

হাজার হাজার আদিবাসী, তপশীলী ও উপজাতি বর্গের মানুষের আদবানির রথকে সোল্লাসে স্বাগত জানানো দেখে আমার আর কোন সন্দেহ নেই যে কারসেবার উন্মাদনা পার্টি ও জাতপাতের প্রাচীরকে ভেঙে দেবে।

উপেন্দ্র মণ্ডল, বন্দীর বি·পি·মণ্ডলের ভাই

প্রকৃত সমস্যা হল রাম জন্মভূমির সঙ্গে রামকে ছেড়ে আরও নানা বিষয় এসে জট পাকিয়েছে।

সুবোধ কান্ত সহায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

সারা কর্ণাটক জানে, আমাকে কেন সরানো হয়েছে? রাজ্যের সব থেকে বড় মদ ব্যবসায়ীর সাথে আপোষ করিনি বলেই সে আমাকে থাকতে দেয় নি।

বীরেন্দ্র পাটিল

যদি কোন কেন্দ্রিয় নেতা তামিলনাড়ুতে এল টি টি ই উগ্রবাদীদের কার্যপন্থা প্রসঙ্গে কথা বলে, তার মানে এই নয় যে সে আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে হটাতে চাইছে।

এম করুণানিধি

এরশাদের ধোকাবাজীর মুখোশ খুলে গেছিল। বৃথাই তিনি গদি আটকে রাখার কূট চাল চেলে-ছিলেন।

বেগম খালিদা জিয়া

আমি যখন শুনলাম শ্রীমতী থ্যাচার পদত্যাগ করেছেন, তখন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি ওঁকে বলতে চেয়েছিলাম যে তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক সমর্থন সব সময় আছে।

রোনাল্ড রেগন (প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট)

কলাকুশলী এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রমাণের উপর নির্ভর-শীল হওয়া উচিত। কারণ প্রামাণিক কাজের ক্ষেত্রে এর অভাব আপনাকে বাস্তব সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত করবে এবং কাজের ক্ষেত্রে আপনি তা দেখাতে পারবেন না।

ইঙ্গমার বার্গম্যান, চলচ্চিত্র নির্মাতা

আইনের বাস্তবতা জনমতের দর্পণে পুলিশের প্রতিচ্ছবিতেই দেখা যায়।

ওয়াই বি চন্দ্রচূড়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনদাতাদের উপর পাঠকদের তুলনায় বেশি বোঝা চাপায়। বিজ্ঞাপন ও পাঠক—এই দুয়ের মাঝের বৈষম্য-তার অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

এলেন ন্যুহার্থ গার্নেট ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান, 'অ্যাডভারটাইজিংএজ'

আপনি যদি আমেরিকার কোন রেস্তোরাঁতে যান তাহলে আপনার বাচ্চার বসবার জন্য চেয়ার দেওয়া হবে কুকুরকে সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু ফ্রান্সে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা, সেখানে আপনার বাচ্চাকে দরকার নেই কুকুরকেই টেবিলের ওপরে বসিয়ে দেওয়া হবে।

জনৈক ফ্রান্সের সাংবাদিক

আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। ভারতের হয়ে আবার নেতৃত্ব করা যদি আমার কপালে লেখা থাকে, তাহলে চাই বা না চাই আমি তা পাবই।

রবি শাস্ত্রী

উজ্জ্বল দাসের বাড়ি উল্টোডাঙায়। বাড়ি বলতে, রেল লাইনের পাশে জবর-দখলের জমিতে আধকাটা জায়গার উপর দরমার বেড়া আর টালির চালের নিচে বিধবা মা, দুই বোন আর ছোট এক ভাইকে নিয়ে তার সংসার '৭৯ সালে ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে বাবা মারা যায়, পড়াশুনো বন্ধ হয়। এইট পাশের ভিত্তিতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটা করিয়েছিল সেই সময়। তারপর থেকে এ যাবৎ অনেক দৌড়াদৌড়ি করেছে, হাতে পায়ে ধরাধরি করেছে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে একটা ইন্টারভিউও পায় নি। মা লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করত আর উজ্জ্বল ট্রেনে বাসে এটা–ওটা ফেরি করে বেড়াতে বছর খানেক আগে একটা লটারির টিকিটের দোকান দিয়ে বসেছে। এখন দিন চলেছে এই ভাবেই।

পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই এখন এক ছবি। প্রতি পদক্ষেপেই এখন হতাশা আর অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান লক্ষ লক্ষ বেকার। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সূত্রে জানতে পারা যায় যে বিগত কয়েক বছরে এ রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যা বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে এখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ৬৯টি। সরকারি অফিস–বাড়িগুলি ঝকঝকে নয় বরং লেটেস্ট মডেলের বিল্ডিং যেখানে বেকার মানুষদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিদিন সকাল দশটায় রেশনকার্ড হাতে পৌঁছায় মানুষেরা, মেয়েদের ব্যবস্থা আলাদা ফ্লোরে। লাইনে মুখ গুঁজে ঠেলা–ঠেলি, হুড়োহুড়ি করতে করতে প্রতিদিন 'চিত্রগুপ্তের' খাতায় নাম লিখিয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ, আট বছর দশ বছরেও যাদের ভাগ্যে ইন্টারভিউর একটা 'কল' জোটে না।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একজন পদস্থ অফিসার মিঃ দিলীপ কর জানান যে এখানকার সামগ্রিক চিত্রটি এক কথায় খুবই ভয়াবহ। কর্মবিনিয়োগের কোন স্কোপ নেই, তাই মানুষের চাকরি পাবার কোন আশাও নেই। এদিকে বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে প্রতিদিন আর সেই তুলনায় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি হয়েছে হাতে গোনা। এখন এ রাজ্যে রেজিস্টার্ড বেকারের সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ২২ হাজার পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর যোগ হচ্ছে হাজার হাজার কর্মপ্রার্থী, যাদের এখনই কিছু উপার্জন না করলে চলবে না। শহরের শতকরা দশ থেকে কুড়ি শতাংশ মানুষেরও কর্মসংস্থান নেই। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারির হার সব থেকে বেশি। এসব ছাড়াও নাম না লেখানো বেকার আর অর্ধবেকারের সংখ্যা অগণিত আর এ রাজ্যের ৬০ শতাংশ নিরক্ষর কর্মপ্রার্থী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রি করেন না, তাই এই রাজ্যে লাইভ রেজিস্টার কত কর্মপ্রার্থী আছে, আর তার মধ্যে কত লোককে নিয়োগ করা হল তার হিসেব করে এখানকার বেকারের সংখ্যা জানা যায় না এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে মুখ্যত সরকারি সেক্টারে চাকরি হয়ে থাকে। এর বাইরেও কিছু কিছু কর্মসংস্থান হয় কিন্তু বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীর তুলনায় কর্মবিনিয়োগ নামমাত্র

ষাটের দশকের পর থেকে এ রাজ্যে শিল্পায়ন সেরকম বিশেষ কিছু না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে বেকারি বাড়তে বাড়তে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এই প্রসঙ্গে রিজিও নাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার মিঃ বি আর রায়, বলেন, সার্বিকভাবে দেশের শিল্পনীতি না বদলালে বেকারত্ব বাড়বেই, তবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মানসিকতার উপরও এই ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে। সরকারি চাকরির নিশ্চয়তার উপরই তাদের ফ্যাসিনেশন বেশি তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যতদিন পর্যন্ত বয়স এবং চাকরির সুযোগ থাকে তারা এই নিশ্চিত চাকরির উপর নির্ভর করে থাকে সেক্ষেত্রে তাই কম্পিটিশনও বেড়ে যায়। পরিশেষে চাকরি না পাবার সংখ্যাই সব থেকে বেশি। বছরে ৪ থেকে ৫ লক্ষ নতুন বেকার নাম নথীভুক্ত করান গত বছর প্রায় ৪ লক্ষ ৯২ হাজার ৯০২ জন বেকারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্তু গত ৫ বছরে এই রাজ্যের সংগঠিত সেক্টারে ১০ হাজারের বেশি লোক

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ : বেকারকে বিদ্রূপ

মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান কেন্দ্র ঘেরাও অভিযানে সাফল্যের পিছনে এক্সচেঞ্জগুলির অন্তরালে নিরন্তর ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক কেলেংকারি।

চাকরি পায় নি। '৮৯ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে ইন্টারভিউর জন্য 'কল' দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষকে আর চাকরি পেয়েছে মাত্র ৯ হাজার ৯৮৪ জন আগে চাকরির জন্য ১টি সীট থাকলে ১০ জনকে ইন্টারভিউতে 'কল' করা হত আর এখন ১টা সীট থাকলে ২৫ জনকে 'কল' করা হয়, তাই কম্পিটিশনও প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। কোন কোয়ালিফিকেশনেই এখন আর চাকরির বিশেষ কোন স্কোপ নেই। চাকরির সমস্ত রাস্তাই এখন বন্ধ। বিশেষ কিছু সাবজেক্টে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করলে কিছু কিছু চাকরি পাওয়া যায় তবে তা পার্সেন্টেজে আসে না।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে লোন তুলে ব্যবসা করার জন্যও প্রতি বছর দরখাস্ত জমা পড়ছে লাখ দেড় লাখ মানুষের। এই প্রসঙ্গে মি. বি আর রায় জানান আর্থিক বছর অনুযায়ী এক্সচেঞ্জের কার্ডের বয়স অন্তত ১ বছর হতে হবে, বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে, পারিবারিক আয় মাসে ১০০০ টাকার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত আয় মাসে ৫০ টাকার মধ্যে হতে হবে। একবার বেকার ভাতা নিলে ৬ বছরের মধ্যে কোন লোন দেওয়া হয় না। তাছাড়া ব্যবসার স্কীম অনুমোদন হলে তবেই লোন দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের আর্থিক বছরে ৬৫,০০০ মানুষকে লোন দেওয়ার টার্গেট ছিল, কিন্তু লোনের জন্য দরখাস্ত জমা পড়েছিল ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৭০ জনের, তার মধ্যে ৫২,৯০৫ জনের দরখাস্ত পাঠানো হয় ব্যাংকে, ব্যাংক ২৪,৬৬৪ জনের লোনের টাকা মঞ্জুরি করে এবং অবশেষে টাকা পায় মাত্র ১৬,৬৩৯ জন বেকার। ১৯৮৬–৮৭ সালের স্কীমের লোন এখনও দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংক এখন আর চট করে লোন মঞ্জুর করতে রাজী হয় না। যে সমস্ত ব্যবসায় কম্পিটিশান বেশি যেমন স্টেশনারী দোকান, কাপড়ের দোকান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাংক লোন দিতে চায় না অনেকেই লোন নিয়ে সময় মতো টাকা ফেরৎ দেয় না তাগাদা দিয়ে দিয়েও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা ফেরৎ পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য প্রকৃত যাদের লোন দরকার তারা লোন পাচ্ছে না। যাদের অন্য ব্যবসা চলছে রমরমা করে কিংবা হয়তো সরকারি অফিসেই চাকরি করছে তারাও এসে লোনের টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর প্রকৃত যে বেকার সে টাকা পাচ্ছে না এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে আমারই বিশেষ পরিচিত একটি ছেলে, পাঁচ আঙুলে পাঁচটা সোনার আংটি, সল্টলেক সুপার মার্কেটে তাদের চালু ওষুধের দোকান আছে, সেও এসে লোনের টাকা তুলে নিয়ে গেল কিছুদিন আগে

'৭৭ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধানের থেকে সার্বিক ক্ষতিই বেশি হয়েছে বলে মনে করেন রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার মিঃ বি আর

রিজিওন্যাল এমপ্লয়মেন্ট অফিসার মিঃ বি.আর. রায়

রায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বহু কাজ যেগুলো আগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হত সেগুলো আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এন্টায়ার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাজ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের হাতের বাইরে চলে গেছে। যে সমস্ত 'ক্ল্যারিক্যাল জব' আগে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হত সেগুলি এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে স্টেট গভর্ণমেন্ট এই বিশাল ক্ষতি পূরণ করতে পারে নি। আমরা তো এজেন্সি মাত্র, যাদের লোক নেবার কথা, চাকরির সুযোগ তৈরি করার কথা তারা যদি ঠিক-মতো আমাদের ব্যবহার করতে না পারে তাহলে আমাদের ক্ষমতাও সীমিত হয়ে পড়ে লোকে এসব ব্যাপার বোঝে না তারা আমাদের নানা কথা বলে, রাস্তা দিয়ে গেলে তারা চিৎকার করে বলে ওই যে চোরটা যাচ্ছে। আমাদের শুনতে হয় কি করব চাকরি করতে এসেছি শুনতেই হবে। লোকজনকেও ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, ১৩ বছর ১৪ বছর বাদে ১টা কল পায়, তাদের ধৈর্য থাকে না।'

১৯৮৯ সালের ২৮ মে একটি আলোচনা সভায় ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন যে গত বারো বছরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছ থেকে সরকার যে সব সুযোগ সুবিধা নিয়েছে তাতে সারা দেশে ৪৭ লক্ষ নতুন চাকরি তৈরি করা যেত কিন্তু সেইক্ষেত্রে নতুন চাকরি তৈরি হয়েছে মাত্র ৫ লক্ষ ২৪ হাজার। রাজনৈতিক কারণে ঢালাও লোক নিয়োগ হয়েছে সরকারি শিল্পে মন্ত্রী থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নিজের লোকজন আর আত্মীয়স্বজনে ভরে গেছে পাবলিক সেক্টরগুলি। তারই ফলস্বরূপ বেশির ভাগ সরকারি শিল্প চলছে ভরতুকি দিয়ে আর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকারের নামের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিনকে দিন।

বামফ্রন্টের রাজত্বে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি গত ২৯ ডিসেম্বর মমতা ব্যানার্জির ডাকে বেকার যুবকদের চাকরি দেবার নামে কর্মসংস্থান কেন্দ্রে যে দুর্নীতি চলছে তার প্রতিবাদে সল্টলেক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সমেত সারা রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলি ঘেরাও করা হয়। এক্সচেঞ্জের গেটে তালা লাগিয়ে প্রতীক প্রতিবাদ জানায় রাজ্য যুব কংগ্রেস। ওইসব বিক্ষোভসভায় সি পি এম এর সমালোচনা করে মমতা ব্যানার্জি বলেন, '১৪ বছরে ওরা কটা বেকারের চাকরি দিয়েছে? জীবনে ওরা বেকারদের চাকরি দেবে না। কারণ চাকরি দিলে ওরা মাইনে করা ক্যাডার পাবে কোথা থেকে? ক্যাডারদের চাকরি না দিলে কাদের দিয়ে রিগিং করাবে?' এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস কাউন্সিলার অতীন ঘোষ বলেন, 'গত ১৩ বছর ধরে আমরা দেখেছি যে ৭ থেকে ১০ বছরের কার্ড হোল্ডাররাও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কোন কল পাচ্ছে না। অথচ এমন অনেক ক্যান্ডিডেট কল পাচ্ছে, চাকরি পাচ্ছে, যাদের কোন সিনিয়ারিটি নেই বয়স, সিনিয়ারিটি, কোয়ালিফিকেশন আর রোটেশানের ভিত্তিতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরি দেবার কথা। ১ বছরে একজনকে একটাই কল দেওয়ার

মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ঘেরাও

সাক্ষাৎকার

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এখন পার্টির দপ্তর

মমতা ব্যানার্জি

প্রশ্ন: রাজ্যের সব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ঘেরাও করে তালা ঝুলিয়ে দিলেন কেন ?

মমতা ব্যানার্জি: রামায়ণের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছিল ছয় মাস পরে, কিন্তু কলিযুগের কুম্ভকর্ণ সি পি এম এর ঘুম ১৩ বছরেও ভাঙছে না। তাই তাঁদের ঘরের ছেলে ছাড়া অন্যরা শুধু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড রিনিউ করিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর কিন্তু ইন্টারভিউর ডাক পাচ্ছে না এরই প্রতিবাদে যুব কংগ্রেস কর্মীরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে তালা ঝুলিয়েছে। চাকরি দিতে না পারলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দরকার কি?

প্রশ্ন: কিভাবে এক্সচেঞ্জকে ব্যবহার করে সি পি এম স্বজনপোষণ ও ক্যাডার তোষণ করছে ?

মমতা ব্যানার্জি - এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ–এর কোন নিয়ম কানুন, কোন পলিসিই তো মানছে না সি পি এম। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিস এখন পার্টির দপ্তর হয়ে উঠেছে পার্টির ক্যাডারদের ছাড়া চাকরি দেওয়া হয় না। সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কীমের ক্ষেত্রেও চলছে একই দুর্নীতি বেকারদের ব্যবসা করার জন্য যে লোন দেওয়া হয় তার সিলেকশান কমিটিতে আছেন কো অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা যেমন, বেহালার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে আছেন একজন বিশিষ্ট কো–অর্ডিনেশন কমিটির নেতা। স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে সমস্ত লোন দেওয়া হয় তা এখন জ্যোতিনন্দন চন্দন বসুর একচেটিয়া। বেকার যুবকদের নাম ভাঙিয়ে কিছু ক্যাডার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে চাকরি পাচ্ছে আর তারাই পরে দুর্নীতি করে বেড়াচ্ছে

প্রশ্ন. রাজ্যে চাকরি সৃষ্টির জন্য বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা না করলে চাকরি আসবে কি করে ?

মমতা ব্যানার্জি: আসবে না, এইভাবে চলতে থাকলে চাকরি তৈরি হবে না। তবে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে চলবে

প্রশ্ন: আপনি এ রাজ্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

মমতা ব্যানার্জি: এ রাজ্যে শিল্পোন্নয়ন না হলে, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু '৭৮ সালের পর থেকে শিল্পোন্নয়ন তো দূরস্থান বেশির ভাগ কলকারখানায় তালা ঝুলতে শুরু করেছে। কেন্দ্রে ১১ মাস বন্ধু সরকার ছিল কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধানের বিষয়ে এই রাজ্য সরকার বিশেষ কোন উদ্যোগ দেখায় নি কখনও আমরা সমস্ত রকম দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখা মানে তাদের রেকর্ডের কাগজ ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেওয়া নয়, যথাযথ যোগ্যতা এবং সিনিয়ারিটির উপর ভিত্তি করে ক্যান্ডিডেটদের 'কল' দিতে হবে, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিস থেকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাতে হবে যে গত ১৩ বছরে কত লোক কোথায় কোথায় কিভাবে চাকরি পেয়েছে। টাকা পয়সা নিয়ে চাকরি দেওয়ার দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে

প্রশ্ন: সংখ্যালঘুদের জন্য সি পি এম–এর নেতারা প্রকাশ্য জনসভায় এত চিৎকার করছে কিন্তু বাস্তবে তাদের কতজনকে গত তের বছরে তারা চাকরি দিয়েছে ?

মমতা ব্যানার্জি. ১৩ বছরে ১৩ জনকেও চাকরি দেয়নি তারা

নিয়ম। পর পর ৩টে কল পেলে ২ বছরের মধ্যে তাকে আর কল দেওয়ার নিয়ম নেই অথচ অনেক ক্ষেত্রে এই সব নিয়ম কানুন কিছুই মানা হয় না. আসলে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এখন দুর্নীতিতে ভরে গেছে, দিনে দিনে নোংরা রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকারদের বিভিন্নভাবে ম্যানিপুলেট করছে এই সরকার. নিম্নপদস্থ কেরাণী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ অফিসার পর্যন্ত এখানকার টোটাল সেট আপটা তারা নিজেদের মত করে নিয়েছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বামফ্রন্টের পার্টি অফিসে বসে লিস্ট তৈরি করা হয়, সেই লিস্ট অনুযায়ী এমপ্লয়মেন্ট এক্স-চেঞ্জের চীফ সেক্রেটারীর মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত ক্যান্ডিডেটের এক্সচেঞ্জের কার্ডের নাম্বার ধরে ধরে কল পাঠানো হয়। ১৯৮৫ সালের আগে পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটি সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে কর্পো-রেশনের বিভিন্ন চাকরির কল পাঠানো হত কারণ তখন সেখানে কোন ইলেক্টেড বডি ছিল না, বিরোধী পার্টির মতামত দেবার মত কেউ ছিল না তাই অসুবিধাও ছিল না, কিন্তু এখন সেখানে অপজিশন পার্টির সদস্যদের নিয়ে ইলেক্টেড বডি তৈরি হওয়ায় সেই সমস্ত চাকরিগুলি এম-প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অধীনস্থ করা হল কারণ সেখানে দুর্নীতির সরাসরি বিরোধীতা করার কেউ নেই। তা থেকেই বোঝা যায় যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কতখানি দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। চূড়ান্ত দলবাজী চলছে এখানে ১৯৮০ সালের পর থেকে সিনিয়ারিটি বেসিসে কল দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। পার্টির লোক ছাড়া এখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে চাকরি পাওয়ার সুযোগ খুবই কম।'

'দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন পদস্থ অফিসাররা ঘুষ নিয়ে টাকার বিনি-ময়ে কল পাঠানো চলছে অনেক ক্ষেত্রেই। এমন অনেক প্রাইভেট সেক্টার আছে, যে সব ক্ষেত্রে ক্যান্ডিডেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থেকে একটা কল বের করতে পারলে চাকরি হয়ে যায়, সেইসব ক্ষেত্রেই এই ধরনের দুর্নীতি আরও বেশি করে হয়। রাজ্য সরকারও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না কারণ এই সমস্ত পদস্থ অফিসারদের দিয়ে তারা নিজেরাও বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে থাকে।'

তিনি আরও বলেন যে, 'লোনের ব্যাপারেও চলছে চরম দুর্নীতি। এখানে নানা ভাবে হ্যারাস করা হচ্ছে বেকারদের। ৮ থেকে ১০ বছরের কার্ড হোল্ডাররাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোন দাবী করে। মাত্র হাজার পঁচিশ টাকার বিনিময়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড স্যারেন্ডার করে সরকারকে লিখে দিতে হয়, 'আমি আর কখনও চাকরি দাবী করব না'—এই রকম জীবনের শেষ ঝুঁকি নিয়ে যে সমস্ত বেকাররা আসে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তাদেরও বঞ্চনা করছে। এখানকার ১১ নং ১২নং এবং ১৩ নং ওয়ার্ড লোনের জন্য দাবী করার পর ৮০ জনের ব্যবসার প্রজেক্ট মঞ্জুর হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ৮০টা প্রজেক্ট মঞ্জুর হওয়ার পরও লোন পেয়েছে মাত্র ২৮ জন।'

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেকার যুবকদের কার্ডের রেকর্ড খোয়া যাচ্ছে হামেশাই। হুগলী জেলার সফিউল ইসলাম সরকার ১৯৭৮ সালে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এক্সচেঞ্জ অফিসে স্কুল ফাইনাল, স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং এন সি সি সার্টিফিকেট সমেত কার্ড করেছিলেন। কার্ড নাম্বার পি ই ৬০১ ৭৮ ১৯৮৭ সালে কার্ড রিনিউ করাতে গিয়ে জানতে পারলেন যে রেকর্ড সেকশন থেকে তার রেকর্ড খোয়া গেছে তারপর তিনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের রিজিওন্যাল অফিসারকে মু দুবার চিঠি দিয়েছেন কিন্তু কোন উত্তর পান নি। পরে লেবার মিনিস্টারের কাছে তিনি চিঠি দেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় নি। মহম্মদ সফিউল বলেন, 'এখনও পর্যন্ত আমি কার্ড রিনিউ করে যাচ্ছি। চাকরির বয়সও এখন আমার নেই জানি না শেষ পর্যন্ত আদৌ কিছু হবে কিনা।'

সপ্তম যোজনার শেষে বেকার সমস্যার বিস্ফোরণ দেখে বোঝা যায় না যে শিল্পোন্নয়ন হলেও মানুষের কর্মসংস্থান হবে কিনা। এ রাজ্যের ঘরে ঘরে আজ বেকার পারিবারিক জীবনে দেখা যাচ্ছে, বাবার দায় বয়স্ক শিক্ষিত বেকার ছেলে, দাদার গলগ্রহ বেকার ভাই, অবিবাহিতা বেকার বোন। একটা আশ্রয় আর দু'মুঠো খাবারের জন্য হেনস্থা হয় নানাভাবে। লক্ষ লাখ বেকার বেড়ে চলেছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ তাদের নাম লেখার জন্য আরও অফিস খুলে চলেছে একের পর এক কিন্তু বেকার সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না কোন ক্রমেই

সব্যসাচী বসু

ছবি : বিজন চক্রবর্তী ও তুষার কর্মকার

কলকাতার দাতাকর্ণরা

১৮৬১ সাল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নিয়ে মামলা চলছে। আসামী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে রেভারেন্ড জেমস লঙকে। অপরাধ নীলকরদের মানহানি। মহামান্য আদালত বিধান দিয়েছেন –সাহেবের একমাস কারাদণ্ড সঙ্গে সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড। বিচারপতির রায় পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে নেমে এল বিস্ময় নীরবতা। সাহেবদের মানহানির কারণে সাহেবের বিরুদ্ধে শাস্তি! সেদিন আদালত কক্ষের নীরবতা ভাঙলেন এক সুদর্শন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ অভিজাত বাঙালি মানুষটি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লঙের কাছে বললেন, 'আপনার উপর যে অর্থদণ্ড চাপানো আছে, এখানে এটুকুই আছে', বলে একটি খাম এগিয়ে দিলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙের দিকে। মানুষটি বিনম্র নম্র হয়ে আরও বললেন, 'এই সামান্য সহায়তা স্বীকার করলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

বাঙালি দানবীরের সেই 'সামান্য' দান যে কত 'অসামান্য'–সেদিন সকৃতজ্ঞ লঙ–সাহেবের চোখ দু'টিই তা বলে দিয়েছিল। হৃদয়ের মহত্বে সেদিন যিনি কিংবদন্তীর নায়ক হলেন তাঁর নাম কালীপ্রসন্ন সিংহ। শুধুমাত্র বিদ্যোৎসাহিনী সভার স্রষ্টা কিংবা শব্দ মহাভারতের রূপকারই তিনি নন, নিঃস্বার্থ দানের ক্ষেত্রে কলকাতায় তিনি এক অবিসংবাদিত নাম।

দানশীল কালীপ্রসন্ন জন্ম নিয়েছিলেন বিখ্যাত ধনী পরিবারে। ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ। অথচ বনেদী বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙালি সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক (যার বর্ণনা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বইতে পাওয়া যাবে) সেগুলির প্রতি কালীপ্রসন্নের আগ্রহ ছিল না। বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েও ভোগসুখে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়নি, এমন কি তথাকথিত বিষয়বুদ্ধিরও অভাব দেখা গেছে তাঁর ভেতরে। অনেকেই তাই কালীপ্রসন্নকে ধিক্কার জানিয়েছেন এই বলে, 'কালীপ্রসন্ন আর পাঁচজন বড়লোকের ছেলের মত টাকা ওড়াতেই জানতেন।' আবার দীনবন্ধু মিত্র কালীপ্রসন্নের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অন্যভাবে–

'দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী ধনেশ
দেশের কল্যাণে প্রাণ করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ছরা,
'হুতোম পেঁচার খাতা' পড়েছেন ধরা'

বরণীয় মানুষের কলকাতার সমৃদ্ধিকরণে স্মরণীয় দানধ্যানের অনুপুঙ্খ নিয়ে এবারে তথ্যসমৃদ্ধ আলোকপাত!

দাতা কালীপ্রসন্নের দানের তালিকা আরও দীর্ঘ। 'নীলদর্পণের' মামলায় রেভারেণ্ড জেমস লঙের অর্থদণ্ডের হাজার টাকা দেওয়া ছাড়াও বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের পর প্রত্যেক বিধবা বিবাহকারীকে তিনি এক হাজার করে টাকা দিয়েছেন পুরস্কার হিসেবে, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং বহু দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার ছিল কালীপ্রসন্নের কাঁধে। 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'–ছাপার জন্য তিনি মুদ্রাযন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময়ে চিৎপুরে দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠাকালে কালীপ্রসন্ন মুক্তহস্তে দান করেছেন। দীর্ঘ আট বছরের পরিশ্রমে বিরাট আঠারো খণ্ডের মহাভারতের অনুবাদ তিন হাজার কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করার রাজকীয় বদান্যতা কালীপ্রসন্নকেই মানায়। যখন বিশুদ্ধ জলের কল সৃষ্টি হয়নি সে সময়ে কলকাতার জলকষ্টের কথা মাথায় রেখে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে ৫টি ধারাযন্ত্র (ফোয়ারা) বিলেত থেকে আনিয়ে স্থাপন করার দুঃসাহসিক মানসিকতা কেবল পুরুষ সিংহ কালীপ্রসন্নকেই মানাত।

> কালীপ্রসন্নের দানের বিশেষত্ব হল, তাঁর সব দানই সাত্ত্বিক দান। তিনি অন্যদের প্রশংসা লাভ করার জন্যে দান করতেন না।

কালীপ্রসন্নের দানের বিশেষত্ব হল, তাঁর সব দানই সাত্ত্বিক দান। তিনি অন্যদের প্রশংসা লাভ করার জন্যে দান করতেন না। কালীপ্রসন্ন তাই করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহধন্য। লোকে যাই বলুক, কালীপ্রসন্নের দানপ্রবৃত্তি কখনোই রুদ্ধ হতে পারেনি। নীলকরদের নৃশংস অত্যাচার কাহিনী তীব্র ভাষায় লেখালেখি করার সময়ে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আর্চিবাল্ড হিলস্ নামে জনৈক নীলকর ১০,০০০ টাকার মানহানি মামলা করেন। অভিযোগ, সম্পাদক তাঁর চরিত্রে মিথ্যে অপবাদ আরোপ করেছেন। তখনকার ২৪ পরগণার সদর–আমীন তারক-নাথ সেনের কাছে বিচার প্রার্থনা করেছিলেন হিলস শেষে হরিশচন্দ্র নিজের দোষ স্বীকার করলে বিচারক কবলমাত্র সাহেবের মোকদ্দমার খরচটি প্রদান করতে আদিষ্ট হলেন। কিন্তু হঠাৎই মারা গেলেন হরিশচন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই মোকদ্দমার ব্যয় বাবদ অর্থ মেটাতে বসবাসের বাড়িটি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন এবং অন্য কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে হরিশচন্দ্রের পরিবারবর্গকে পথে দাঁড়াতে হয়নি।

কালের ক্রমোত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন এক একজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটে যাঁদের হৃদয়ের মহানুভবতায় শহর, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির চেহারা আগাগোড়া বদলে যায়। তাঁদের নিঃস্বার্থ দানশীলতার মহিমায় শহরের চিত্র চরিত্র অনেক বেশি মহিমময় হয়ে ওঠে। ৩০০ বছরের মহানগর কলকাতার বিকাশের আদিযুগে কে কিভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন তার অনেক ঘটনাই আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। অথচ সেইসব স্মরণীয় দানের সূত্রে চলে আসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিধানচন্দ্র রায়, রানী রাসমণি, রাজা সুবোধ মল্লিক, রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক, ডাঃ নীলরতন সরকার, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, আর.জি কর প্রমুখ মনীষীর নাম। সারা পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র কলকাতার বিকাশ, উত্থানের ইতিহাসটি যে তাঁদের দানশীলতার ঘটনাকে অস্বীকার কখনোই করতে পারে না, এ বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

প্রবাদ চালু আছে–'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।' ফুটপাত থেকে রাজপ্রাসাদ যেখানেই হোক আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রবাদটি প্রায়শই মুখে মুখে ফেরে। বাপ–ঠাকুরদা পর্যন্ত একই প্রবাদ আউড়ে চলেছেন এই একবিংশ শতকের দোরগোড়াতে অথচ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সুবর্ণবণিক

সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দাতা গৌরী সেনের দানশীলতা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এমনিতে কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে জীবন শুরু করলেও বংশগত আমদানি, রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন এবং কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে রীতিমত সম্ভ্রম আদায় করে নেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ীর পরিচিতিকে ঢেকে দেয় 'দাতাকর্ণের' ভূমিকা দেনাগ্রস্ত অথবা বিপদ-গ্রস্তের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর। হুগলির বালি অন্যমতে বহরমপুরে জন্ম হলেও গৌরী সেন তাঁর স্বার্থশূন্য দানের কারণে কলকাতার রক্তমজ্জায় মিশে গেছেন

১৯০৬ সাল। চিত্তরঞ্জন তখন প্রতিষ্ঠিত আইনব্যবসায়ী। বিপুল অর্থোপার্জন আর অবিসংবাদিত খ্যাতি। নিজের আইন–মহল্লায় দেশবন্ধু বলতে গেলে সর্বেসর্বা। ঠিক সে সময়েই মাথায় চাপল বিরাট অংকের ঋণ।

কলকাতার আরেক 'গৌরী সেনের' দানশীলতা পরবর্তীকালে কিংবদন্তী। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তখন ১৯০৬ সাল। চিত্তরঞ্জন তখন প্রতিষ্ঠিত আইনব্যবসায়ী বিপুল অর্থোপার্জন আর অবিসংবাদিত খ্যাতি। নিজের আইন–মহল্লায় দেশবন্ধু বলতে গেলে সর্বেসর্বা। ঠিক সে সময়েই মাথায় চাপল বিরাট অংকের ঋণ। তাও নিজের করা নয়, পিতৃবন্ধুর। দেশবন্ধু সাগ্রহে সেই ঋণ পরিশোধের দায় কাঁধে তুলে নিলেন। সে সময়ে তাঁকে 'দেউলিয়া' বলে ঘোষণা করা হয় ১৯১৩ সালে নিজের 'দেউলিয়া' নাম খণ্ডন করলেন। তাঁর পরোপকারের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বিরল। এমনিতে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপন পছন্দ করতেন। গোড়ার দিকে তাঁর পোশাক–আশাক নাকি প্যারিস থেকে ধুয়ে কলকাতায় আসত। প্রত্যেকদিন পাটভাঙা পোশাক না পরলে তাঁর চলত না। অথচ সেই বিলাসিতাকে তিনি দেশ-প্রেমের কাছে বলিদান করেন। ১৯২০তে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বহু সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারি পেশা হেলায় ত্যাগ করলেন। আত্মনিয়োগ করলেন দেশসেবায় সে সময়—ব্যারি-স্টার সি. আর দাশ ছিলেন ভারতসেরা আইনজীবী স্বয়ং ভারত সরকার বিখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে সাহেব অ্যাডভোকেট—জেনারেলের চাইতে বেশি পারি-শ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাঁকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য সেই পদও তিনি পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের ফলে সারা দেশ অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে উপাধি দেয়—'দেশবন্ধু' বলে। আইন আন্দোলনের সময় বাংলার পরিচালকরূপে চিত্ত-রঞ্জনের নিজের স্ত্রী বাসন্তী দেবী এবং বোন উর্মিলা-দেবীকে কারাবরণ করার আদেশ এবং আইন অমান্য করে ১৯২১–এ নিজের কারাবরণ করার ঘটনাকে বাংলাকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল দেশের কাছে আত্মনিয়োগ করায় অত্যধিক পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধন দেশবন্ধু পরিবারকে বাঙালির কাছে আদর্শ করে তোলে মৃত্যুর আগে নিজ বাসগৃহ জনসাধারণকে দান করে যাওয়া একমাত্র দেশবন্ধুর মত মহানুভব মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আজকের 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' ছিল সেসময়কার দেশবন্ধুর বাসস্থান

কলকাতার দানের ইতিহাসে আর এক স্মরণীয় নাম রানী রাসমণি দরিদ্র এক কৃষিজীবী পরিবারে জন্ম হলেও এই অসামান্য রূপবতীর বিয়ে হয় কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্রের সঙ্গে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন কিন্তু সেই ঐশ্বর্যের তিনি অপব্যবহার করেননি ধর্মে কর্মে এবং দানধ্যানে সময় কাটালেও তেজস্বিনী এই রমণীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং স্বজাতি-প্রীতি রানী রাসমণিকে বাঙালির কাছে আদর্শ স্থানীয়া করে তোলে বহুবার তিনি ইংরেজ সর-কারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। দরিদ্র জেলেদের কাছে মাছ ধরার সুযোগ করে দিয়ে তাদের কাছে তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী হয়েছেন। তখন গঙ্গায় বিদেশি বণিকদের স্টিমার চলত। জেলেরা মাছ ধরার সুযোগ পেত না। জেলেদের অন্নজল পরোক্ষে বিদেশি বেনিয়ারা লুঠ করে নিচ্ছে দেখে রানী ব্যথিত হন। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি গঙ্গায় স্টিমার চলাচল বন্ধ করে দেন। কিনে নেন আউট-রামঘাট, আর্মেনিয়ান ঘাট রানী রাসমণির এই অবিস্মরণীয় দান কলকাতাকে, কলকাতাবাসীকে গর্বিত করেছে

রাজা সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিকের নাম আজ প্রাত-স্মরণীয়। জনগণের রায়ে তিনি 'রাজা' বাংলার গুপ্ত বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় সুবোধচন্দ্র তার ওয়েলিংটনের বাড়িটিকে স্বদেশি আন্দোলনের কেন্দ্র করে তুলেছিলেন ঋষি অরবিন্দকে তিনি দীর্ঘদিন নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। নিজের বাড়িটিকে তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেন। আবার তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন লাইট অব এশিয়া ইনসিওরেন্স লিমিটেড। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ১৯১৬ সালে তিনি এক বিশাল সভায় সভাপতিরূপে এক লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন তাঁর সেই অবিস্মরণীয় দানেরই ফসল আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ছাড়াও নীলরতন সরকার যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনে নীল-রতনের অবদান অবিস্মরণীয়।

তিনি জানতেন, বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রটিকে আরও ব্যপ্ত করা দরকার। যত মানুষ শিক্ষিত হতে পারবে, তাদের জাতীয় চেতনা তত বৃদ্ধি পাবে। আর এই জাতীয় চেতনাই দেশসত্তার মূলমন্ত্র। সুবোধ চন্দ্র বসু মল্লিকের সেরা দানটির জন্যেই—সরকার নয়, জনগণই তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে

কলকাতার আরেক মল্লিক 'রাজাবাহাদুর' রাজেন্দ্র মল্লিক। ১৮৭৮ সালে তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন রাজেন্দ্র মল্লিকের হাতে পরিয়ে দিলেন হীরের আংটি। 'রাজাবাহাদুর' উপাধিও দিয়েছিলেন তিনিই। রাজেন্দ্র সবদিনই দানধ্যান, দরিদ্র নারায়-ণের সেবা করেছেন। কলকাতার চিড়িয়াখানা যাঁর দাক্ষিণ্যে তৈরি হয়েছে, তিনি রাজা রাজেন্দ্র। সেটি ছিল ১ জানুয়ারি ১৮৭৬। পশুশালার উদ্বোধন

করেছিলেন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড কলকাতার মার্বেল প্যালেস রাজেন্দ্ররই শিল্পীমনের বহিঃপ্রকাশ এবং অভূতপূর্ব সৃষ্টি।

শুধু রাজ–রাজড়া রায়বাহাদুর নয়, সরল সাধাসিধে অকৃতদার এক ডাক্তারের কাছে একালের কলকাতাও চির ঋণী এই মানুষটি আর কেউ নন, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের সার্থক রূপকার বিধানচন্দ্র মৃত্যুর আগে নিজের বাসভূমিটিকে রোগনির্ণয় গবেষণা-কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ওয়েলিংটনের মোড়ে বিধানচন্দ্রের বাসগৃহ এখন জনসাধারণের চিকিৎসার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। জীবদ্দশাতেই যিনি ভারতসেরা চিকিৎসক বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সেই বিধানচন্দ্র মানুষকে কিভাবে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন তার তুলনা নেই। তাঁর কাছে যাঁরা কেরানীর কাজ করত, তাদেরকে অনেকদিনই পকেট থেকে টাকা বার করে সংসার চা[illegible]ত সাহায্য করেছেন কত রোগীকে যে বিনা অর্থে তাঁর চিকিৎসাগুণে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর হিসেব বিধিবদ্ধ পরিসংখ্যানে দেওয়া অসম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করার জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা এবং আর্থিক সাহায্য কেউই ভুলতে পারবেন না। আরও দুই ডাক্তার কলকাতার চিকিৎসা ক্ষেত্রটিকে উন্নত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। এঁরা হলেন যথাক্রমে ডাঃ নীলরতন সরকার আর রাধাগোবিন্দ কর। আজকের আর.জি কর মেডিকেল কলেজটি তখন প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হিসেবে স্থাপিত হয় নাম ছিল কর প্রেস ও কারমাইকেল কলেজ। আর এই কলেজটি স্থাপন করার জন্য ডাঃ নীলরতন সরকার এবং রাধাগোবিন্দ কর মুষ্টিভিক্ষা পর্যন্ত করেছেন এবং রোজগার করা টাকা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার জন্য দান করেছেন আর.জি. কর মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ছাড়াও নীলরতন সরকার যাদবপুর যক্ষা হাসপাতাল (বর্তমান–কুমুদশঙ্কর রায় হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন. বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনে নীলরতনের অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু যে দানের কথা বাঙালির সবদিক মেনে রাখার মত, তা হল, দেশি শিল্প গড়ে তোলা ন্যাশনাল ট্যানারি, ন্যাশনাল কোটা ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু উদারচেতা নীলরতন সেই ক্ষতি স্বীকার হাসি মুখেই করেছেন দেশের মানুষের মুখ চেয়ে

কলকাতার অহংকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে যে কত মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা, এবং শ্রম জড়িয়ে আছে এক কথায় তা বলা অসম্ভব বাঙালির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বের দরবারে জায়গা করে দিয়েছেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী, নীলরতন

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়

দ্বারভাঙার মহারাজা এম.এন. দেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন ১৪৫ একর জমি এবং এক লাখ টাকা। নীলরতন ধর ১৯৪৪ সালে দান করেন ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২০০ টাকা। দানশীলা কুসুমকুমারী দেবীর দানের অঙ্ক ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২০০ টাকা। বিহারীলাল মিত্রের দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হয়েছে। বিহারী লাল মিত্রের নামাঙ্কিত লেডিজ হোস্টেল আছে বিবেকানন্দ রোড–এ। অবশ্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসেবে।

রানী রাসমণি

ধর প্রমুখ। দ্বারভাঙার মহারাজা এম.এন. দেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন ১৪৫ একর জমি এবং এক লাখ টাকা। নীলরতন ধর ১৯৪৪ সালে দান করেন ২ লাখ ৩৯ হাজার ২০০ টাকা। দানশীলা কুসুমকুমারী দেবীর দানের অঙ্ক ১ লাখ ৭৪ হাজার ২০০ টাকা। দাতা বিহারীলাল মিত্রের দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্ট হয়েছে। বিহারী লাল মিত্রের নামাঙ্কিত লেডিজ হোস্টেল আছে বিবেকানন্দ রোড এ। অবশ্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি হিসেবে। লেডি অবলা বসু, ঈশান চন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বিরাট অংকের টাকা দান করেন। দাতার তালিকায় আরও রয়েছেন, গুরুদাসনাথ দেব, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত রাসবিহারী ঘোষ শুধু ১০ লক্ষ টাকাই দান করেননি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার জন্য যে আইন বিভাগ আছে তার তদারকিও করেছেন সে সময়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ছাড়াও বহু জনহিতকর কাজে তিনি মুক্ত হস্তে দান করেছেন। তারকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণাকে উন্নত করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা তুলে দেন। এঁদের এই অবিস্মরণীয় দান ব্যতীত কলকাতার এখনকার উজ্জ্বল ঐতিহ্যের দিকটি যে সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারত না, তা বলাই বাহুল্য

দাতাদের নামের পাশে আরেকটি নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করার মত তিনি হলেন প্রিয়নাথ মল্লিক। আলিপুর আদালতে দীর্ঘদিন ওকালতি ছাড়াও ৪৫ বছর তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন দরিদ্র নারায়ণ সেবার জন্য তাঁর ৫০ হাজার টাকার দান আজও সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯০৬ সালে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' এ লোকেন্দ্রনাথ পালিত দশ হাজার টাকা দান করেন। লোকেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত. তারকনাথ ১৯১২ সালে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। তারকনাথের সুযোগ্যপুত্র লোকেন্দ্রও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অকৃত্রিম দানের ক্ষেত্রটিতে আরেকটি নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রের গুপ্ত স্বদেশিসভার প্রকাশ্য কর্মতৎপরতার ফলে দেশলাই প্রস্তুত ও দেশি কাপড় বোনার চেষ্টা হয়। তিনিই দেশি স্টিমার সার্ভিস চালু করার চেষ্টা করেন। তখন ১৮৮৪ সাল নীল চাষ ও পাটের ব্যবসা করতে গিয়ে তাঁকে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয় অথচ তিনি সেই আর্থিক ক্ষতি দেশের মানুষজনের কথা চিন্তা করেই মেনে নেন। শুধুমাত্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই ত্যাগ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের বলিষ্ঠ মানসিকতাটিকে আজ দেশবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন।

এখানেই শেষ নয়, কলকাতার কলকাতা হয়ে

দেশবন্ধুর বিরল ত্যাগ অহংকারী সাক্ষী –চিত্তরঞ্জন সেবাসদন

আলিপুর চিড়িয়াখানা, রাজেন্দ্র মল্লিকের অবদান ছবি পার্থসারথি

যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, রাজা সুবোধ মল্লিকের যত্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

গড়ে ওঠার পেছনে যেসব 'দাতাকর্ণের' দান গঠনাত্মক ভূমিকা পালন করেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কেশব সেন, রাজা রামমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ। এরপরেও রয়েছেন আরও আরও অনেক দাতা। যাদের কাছে কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গবাসীই ঋণী ক্রমিক আবর্তনে পৃথিবীতে দিনরাত্রি আসে। মাস, বছর অতিবাহিত হয়। অনেক কিছুই উঠে আসে ইতিহাসের পাতায় অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। তবু কলকাতার ৩০০ বছরের ইতিহাসে যেসব দাতাকর্ণের স্মরণীয় দান, মহানুভবতা এবং পরোপকারের দৃষ্টান্ত মানুষকে আদর্শের শিক্ষা দিতে পারে, অন্য যে কোন ক্ষেত্রে তার নজির হয়ত বা চোখে পড়বে না।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি ছবি কাজী আব্দুল মোমিত

আগন্তুক

এই জাগতিক মহাবিশ্বেরও কি একটা প্রতিরূপ আছে, যেটি আমাদের মত সমস্ত জীবের প্রতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ? হয়ত আছে—নইলে এমন কাণ্ডটাই বা ঘটবে কি করে ? —এ গল্প সেই কল্পলোকের বৈজ্ঞানিক আধারে।

আজ সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন। আদালতে লোক থৈ থৈ, কোথাও আর পা রাখার ঠাঁই নেই। সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার এবং আইন জগতের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের ব্যাকুল প্রতীক্ষা—কে জানে কি হবে শেষ রায়। অপরাধী কি সাজা পাবে অথবা সম্পূর্ণ মুক্তি কিংবা একের অপরাধ অন্যের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবে ?

কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটল না, ঠিক যেমনটি অনুমান করা হয়েছিল। আদালতের কাজ যথারীতিই শুরু হল জাস্টিস কুরূপ আদালতে ঢুকে চারদিকটা এক নজর দেখে নিলেন তখন সবার দৃষ্টি তাঁর উপর। জাস্টিস কুরূপের মুখে এক কুটিল হাসি। চারপাশ ঘিরে লোকজনের চাপা গুঞ্জন থামাতে তিনি তাঁর টেবিলের উপর অতি পরিচিত মুদ্রায় হাতুড়ি পিটিয়ে বলে উঠলেন, 'অর্ডার অর্ডার' মুহূর্তেই সারা আদালত জুড়ে নেমে এলো মৃতপুরীর নিস্তব্ধতা তারপর তিনি তাঁর রায় শোনানো শুরু করলেন।

'প্রাপ্ত সমস্ত সাক্ষ্যের জবানবন্দী, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং বাদী প্রতিবাদী উকিলের দীর্ঘ জেরার উপর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করে মাননীয় আদালত স্বর্গীয় প্রফেসর রঙ্গাচারীর স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী দেবীকে তাঁর স্বামীকে হত্যার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন। কিন্তু মাননীয় আদালত কল্যাণী দেবীর বর্তমান অবস্থার প্রতি পুনর্বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে আজকের মত আদালতের অন্যান্য কাজেরও সমাপ্তি ঘোষণা করা হল।'

জাস্টিস কুরূপের এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কক্ষের শেষপ্রান্ত থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল, 'না আদালত এইভাবে তার সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন না। এই বিচার একতরফা এবং সম্পূর্ণ অবাস্তব।'

'অর্ডার অর্ডার।' পরিস্থিতি সামাল দিতে, জাস্টিস কুরূপ ক্রোধের সঙ্গে হাতুড়ি ঠুকলেন। সামনে দূরে দৃষ্টি রেখে আগন্তুককে খোঁজার চেষ্টা করলেন একবার। তারপর যেদিক থেকে আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, ঠিক সেই দিক লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন জাস্টিস কুরূপ 'দূর থেকে নয়, যাকিছু বলার সামনে এসে বলুন।'

জাস্টিস কুরূপ এমনই এক ব্যক্তিত্ব—যাঁকে আইন জগতের প্রবাদ পুরুষ বললেও বেশি বলা হয় না। কিন্তু তাঁর কাজের দক্ষতার সঙ্গে মেজাজটাও ছিল কড়া আইনের মারপ্যাঁচে তাঁর জুড়ি ছিল না, তাঁর জেরার সামনে বড় বড় প্রবীণ উকিলেরাও পর্যন্ত মাথা নত করতেন ভীমপরাক্রমের রাশভারি এই পুরুষটির সামনে দাঁড়াতে যে কেউ ভয় পেতেন, আর ধৃষ্টতা দেখানোর তো প্রশ্নই উঠতো না। তবে তাঁর কাছে এ পর্যন্ত সকলেই সুবিচার পেয়েছেন। নিরপরাধ মানুষেরা পেয়েছেন সম্পূর্ণ মুক্তি তিনি প্রতিবাদী উকিলদের কারসাজি মুহূর্তেই এমনভাবে নস্যাৎ করে দিতেন যে তাঁদের আর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করা ছাড়া কোন উপায় থাকত না। আর নির্দোষ মক্কেলেরা তাঁর সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনায় হাসি মুখে ঘরে ফিরতেন

জাস্টিস কুরূপের আদালতে বিচিত্র সব কেস আসত আর এই কেসের পরিণতি শেষ পর্যন্ত যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বড় বড় আইনজীবীর পক্ষেও অনুমান করা সহজ হত না ভাগ্যের কি পরিহাস, সেদিন এমনই এক অদ্ভুত কেসের দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছিল আমাদের। বহু জেরা, বহু তর্ক যুক্তির পর সেদিন বিচারের রায় যখন শোনানো হল, ঠিক তখনই ঘটলো এই সংঘাতিক ঘটনা। এই ঘটনা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অলৌকিক মনে হলেও সবার চোখের সামনে ঘটে যেতে দেখে জাস্টিস কুরূপও সেদিন ভীষণ রকম বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন।

কেসটা ছিল একটা হত্যাকাণ্ডের ইউনিভার্সিটির টেলিকমুনিকেশন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসর রঙ্গাচারীকে কিছু দিন আগে হত্যা করা হয়। তিনি এখানকার একজন নাম করা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে তাঁর প্রায়ই রাত হয়ে যেত। এমনই একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় ফেরার পথে আধো অন্ধকারে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। প্রফেসর রঙ্গাচারীর আর্ত চিৎকার শোনা যেতে হত্যাকারী অন্ধকারের মধ্যেই ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দেয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই সেদিন প্রফেসর রঙ্গাচারী অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

চিৎকার শুনে সময়মত ঘটনাস্থলে ডিপার্টমেন্টের চাপরাসী এবং ওয়াচম্যান এসে তাঁকে নিরাপদে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় যদিও এরপর আর অপরাধীর কোন খবর পাওয়া যায় নি প্রফেসর রঙ্গাচারীও এই দুর্ঘটনার পর একটু সতর্ক হয়ে যান। এরপর তিনি ঠিক সময়ে ঘরে ফিরতেন এবং সাবধানে চলাফেরা করতেন, যদিও তাঁর গবেষণার কাজে এর কোন প্রভাব পড়েনি, ঠিক আগের মতই তিনি এ ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

পুলিশ এই দুর্ঘটনার সুলুকসন্ধানে প্রফেসর রঙ্গাচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তাদের তেমন কিছু সাহায্য করতে পারলেন না তাঁর কোন শত্রু আছে বলেও তিনি মনে করেন না আর কি করেই বা থাকবে—ভোর চারটের সময় তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে আসতেন, দিনে ক্লাস, তারপর আবার ল্যাবরেটরিতে একটানা কাজের ব্যস্ততা আর এই ল্যাবরেটরি থেকে যখন বাসায় ফিরে আসতেন তখন সন্ধ্যা শেষ হয়ে নেমে আসত রাত্রি, সে সময় খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম ছাড়া আর আশপাশে কোথাও যাওয়ার উপায় থাকত না

তাঁর এই ল্যাবরেটরির চেহারাটাই বা কেমন ছিল ? এক কথায় নানা রকম তারের মায়াজাল ট্রান্সমিটার, রিসিভার, মাইক্রোফোন আর হাজারো তারের বিচিত্র জটাজাল রঙ বেরঙের কত না বাল্ব জ্বলছে নিভছে। পিপ পিপ আওয়াজে, যে আওয়াজ কিছু চেনা কিছু বা অচেনা।

প্রফেসর রঙ্গাচারীর সংসারটাও খুব বড় নয়। তিনি আর তাঁর স্ত্রী কল্যাণী দেবী ছাড়া সে সংসারের আর কোন সদস্য ছিল না সুতরাং সেখানেও তাঁর কোন শত্রুতার প্রশ্ন ওঠে না তবে প্রফেসর রঙ্গাচারী

এ ব্যাপারে একটা রহস্যজনক খবর দিয়েছিলেন তাঁর রেডিও সেটের মাধ্যমে তিনি কিছু টেলিমেট্রো সংবাদ পেতেন, যার মারফৎ তাঁকে বলা হত তাঁর অনুসন্ধানের কোন ল্যাবরেটরির কিছু তথ্য অন্যত্র পাঠাতে বার্তা বাহক সেখানে নিজের পরিচয় গোপন রাখতেন তাঁকে কিছু প্রশ্ন করা হলেও তিনি নিরুত্তর থাকতেন। এই রকম ঘটনা প্রায় মাস খানেক ঘটে যাওয়ার পর, প্রফেসর রঙ্গাচারী একদিন অত্যন্ত রূঢ় স্বরে তাঁকে জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ে তাঁকে কিছুই জানাতে পারবেন না আর সেইদিনই তাঁর বাসায় ফেরার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনা।

পুলিশের কাছে এটি সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু এই ঘটনার পরিণতির আগে অন্য এক পরিণতির প্রস্তুতি দ্রুতলয়ে এগিয়ে আসছিল। প্রফেসর রঙ্গাচারী তাঁর কাজের মাঝে মাঝে আবার হত্যাকারীর হুমকী পেতে লাগলেন–তাঁকে এক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সীতে বলা হতে লাগল 'যদি তোমার অনুসন্ধানের পুরো খোঁজ খবর আমাদের না দাও, তা'হলে তোমাকে শেষ করে দেওয়া হবে। হত্যার চেষ্টা একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে ভেবো না এবারও ব্যর্থ হবে তোমার প্রাণের বিন্দুমাত্র ভয় থাকলে আমাদের জানিয়ে দাও তোমার গবেষণার মূল্যবান তথ্য।'

ঠিক কোন ফ্রিকোয়েন্সীতে এই হুমকী দেওয়া হয়, তা কিন্তু প্রফেসর রঙ্গাচারী বুঝতে পারেন না। দুর্ভাগ্য, সেটুকু তিনি জানতে পারলে, তার একটা সূত্র বের করার চেষ্টা তিনি অবশ্যই করতে পারতেন।

এমনই একটা দুঃশ্চিন্তায় সময়ের পরিধি যখন দীর্ঘতর হচ্ছে ঠিক তখনই এই ঘটনা একদিন নিজেরই ঘরে প্রফেসর রঙ্গাচারীকে পাওয়া গেল রক্তাক্ত অবস্থায়। চিৎকার শুনে তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর নিষ্প্রাণ শরীরটি চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গেছে।

পুলিশের কাছে খবর পৌঁছলো। অনেক বাদ প্রতিবাদ অনুসন্ধানের ঝড় উঠলো, তারপর সময়ের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জাস্টিস কুরূপের আদালতে আনা হল এই রহস্যজনক মামলা নিষ্পত্তির জন্য। সেখানেও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা হল। বাদী–প্রতিবাদী উকিলের দীর্ঘ জেরা চলল। জাস্টিস কুরূপ তার সবটাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, দেখলেন। তারপর মীমাংসার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার দিন ঘোষণা করলেন।

প্রতিবাদীর কণ্ঠস্বর অধিকাংশ লোকের কাছেই পরিচিত ছিল। তিনি আর কেউ নন, প্রফেসর রঙ্গা-চারীর স্কলার শিষ্য ডাঃ বিষ্ণু বর্ধন আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে তিনি এগিয়ে এলেন জাস্টিস কুরূপের টেবিলের সামনে। উপস্থিত সকলের কৌতুহল ভরা দৃষ্টি তখন তারই উপর নিবদ্ধ নানা রকম গুঞ্জনও শোনা যেতে লাগল তাঁকে ঘিরে কিন্তু সে মুহূর্ত কাল মাত্র জাস্টিস কুরূপের সতর্কতায় আবার ঠিক একই রকম স্তব্ধতা নেমে এলো আদালতের মধ্যে ডাঃ বর্ধন প্রথামত সত্য কথা বলার শপথ নিলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

জাস্টিস কুরূপও তাঁর নিজস্ব ঢঙে শুরু করলেন, 'ডাঃ বর্ধন, আপনি জানেন, আপনার এই প্রতিবাদের কি শাস্তি হতে পারে। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, যে এটি আদালত, আপনার ঘর নয় ?'

'ইয়েস মে লর্ড, আমি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। এবং আমি জানি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে এই প্রতিবাদ অমূলক নয়।'

'কোন যুক্তিতে আপনি বললেন, এই রায় এক তরফা ?'

'মে লর্ড, প্রফেসর রঙ্গাচারীর যখন মৃত্যুই হয়নি, তখন তাঁর সম্পর্কিত মামলা বা শাস্তি বিধান কেন ?'

জাস্টিস কুরূপ অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন, 'কি সব উল্টো পাল্টা বকছেন ? আপনার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হচ্ছি যে, অযথা আপনি আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন।'

'না, মে লর্ড, আপনি অন্তত এ রকম কথা বলতে পারেন না।'

'তবে কি ভাবে আপনি বলছেন যে প্রফেসর রঙ্গাচারীর মৃত্যু হয় নি।'

'কারণ তিনি বেঁচে আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তাঁর শারীরিক উপস্থিতি এখন এই আদালতেই–' ডাঃ বর্ধনের কথা শেষ হবার আগেই প্রফেসর রঙ্গাচারীর হঠাৎ উপস্থিতি চারদিকে একটা চাপা ভয় আর রোমাঞ্চ মিশ্রিত জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করল। জাস্টিস কুরূপের দৃষ্টিতেও এক অদ্ভুত অনুভূতি–তিনি তাঁর দুচোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না বিছানার উপর লুটিয়ে থাকা রঙ্গাচারীর রক্তাক্ত শবদেহ, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, তারপর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া আর চিতার আগুনে একটু একটু করে জ্বলে ছাই হয়ে যাওয়া তার দেহের শেষ অংশটুকু এর সবটাই কি মিথ্যে ছিল তবে ?

জাস্টিস কুরূপের মত বিচারকও জীবনে এই প্রথম হার স্বীকার করলেন যেন, তাঁর তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না ভাবতে লাগলেন, 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি' তিনি আরও একবার ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন প্রফেসর রঙ্গাচারীকে তারপর ডাঃ বর্ধনকে অত্যন্ত সংযতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হলে প্রফেসর রঙ্গাচারীকে ঘিরে এই সমস্ত ঘটনা, পুলিশ আর আদালতের বিগত দিনগুলি ধরে বাদ প্রতিবাদ সবটাই মিথ্যে, না এটা একটা সুপরিকল্পিত নাটক ?'

'মে লর্ড, বিগত যা কিছু তার সবটাই যেমন সত্যি ছিল, বর্তমানের এই ঘটনাও ঠিক ততটাই সত্যি। শুধুমাত্র এর মাঝখানের কয়েকটি তথ্য আপনার জ্ঞাতার্থে আজ এখানে আমি বলবো, তা'হলেই এই রহস্যের আমূল সমাধান হয়ে যাবে।'

'তবে শুনুন, এই তথ্য সাধারণ মানুষের অবোধ্য হলেও––মাননীয় আদালত যদি নিজস্ব ভাবনাকে একটু বিশ্লেষণমুখী করে নিতে পারেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, এই ভৌতিক বিশ্বের একটা প্রতিরূপ আছে, যাকে আমরা প্রতিবিশ্ব বা এন্টি ইউনিভার্স বলতে পারি। কেউ কেউ বা একে সমান্তরাল বিশ্ব বা প্যারালাল ইউনিভার্সও বলে থাকেন। এবং এই বিশ্বে আপনি, আমি এবং আর সমস্ত প্রাণী যাঁরা বর্তমান আছেন, তাদের প্রত্যেকেরই এক একটা প্রতিরূপও বর্তমান আছে। যাকে বলা যায়–এ্যান্টি ম্যান।

আর যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে স্বীকার করে নিতে হয় প্রফেসর রঙ্গাচারীরও এমনই একটা প্রতিরূপকে

হ্যাঁ, মে লর্ড, আপনি ঠিক ধরেছেন। এখানে হত্যাটা প্রফেসর রঙ্গাচারীর হয় নি, হয়েছিল তাঁর এ্যান্টি ম্যানের। এর সত্যতা আর কেউ না জানুক প্রফেসর রঙ্গাচারী অবশ্যই জানবেন। কারণ প্রসঙ্গটা তাঁর এবং এটুকু পরিষ্কার যে এ পর্যন্ত যিনি মৃত বলে ঘোষিত–তিনি এই মুহূর্তে আপনাদের সকলের সামনে সশরীরে উপস্থিত।

তাহলে, মে লর্ড এই ঘটনা থেকে অবশ্যই সিদ্ধ হয় যে হত্যাকারী প্রকৃত রঙ্গাচারীর পরিবর্তে হত্যা করেন তাঁর প্রতিরূপকেই।'

জাস্টিস কুরূপ এবার তাঁকে হাতের ইশারায় থামতে বলে, গম্ভীর গলায় একটা আকস্মিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'ডাঃ বর্ধন, আপনি তো কয়েকদিন আগেই ইংলন্ড গিয়েছিলেন তাই না ?'

যতিতে আদালতের চেহারাটাই গেল পাল্টে। কোথায় সেই ডাঃ বর্ধন, আর কোথায় তাঁর উচ্চস্বরে প্রতিবাদী বয়ান। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই মানুষটা মুহূর্তেই অদৃশ্য। হতবাক আদালতের উপস্থিত সভ্যগণেরা। কিন্তু জাস্টিস কুরূপ এখন আর অবাক হলেন না, শুধু এক কৌতূহলে লণ্ডনের ঠিকানায় ডাঃ বর্ধনের কাছে আর্জেন্ট কল বুক করলেন একটা।

তারপর ঠিক যেমনটি ভেবেছিলেন তিনি, সুদূর লণ্ডন থেকে ডাঃ বর্ধনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। এখন তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। তবুও তার মাঝখানে প্রফেসর রঙ্গাচারীর হত্যা মামলার খোঁজও নিলেন

এরপর জাস্টিস কুরূপ তাঁর রায় পুনর্বিবেচনা করে অভ্যাশী দেবীকে মুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু এই মামলাকে ঘিরে নানা রকম অদ্ভুত জিজ্ঞাসার হাত থেকে তিনি আর মুক্তি পেলেন না।

প্রফেসর রঙ্গাচারী তাঁর নিজস্ব বয়ানে বলেছিলেন, তাঁর স্কলার শিষ্য ডাঃ বর্ধনই তাঁকে এই দুর্ঘটনার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর উপযুক্ত জায়গায় আত্মগোপন করে থাকা এবং আদালতে তাঁর এই আত্মপ্রকাশ সবটাই ডাঃ বর্ধনের পরামর্শে।

জাস্টিস কুরূপের প্রশ্নের জবাবেও তিনি জানিয়ে-ছিলেন, আদালত থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আগন্তুক আসলে ডাঃ বর্ধনেরই প্রতিরূপ

শুকদেব প্রামাণ

বিকলাঙ্গ শিশুদের হোমে স্বার্থপর দৈত্য

বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি সেবাশ্রমগুলিতে স্বার্থপরতার কালো হাত ঢুকে পড়ে কিভাবে সেবাব্রতকে কলুষিত করছে তারই নেপথ্যপটে আলোকপাত।

গড়িয়ার প্রফুল্ল রঞ্জন গাঙ্গুলির ছেলে তিলক মানসিক প্রতিবন্ধী, বয়স ২৭, কলকাতার অলকেন্দু বোধ নিকেতনের এডুকেবল সেকশনের আবাসিক ছাত্র। সেই সঙ্গে ভোকেশনালে শিক্ষানবীশ

মানসিক প্রতিবন্ধী পম্পা শর্মা, বয়স ৭ বছর ৯ মাস, স্বর্গত যজ্ঞহরিবাবুর মেয়ে, মা লক্ষ্মীরানী বাড়ি বর্ধমান, অলকেন্দু বোধ নিকেতনের লোয়ার নার্সারির আবাসিক ছাত্রী।

অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ডে-কেয়ার ছাত্রী তৃপ্তিকা বিশ্বাস, বয়স ১৯, উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জি রোডের সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের মেয়ে, মানসিক প্রতিবন্ধী

কালীচরণ ঘোষ রোডের গোপালচন্দ্র দাসের ছেলে জয় বয়স ৮, মানসিক প্রতিবন্ধী, অলকেন্দু বোধ নিকেতনের লোয়ার নার্সারি-বি-র ডে-কেয়ার ছাত্র।

এমনি প্রায় ৮০-৯০টি মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়ে কাঁকুড়গাছির 'অলকেন্দু বোধ নিকেতন রেসিডেন্সিয়াল' এর হলঘরে, পাশের ছোট্ট মাঠে, ক্যান্টিনের আনাচে কানাচে আপন মনে খেলছে, গাইছে, নিথর বসে আছে কেউবা। আর তাদের নিয়ে ব্যস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা অনাবিল আনন্দে মেতে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঘটিতি আলাপ হল অ্যাডাল্ট এডুকেশনের শিক্ষিকা নূরজাহান চৌধুরির সঙ্গে। অদ্ভুত ব্যস্ত চঞ্চল মহিলা। সঙ্গীত শিক্ষক দ্বিদিব রায় চৌধুরি তখন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পাশের

অলকেন্দু বোধ নিকেতন রেসিডেন্সিয়াল

জনান্তিকে। মিসেস চৌধুরি মারফত পরিচয় হল তাঁর সঙ্গে। সেই সুযোগে ছিদিববাবুও প্রত্যক্ষ করালেন এই সব মানসিক প্রতিবন্ধীদের কাছে সঙ্গীত কতটা আকর্ষণীয় স্পষ্টতই সে এক অন্য জগত জন্য পরিবেশ। অসহায় ছেলেমেয়েদের মাঝে যেন উচ্চারিত হচ্ছে "...ডিয়ার লর্ড, হেলপ মি টু স্প্রেড দাই ফ্রাগর্যান্স এভরিহোয়্যার আই গো। ফ্লাড মাই সোল উইথ দাই স্পিরিট অ্যান্ড লাইফ... ।"

যার যাত্রা শুরু ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৭। তৎকালীন রাজ্যপাল ত্রিভুবন নারায়ণ সিং, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বার উদ্ঘাটন হয়। তারপর প্রায় ১৩ বছর ধরে এর কাজের পরিধিও বেড়েছে ক্রমশ। কলকাতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অন্যত্রও। মুর্শিদাবাদের কান্দির জেমো গ্রামে রয়েছে এর শাখা প্রতিষ্ঠান। ৫০ জন মানসিক প্রতিবন্ধীর থাকার ব্যবস্থা আছে ওখানে দার্জিলিং-এর সোনাদাতেও এর আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেখানে থাকার সুযোগ রয়েছে ৩০ জন মানসিক প্রতিবন্ধীর জেমোতে ১০০ জনেরও বেশি বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের থাকার মত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে। ত্রিপুরায় এর শাখা বিস্তারের জন্য কথাবার্তা চলছে ওখানকার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে। এছাড়াও কলকাতায়ও জেমোর অনুরূপ বয়স্ক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন অলকেন্দু বোধ নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ বিমলেন্দু নারায়ণ রায়

ডঃ রায় মুর্শিদাবাদের জেমোর রাজ পরিবারের ছেলে সেবা পরায়ণ এই ৭৩ বছর বয়েসি মানুষটি সেদিন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে এক দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সময়টা ১৯৫৪ সাল। সে সময় তিনি ইংলণ্ডে। কাজ করতেন প্রতিবন্ধীদের ওপর কাজ করতে করতে প্রতিবন্ধীদের অসহায় জীবনযাত্রা তাঁর অন্তর কাঁদায়। বলাবাহুল্য এই দুর্বলতার শুরু তাঁর পারিবারিক জীবন থেকেই, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাঁর ছেলে অলকেন্দু। বিদেশে অসহায় প্রতিবন্ধীদের শুশ্রূষায় নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করার পর ভারতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখলেন তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়

কথার ফাঁকে তিনি বলে নিলেন, 'ভারতবর্ষে তো বটেই জাপান বাদে এশিয়াতেও এই ধরনের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান অলকেন্দু বোধ নিকেতন। যা গড়ে তুলতে গিয়ে প্রতিনিয়ত এক ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করেছি। হয়তো তা অবাস্তব ঠেকবে। তবু যা সত্য সে কথাই বলছি। জানি না আনন্দময়ী মা, ওঁকার নাথ, সাঁইবাবা, স্বামী অভেদানন্দ, মাদার টেরেসা'র মত মানুষদের অনুপ্রেরণা না পেলে এ কাজে কতটা সফল হতাম।'

কিন্তু শুধু প্রতিষ্ঠান গড়লে হবে না। মানসিক প্রতিবন্ধীদের সেবা, শিক্ষাদান সব কিছুই অন্যরকম। এর জন্য ট্রেনিং-এর প্রয়োজন ডঃ রায় কয়েক মাসের জন্য ছুটলেন ইউরোপ প্রশিক্ষণ নিয়ে কলকাতায় তাঁর অলকেন্দু বোধ নিকেতনে ১৯৭৮-এ একটি 'প্রফেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স' চালু করলেন তাঁকে সাহায্য করলেন ইউরোপ থেকে আসা মিস ফ্রিশার। মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক হাতে কলমে তৈরি করলেন তিনি তাঁরা কাজও পেলেন অলকেন্দু বোধ নিকেতনে কেউ আবার ওখান থেকে বেরিয়ে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। ফলে কলকাতা ও তার আশেপাশে প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠল ক্রমশ বর্তমানে অলকেন্দু বোধ নিকেতন সহ ১৮টি এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে যেমন, কলকাতার কীড স্ট্রিটে 'দ্য ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইড', যোধপুর পার্কে 'আশুতোষ ইনস্টিটিউশন' ও 'রীচ', মানিকতলায় 'বোধী পীঠ', ট্যাংরা রোডে 'এফ এম আর ইণ্ডিয়া আশা নিকেতন', ডঃ বীরেশ গুহ স্ট্রিটে 'দ্য ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ', প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে 'মনোবিকাশ কেন্দ্র', সদানন্দ রোডে 'সাইকোক্যাব', তারাতলায় 'স্প্যাসটিক সোসাইটি অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া', সাউথ সিঁথি রোডে 'বিকাশন', ভবানীপুরে 'কেয়ার অ্যাণ্ড কাউন্সেলিং সেন্টার', সল্টলেকে 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান ওয়েলফেয়ার' ও 'প্রবর্তক সঙ্ঘ হোম ফর মেন্টালি রিটার্ডেড চিলড্রেন', হাওড়ার রামরাজাতলায় 'আর. বি. ইনস্টিটিউট ফর মেন্টালি রিটার্ডেড চিলড্রেন রিসার্চ অ্যাণ্ড চাইল্ড গাইডেন্স সেন্টার', হুগলীতে 'বোধোদয়', হুগলীর চন্দননগরে 'প্রবর্তক ইনস্টিটিউট, ও বার্নপুরে 'চেসিরে হোম সেন্টার'।

অলকেন্দু বোধ নিকেতনের প্রাণপুরুষ ডাঃ বিমলেন্দু নারায়ণ রায়

ভারতেও এই রকম প্রতিষ্ঠান এখন ৩৪৪টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে কর্ণাটকে প্রায় ৬৫ টি কেরালায় ৫৬টি, মহারাষ্ট্রে ৫১টি, তামিলনাড়ুতে ৩৯টি, গুজরাটে ২৬টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৬টি, বিহারে ২১টি বহু প্রতিষ্ঠানের আবার রয়েছে শাখা প্রতিষ্ঠান। এইভাবে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবন্ধী সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি আজ প্রায় ৪ লক্ষ অসহায় প্রতিবন্ধী এইসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গের বিভাগীয় মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণে জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে ১২.৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী, যা এ রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার ২ শতাংশ বামফ্রন্ট সরকার তাই প্রতিবন্ধীদের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকারি কার্যালয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ২ শতাংশ সংরক্ষণও করা হয়েছে। যাতে তারা সরাসরি নিয়োগের সুযোগ পেতে পারে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুটি ধারায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথমত ইনস্টিটিউশন্যাল, দ্বিতীয়ত নন ইনস্টিটিউশনাল। ইনস্টিটিউশনাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক ধারায় সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল চালু করেছেন। যেমন-কুচবিহারের ব্লাইণ্ড স্কুল, রানীগঞ্জ ও পশ্চিম-দিনাজপুরে মূক ও বধির স্কুল। এ ছাড়াও এদের সেবা শুশ্রূষার জন্য গ্রামে গড়ে রয়েছে প্রায় ১১১০টি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার। ব্লক পর্যায়েও রয়েছে ৪৪৫টি কেন্দ্র।

মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার জন্য ১৯৮৯-৯০ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১৪টি 'কম্পোজিট ক্যাম্প ও ১২টি 'ফলো আপ ক্যাম্প' চালু করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে বিকাশভারতী ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি, আর্টিফিশিয়াল ল্যাম্ব ম্যানুফেকচারিং কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হিয়ারিং হ্যাণ্ডিকেপড্ ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অর্থোপেডিক্যাল হ্যাণ্ডিকেপড্ যার ফলে '৮৯-৯০-এর মধ্যে ১২৬৭ জন প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছে। ১৯১৩ জন প্রতিবন্ধী পড়াশুনার জন্য প্রতি মাসে স্কলারশিপ পাচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিও রাজ্য সরকারের অনুদান পাচ্ছে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

নন ইনস্টিটিউশন্যাল কেয়ার পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবন্ধীদের নকল অঙ্গ কেনার কিংবা তৈরি করার খরচপত্রও দিচ্ছে এছাড়া ক্লাস নাইনের উর্দ্ধে প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসে ৬০ টাকা ও অনুর্দ্ধ ক্লাস নাইনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও ২০ টাকা টি এ বাবদ এবং অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা স্কলারশিপ হিসেবে প্রতি মাসে দেওয়ার স্কিম নিয়েছেন। প্রতিবন্ধীদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারেও বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে রয়েছে সরকারি কার্যালয়ে তাদের ২ শতাংশ সংরক্ষণ। বিশ্বনাথবাবুর কথায়, 'কেন্দ্রিয় সরকারকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি যাতে এই সংরক্ষণ ২ থেকে

৩ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।'

বামফ্রন্ট সরকারের তৎপরতায় প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন ন্যাশনাল ও স্টেট অ্যাওয়ার্ড স্কিম চালু হয়েছে বলে জানান বিভাগীয় মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। বাস, ট্রাম, ট্রেনে রয়েছে আসন সংরক্ষণ চালু হয়েছে প্রতিবন্ধীদের জন্য 'পরিচয় পত্র' প্রথা এমন কি কোন সুস্থ নারী কিংবা পুরুষ যদি কোন প্রতিবন্ধী পুরুষ কিংবা নারীকে বিয়ে করে তাদের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ দফতর ৫ হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

এই সবের লক্ষ্যে বিশ্বনাথবাবু যে সরকারি তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ-খাতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মানসিক প্রতিবন্ধী ৫০টি ছেলে ও ৫০টি মেয়ের জন্য খরচ ৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা, মূক ও বধির ২৫টি ছেলে ও ২৫টি মেয়ের জন্য ৬৩.৪৪ লক্ষ টাকা, মেদিনীপুরের তাঁতিগড়িয়া ভ্যাগরেন্ট হোমে ৫০টি প্রতিবন্ধী ছেলের জন্য ২০.২৮ লক্ষ টাকা এবং শিলিগুড়ির শেলটার ওয়ার্কশপ এর জন্য ২০.৩২ লক্ষ টাকা। মোট খরচ ২০৩.৭৮ লক্ষ টাকা

যদিও পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য তারা প্রয়োজনমত সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ফলে প্রতিনিয়ত আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কোনরকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি রূপায়ণে বিঘ্ন হচ্ছে। ঠিক মত দেখভাল করা যাচ্ছে না ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে পথে পথে। কীড স্ট্রিটের 'দ্য ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মায়া মিত্রর কথায়, 'এই ইনস্টিটিউশনের জন্য আমাদের বাৎসরিক খরচ ২৫-৩০ হাজার টাকা। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার '৮৯ তে দিয়েছিলেন ৮ হাজার টাকা '৯০ তে তাও কমিয়ে করলেন মাত্র ৬ হাজার টাকা আর্থিক সঙ্কটের জন্য শেষ পর্যন্ত স্কুল গাড়িটি বন্ধ করে দিতে হয়। এই অবস্থায় আমরা আর কতদূর লড়তে পারি?' একই সঙ্কটের শিকার 'আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল শ্রীলেখা ব্যানার্জি, 'বোধীপীঠে'র মি. টি কে বাসু, 'চেসীরে হোমস ইন্ডিয়া'র মি. এস রায়-চৌধুরী, 'দ্য ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ'এর মিসেস এস চৌধুরী, 'মনোবিকাশ কেন্দ্রে'র মিসেস (ডা.) সারলা ফতেপুরিয়া, 'সাইকো ল্যাবে'র মি. এল বিমল, 'বিকাশন'এর সোমনাথ মুন্সি, 'বোধোদয়ে'র নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী, 'কেয়ার অ্যান্ড কাউন্সেলিং সেন্টার'এর বাসন্তী রায়, "স্নীচে'র পুরবী বোস।

সল্টলেক 'প্রবর্তক সঙ্ঘ হোম ফর মেন্টালি রিটার্ডেড চিল্ড্রেন'এর প্রিন্সিপাল অশোক চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায় আর্থিক সঙ্কট সল্টলেকের এই ইনস্টিটিউশনটি গড়ে ওঠে গত ১২ আগস্ট '৮৬ তে। সেই থেকে ৭৮ জন মানসিক প্রতিবন্ধী এখানে আবাসিক হিসেবেই আছে। তাদের খাওয়া দাওয়া, শিক্ষাদান ইত্যাদির জন্য চাই বিশাল টাকা। কিন্তু সেই সামর্থ্য আমাদের কোথায়! রাজ্য সরকার দেন তা আর কতটুকু। এরপর আমরা ডোনেশনের জন্য সারা বছরই ছোটাছুটি করি এই ভাবেই চলতে হচ্ছে আমাদের।' মাদার টেরেসার আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত 'এক এম আর ইন্ডিয়া আশা নিকেতনে'র ডিরেক্টর মার্ক মেরেকও বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। এবং সেই সমস্যাগুলির প্রধান যে আর্থিক সঙ্কট তা আর বলার অপেক্ষায় থাকে না তবে স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে মোটামুটি ইনস্টিটিউশনটি চালিয়ে আসতে পারছেন এই মা

বলাবাহুল্য এ রাজ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান কাঁকুড়গাছির 'অলকেন্দু বোধ নিকেতন রেসিডেন্সিয়াল' গত ৮ ডিসেম্বর '৯০ এই প্রতিষ্ঠান পালন করে আন্তর্জাতিক দিবস। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এদিন বিশ্বখ্যাত মানসিক প্রতিবন্ধীসেবী ফাদার থমাস ফেলিক্সের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'রামকমল সিনহা মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল' ফাদার থমাস ফেলিক্স ত্রিবান্দ্রমের 'সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অন মেন্টাল রিটার্ডেশন'এর ডিরেক্টর। ফাদার ফেলিক্সও সেই অনুষ্ঠানে মানবিকতার খাতিরে অসহায় প্রতিবন্ধীদের সাহায্যে সরকারের আরও সক্রিয় হওয়ার কথা তোলেন।

প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ড. বিমলেন্দু নারায়ণ রায় এক সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের ব্যয়বহুল দিকটি তুলে ধরেন। সেই হিসেব অনুযায়ী কলকাতায় অলকেন্দু বোধ নিকেতনটি গড়ে তুলতে খরচ হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা, দার্জিলিং-এর সোনাদার প্রতিষ্ঠানটির জন্য ৩০-৪০ হাজার, কান্দির জেমোর প্রতিষ্ঠানটির জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বার্ষিক খরচও বিরাট। কলকাতায় খরচ বছরে সাড়ে চার লক্ষ টাকা, সোনাদায় ২½-৩ লক্ষ টাকা, কান্দির জেমোতে প্রায় ২ লক্ষ টাকা অথচ এই তিনটি জায়গায় বিশাল খরচ বাবদ কেন্দ্রিয় সরকারের বার্ষিক অনুদান মেলে ৩ লক্ষ টাকার মত রাজ্য সরকার থেকে কোন অনুদান তাঁরা নেন না। 'কারণ বছরে যেখানে ৮-৯ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে-রাজ্য সরকারের ২০-২৫ হাজার টাকা নিয়েই বা কি হবে!' ডঃ রায়ের এই ক্ষোভ স্পষ্টতই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে একটা চ্যালেঞ্জ তা বলাই বাহুল্য।

যদিও বিনয় চৌধুরী, অসীম দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী, কিরণময় নন্দ, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মণ্ডল, শান্তি ঘটক, প্রশান্ত শূর, সুভাষ চক্রবর্তী, কান্তি বিশ্বাস, অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সেনগুপ্ত, সৈয়দ ওয়াহেদ রেজা প্রমুখ রাজ্যের মন্ত্রীরা অলকেন্দু বোধ নিকে-

প্রতিবন্ধী ভাইবোনেদের সঙ্গীতানুষ্ঠান

সমাজকল্যাণমন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

দ্য ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডস–এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মায়া মিত্র

তনের কাজকর্মের প্রতি ভূয়সী প্রশংসা জানিয়ে তার উন্নতি কামনা করেছেন এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ রায়কে দেওয়া রাজ্যপাল নুরুল হাসানের চিঠিতেও দেখা গেছে, '...নাথিং সিমস্ টু বি মোর হিউম্যান দ্যান এক্সটেন্ডিং আ হিলিং টাচ টু দা রিটার্ডেড ইন অর্ডার টু হেল্প দেম ওভার কাম ডিবিলিটি অ্যান্ড এনাবেল দেম টু জয়েন দ্য মেইন স্ট্রিম অব দ্য সোসাইটি। আই অ্যাম হ্যাপি দ্যাট দ্য অলকেন্দু বোধ নিকেতন রেসিডেন্সিয়াল হ্যাজ ডেডিকেটেড ইটসেল্ফ টু দিস নোবল কজ... ।'

আশ্চর্যের ব্যাপার রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের ভুরি ভুরি প্রশংসা সত্ত্বেও অলকেন্দু বোধ নিকেতন আজ এক 'নির্লজ্জ রাজনৈতিক চক্রান্তে'র শিকার সে কথা চাপা পড়ে না প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে যদিও সে ব্যাপারে মুখ খুলতে কেউই রাজী নন কর্তৃপক্ষের ওয়াকিবহাল মহলের কথায়, প্রায় দশ বছর ধরে চলে আসছে অলকেন্দু বোধ নিকেতনকে নিয়ে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন। যার একদিকে রয়েছেন বামফ্রন্টের আর এস পি নেতা ও পূর্তমন্ত্রী যতীশ রায় আর অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ বিমলেন্দু নারায়ণ রায়।

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৭৯–এর ডিসেম্বর থেকে এর আগে বিডন স্ট্রিটে ডঃ রায় সরকারি অনুদানে অনারারি সেক্রেটারি হিসেবে চালাতেন 'সোসাইটি ফর চাইল্ড হেল্থ অ্যান্ড কমিউনিটি ওয়েল ফেয়ার' নামে একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যার জন্য এক সময় প্রায় ৬০ হাজার বস্তির ছেলেমেয়েরা উপকৃত হত। কিন্তু '৭৬–এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি তদন্তে ধরা পড়ে প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মী দুর্নীতিমূলক কাজে তৎপর হয়ে উঠেছে। সরকারি টাকা নয় ছয়, মিথ্যা কেস দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ, জাল সার্টিফিকেট ইত্যাদি দুর্নীতির কারণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার ইউনিটটি বন্ধ করে দেয়। ডঃ রায় তখন বিদেশে। মাস কয়েক পর কলকাতায় ফিরলে সোসাইটির কর্মীরা ডঃ রায়কে ইউনিটটি চালু করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ইউনিটের কর্মীদের অনুরোধে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজাকে বলে কয়ে পুনরায় তা চালু করালেন ডঃ রায়। কিন্তু এরপরও ওই সব কর্মীদের দুর্নীতি বন্ধ হল না ফলে দুর্নীতির অভিযোগ এনে '৭৯ তে রাজ্য সরকার আবার তদন্ত করল এবং তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ইউনিটটিও বন্ধ হয়ে গেল ডাঃ রায়ও আর কোন পদক্ষেপ নিতে চাইলেন না

আর সঙ্গে সঙ্গেই 'সরকারি রিপোর্টে চিহ্নিত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মীদের নিয়ে আর এস পি র ব্যানারে ইউনিয়ান গড়লেন তৎকালীন এম এল এ ও বর্তমানে রাজ্য সরকারের পূর্তমন্ত্রী যতীশ রায়। তারপর যতীশ রায়ের নেতৃত্বে সেই '৭৯ থেকে চলে আসছে অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ওপর নানা রকম আক্রমণ এমন কি তাঁরা স্থায়ী কাজের দাবীতে আদালতে মামলাও ঠুকেছেন।' ডাঃ রায়ের এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় অলকেন্দু বোধ নিকেতনের প্রতিটি কর্মীর কথায়।

শুধু ইউনিয়ন গড়ে, মামলা করেও থেমে থাকেন নি যতীশ রায় তাঁর ইউনিয়নের সেক্রেটারি শক্তি ত্রিবেদী সহ দেবব্রত সিন্‌হা, রমাপ্রসাদ দাস, মোহন মুখার্জি, শ্রীপতি দাস, মুলান খাঁ, অঞ্জলী ব্যানার্জি, রমা গাঙ্গুলি, রানু সরকার, হীরালাল ঘোষ, চিন্ময়ী পুরী রা নানান সময়ে অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ওপর চড়াও হয়েছেন প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের খাবার ও ওষুধপত্র নিয়ে তছনছ, অফিসে ঢুকে মারধোর, জরুরী ফাইলপত্র ছেঁড়া, চেয়ার টেবিল ছোঁড়া, এমন কি প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মীদের ওপরও হাত দিতে বাকী রাখে নি বলে প্রতিষ্ঠানের কয়েক জন কর্মী অভিযোগ করেছেন মাস কয়েক আগে ওদেরই আক্রমণে নিগৃহীত হন অলকেন্দু বোধ নিকেতনের অ্যাডাল্ট এডুকেশনের শিক্ষিকা নুরজাহান চৌধুরী স্বয়ং ডঃ রায়ের ওপরও এমন শারীরিক আক্রমণ চলেছে বেশ কয়েকবার তার ওপর রয়েছে অকথ্য গালাগাল। এম এল এ থাকাকালীন দলবল নিয়ে স্বয়ং যতীশ রায়ও চড়াও হয়েছেন অলকেন্দু বোধ নিকেতনের ওপর। ডঃ রায় বললেন, 'এই চক্রান্ত এখানেই থেমে থাকে নি, যতীশ রায় দিল্লিতেও নানান মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেন। পরে অবশ্য কেন্দ্রিয় সরকারের পর্যবেক্ষক দল সরজমিন তদন্ত চালিয়ে যতীশ রায়ের অভিযোগ যে মিথ্যা তার প্রমাণ পেয়েছেন। এবং আর্থিক অনুদানও দিচ্ছেন।'

এ ব্যাপারে অবশ্য মন্ত্রী যতীশ রায়ের কোন বক্তব্য মেলে নি। বেশ কয়েক বার রাইটার্সে তার দপ্তরে গিয়েও কোন কাজ হয় নি। মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক বিষয়টির গুরুত্ব বুঝলেও পরে তা এড়িয়ে যান।

বস্তুত এই সব টানাপোড়েনের মাঝখানে অসহায় বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কি? কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধী মূলত মানসিক প্রতিবন্ধীদের সামনে এ রাজ্যের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি যে আশার আলো জ্বেলে ছিল তা কি এই সব সমস্যার অন্তরালে নিভে যাবে? অবহেলা ও অসহায় জীবনযাপন থেকে যে সব প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের নিয়ে রাজনীতি, দুর্নীতি কি কোন মানবিক দৃষ্টান্ত হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি প্রতিবন্ধীদের স্বার্থে যে সব স্কিমের কথা বলেছেন তা কতটা প্রকৃত কাজে লাগছে তাও দেখার বিষয় কারণ প্রকৃত জায়গায় না পৌঁছে তা যদি ডায়া-মিডিয়ায় স্তরে আটকে পড়ে তাতে সরকারের সদিচ্ছা কার্যকরী হবে কি করে!

তাপস মহাপাত্র

ছবি কাজী রাব্বুল মোহিত

যম জামাই ভাগ্না
তিন নয় আপনা।

বাঙালির প্রচলিত এই প্রবাদটি অন্য কোন ক্ষেত্রে কতটা সত্যি তা জানি না কিন্তু বাংলার ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এখন এই প্রবাদটি একেবারেই সত্য নয় কারণ বাংলার জামাই ক্রিকেটাররা বাংলা ক্রিকেটের মর্যাদাকে সর্বভারতীয় এবং আন্তরাজ্য ক্রিকেটের ময়দানে রক্ষা করে চলেছেন কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতা দিয়ে। বাংলার বাইরে থেকে অবাঙালি ক্রিকেটাররা অনেকেই কর্মসূত্রে এসে বাংলার ক্রিকেট শিবিরে যোগ দিয়েছেন বাংলার ক্রিকেটের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। আর এই আন্তরিকতার জন্য করে তাঁরা বাংলায় স্থায়ী এবং সম্মানজনক সম্পর্কে ধরাও দিয়েছেন, হয়েছেন বাংলার জামাই। ফলে তাঁদের ক্রিকেট পারফরমেন্সের সঙ্গে এই মধুর সম্পর্কটি থাকায় বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে তাঁরা তৈরি করে নিতে পেরেছেন বিশেষ মর্যাদার আসন

জামাই ক্রিকেটার, জামাই ক্যাপটেন

বাংলার ক্রিকেট উদ্যানে সাফল্যের সঙ্গে যে জামাইরা ক্রীড়াশিল্পের ফুল ফুটিয়ে চলেছেন তাঁদের অন্তরঙ্গ কাহিনী

অরুণ এবং রীণা লাল

সেই অরুণলাল যিনি প্রায় ১৩ বছর আগে টি বোর্ডের চাকরি সূত্রে আসেন এই বাংলা তথা কলকাতায়। তখন তিনি দিল্লির রনজি দলের সদস্য কিন্তু সি এ বি–র নিয়ম তাঁর ক্রিকেট প্রেম ও চাকরির মধ্যে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাঁকে কলকাতায় ক্লাব–ক্রিকেট খেলতে দেওয়া হয় নি কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দিল্লি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন অরুণ যখন বাংলার হয়ে রনজি খেলতে শুরু করেন তখন বাংলা প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট দল। তাঁর মনে হল, এই দলটাকে একটা চ্যাম্পিয়ন দলে পরিণত করতে হবে দলটার সব কিছুই আছে, যেটা নেই তা হল আত্মবিশ্বাস। সেদিন অরুণের মনে প্রশ্ন জেগেছিল বাংলা দল হারার আগে হারে কেন? লোকে তাঁর কথায় শুধু হেসেছিল। অরুণ কিন্তু তাঁর ধারণায় স্থির ছিলেন। তিনি জানতেন তিনি পারবেন। পারলেনও বাংলার এই জামাই ক্রিকেটার বাংলাকে ৫১ বছর পর রনজি চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ইডেনে সেদিন হাজার হাজার হাত তাঁকে স্পর্শ করতে চেয়েছে। তিনি ছুঁয়ে গেছেন লক্ষ লক্ষ বাঙালির মন। গেঁথে গেছেন ক্রিকেট প্রেমীদের মনে আর রেকর্ড বুকে তার ছোট্ট কিন্তু বিরাট অর্থবহ নামটি নিয়ে। সেদিন ইডেনের দর্শকরা তাঁকে আবিরের রঙে লাল করে দিয়ে বলেছিল, বাংলা লাল অরুণলাল। তারপর নানারকম সাক্ষাৎকার, সংবর্ধনা পুরস্কার ইত্যাদি। এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিন

বয়স ৩৩। স্ত্রী রীণা বাঙালি কন্যা। ভালবেসে বিয়ে করেছেন। সুন্দর এক স্বপ্নের জগতের মধ্যে ভেসে চলেছেন অরুণ তাঁর স্ত্রী রীণা, সঙ্গে বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা ও তাঁর বন্ধুবান্ধব। অরুণের কথায়, 'ওরা যেভাবে আমাকে দিনের পর দিন উৎসাহ যুগিয়ে আসছে তা ভারতবর্ষের কোন ক্রিকেটার পায় নি আমি জীবনে যে সমস্ত নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার মধ্যে এই বাংলা তথা কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে আসাটা অন্যতম। গোটা বাংলাই আমার অনুপ্রেরণা। উপেক্ষিত হওয়ার পরের মুহূর্তে ওরাই আমাকে আবার খেলার মাঠে ফিরিয়ে আনে।'

৫০ বছর পর দুবার রনজি ফাইনালে ওঠা এবং একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া জাতীয় ক্রিকেটের আসরে বাংলাকে কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছিল বাংলার এই জামাই ক্রিকেটার গত বছর উইলস ট্রফিতে এবং সদ্য সমাপ্ত ইরানি ট্রফিতে রনজি চ্যাম্পিয়নদের হতাশাজনক পারফরমেন্স বাংলার ক্রিকেটকে আবার কয়েক কদম পিছিয়ে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু নাক খত দেওয়ার অবস্থা থেকে বাংলাকে অকল্পনীয় ভাবে উদ্ধার করেছিলেন অরুণলাল। রনজি ট্রফিটা যে প্রধানত ওঁর জন্যই, এই বাংলা দলে তিনি যে একাই পঁচাত্তর, বাকিরা কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঁচিশ–এটা সারা বাংলা স্বীকার করে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ঘূর্ণি উইকেটে অরুণ ৪২৬ বলে ২৫টি ৪'ও ১টি ৬ মেরে অপরাজিত ১১৪ রানের যে ইনিংস খেলেছিলেন তা আজ পর্যন্ত সম্প্রতি মধ্যে ওঁর সেরা খেলা। ইডেনে বোম্বাই–এর বিরুদ্ধে এর চেয়ে বেশি চাপ ছিল অরুণের উপর কিন্তু উইকেট এত খারাপ ছিল না বোলিংও তেমন আশাপ্রদ নয়। সারাদিন উইকেটে বল পড়ে চকিতে ঘুরছে, কোনটা লাফাল আর গড়াল। কিন্তু বিপক্ষ দল সেদিন অরুণের উইকেটটি ফেলবার জন্য উইকেটের উপর শুয়ে পড়তেও প্রস্তুত ছিলেন। তিন বছর আগে আরও খারাপ পিচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুনীল গাভাসকারের ৯৬ রানের পর বাংলার ক্রিকেটের 'লিটল মাস্টার'–এর এই গৌরবময় ইনিংসে একই মাঠে গাভাসকারের উপরে সেদিন বর্ষিত হয় গোলাপ পাপড়ি জামাই ক্রিকেটার অরুণের জন্য ফুল ছিল না, ছিল গ্যালারি থেকে মুহুর্মুহু 'অরুণলাল জিন্দাবাদ' ধ্বনি। গতবারে বাংলার রনজি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা তুলতেই অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠল অরুণের চোখ মুখ বললেন, 'আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সেদিন বাস্তবে ধরা দিয়েছিল। সেই দিনটার সঙ্গে তুলনা হয় না কোন কিছুরই।' একটুও না ভেবে সেদিন তিনি রনজি ট্রফি জয়ের মুহূর্তটিকে উৎসর্গ করেছিলেন স্ত্রী রীণা আর কলকাতাকে। বাংলায় প্রথম আসার সময় থেকেই এই মুহূর্তটার জন্য অরুণ স্বপ্ন দেখতেন। দলে থাকুন বা না–থাকুন গত কয়েক বছর ধরেই তাঁকে কখনই উপেক্ষা করা যায় নি। সম্প্রতি ইরানি ট্রফিতে প্রথম ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অনবদ্য ব্যাটিং–এ বাংলার সম্মান বাঁচানোর সেঞ্চুরিটি করে অরুণ জানিয়ে দিয়েছেন গত বছরের ফর্ম এখনও ধরে রেখেছেন তিনি।

ম্যাচের শেষে অটোগ্রাফ শিকারীদের ভিড়ে সেদিনের নায়ক অরুণলালের প্রায় চাপা পড়ার অবস্থা। ডান হাতে সই দিতে দিতে এবং অন্য হাত দর্শকদের উদ্দেশ্যে নাড়তে নাড়তে অরুণ

এক নজরে বাংলার অরুণলাল

	ম্যাচ	ইনিংস	অপরাজিত	রান	গড়	সর্বোচ্চ	শতরান	অর্ধশতরান	ক্যাচ	বল	রান	উইকেট	গড়	সেরা বোলিং
ইরানি ট্রফি	৬	১০	১	৪১০	৪৫.৫৫	১৬৪	১	৫	১০	১০	৩৯	০	-	-
রনজি ট্রফি	৬৪	৯৩	৯	৪৭২১	৫৬.২০	২৮৭	১৬	২৯	৫৬	৮৯৬	৪৬১	১৫	৩০.৭৩	৪-৭১
দিলীপ ট্রফি	১৫	২২	১	১৫৫৫	৭৪.০৫	২৮৭	৭	৩	১৭	২৯০	১৪৪	২	৭২.০০	১-৯৫
দেওধর ট্রফি	১৬	১৫	৯	৪৩৭	২৯.১৩	৭৬	০	৩	৫	১২৩	১২০	০	-	-
উইলস ট্রফি	১৬	১৬	২	৫৬৮	৪০.৫৭	৭৬	০	৬	৭	২৩৭	১৮৮	৬	৩১.৩৩	২-৩৯

বলেছিলেন, 'গতকাল রাতে রীপার টেলিফোন পাওয়ার পর বড় ইনিংস খেলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম ইনিংসে ওইরকম বিরাট রানে পিছিয়ে পড়ায় দারুণ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম নিজেও বড় রান না পাওয়ায় দুঃখ হচ্ছিল। সেই সময় শ্ব্যমার স্ত্রীর ফোনই আমাকে চাঙ্গা করে তোলে। রীপা বলেছিল, ওদের দুজন ব্যাটসম্যান যেখানে দুশোর বেশি রান করেছে সেক্ষেত্রে আমার ৬৮ রানে আউট হওয়াটা বেমানান। ইজ্জত কা সওয়াল হ্যায়। উত্তরে আমিও বলেছিলাম, দ্বিতীয় ইনিংসে চেষ্টা করব নট আউট থাকার এবং তারচেয়েও বড় কথা বাংলাকে ইনিংসের হাত থেকে বাঁচানোর আমি খুশি। কারণ রীপাকে দেওয়া দুটি কথাই সেদিন রাখতে পেরেছিলাম।' বাংলার অধিনায়ক প্রণব রায় স্বভাবতই সেদিন তাঁর টিমের সেরা ক্রিকেটারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অরুণ, শুধু অরুণের জন্যই সেদিন বাংলা কিছুটা সম্মান নিয়ে ফিরতে পেরেছিল।

কথাবার্তায় যথেষ্ট আশাবাদী চাতপুরম রাজন ভেঙ্কটরামন। রাজা ভেঙ্কট নামেই ক্রিকেট জগতে পরিচিত। জন্মসূত্রে কেরেলিয়ান কিন্তু বাংলার মাটিতে তিনি বড় হয়েছেন। স্কুল কলেজ লাইফ কেটেছে এই বাংলায়। সেই সময় থেকেই ক্রিকেটের প্রতি রাজার আসক্তি মিলন সমিতির হয়ে ১৯৭৪ সালে ব্যাট নিয়ে মাঠে নামেন। তারপর থেকে তিনি ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। সাফল্যও পেয়েছেন বাংলার হয়ে প্রথম খেলেন আশির দশকের গোড়ায়। ১৯৮১ সালে প্রথম বড় ম্যাচ খেলেন বিহারের বিরুদ্ধে। বাঁ-হাতি এই ব্যাটসম্যান সেদিন কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যাট করে বাংলাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। সি এ বি কর্মকর্তাদের সেদিন তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন রাজা। সেই ম্যাচটিকে রাজা তাঁর জীবনে স্মরণীয় ম্যাচ বলে আজও মনে করেন বাংলাকে সম্মানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস সর্বদাই তিনি অনুভব করেন। শুধু অনুভব করেন না, মাঠে নেমে ব্যাটে বলে তিনি দেখিয়েও দেন কতটা লড়াই করতে পারেন। বাংলার হয়ে খেলতে নেমে তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৭০। রঞ্জিতে বাংলা দলের দুবার ফাইনালে ওঠা ও একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে রাজার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বাংলা দলে যার অধিনায়ক হওয়ার কথা সেই রাজা সি এ বি কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্বের শিকারও হয়েছেন। তবু বাংলার ক্রিকেটকে তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছেন। তিন থেকে ছ'নম্বরে তিনি ব্যাট করতে আসেন নিজের ফর্ম সম্পর্কে রাজা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী অবিচারের শিকার হয়েও কিভাবে দিনের পর দিন নিজের ধারাবাহিক পারফরমেন্স বজায় রাখা সম্ভব তা দেখিয়েছেন বাংলার এই অবাঙালি জামাই ক্রিকেটার একটা সাধারণ মানের বাংলা দলকে যে সম্মান জামাই ক্রিকেটাররা এনে দিয়েছেন তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন

৩৩-এ লেক এভেনিউ এর বাড়িতে থাকেন রাজা, সঙ্গে স্ত্রী লক্ষ্মী ভেঙ্কটরামন। '৮৮ সালে বিয়ে করেছেন নিজে ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকায়

রাজা ভেঙ্কট — অশোক মালহোত্রা

স্ত্রীই ঘরের সমস্ত কাজ দেখাশোনা করেন 'আমার ভালো খেলার উৎসাহদাত্রী অবশ্যই লক্ষ্মী, তার সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি মনোবল ফিরে পাই' বললেন রাজা ভেঙ্কট। ইরানি ট্রফিতে নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেও সামান্য অভিমান যেন মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। স্পেশালিস্ট ও যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান হয়েও এবারে প্রথম একাদশ থেকে রাজা বাদ পড়েছেন অথচ রঞ্জিতে বাংলার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রে রাজার দুর্দান্ত ব্যাটিং আর অনবদ্য ফিল্ডিং অন্যান্য ক্রিকেটারদের যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছিল। সেদিনের মাঠে রাজা ভেঙ্কটের অসাধারণ ক্যাচটি ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট-এ পৌঁছে দিয়েছিল সুতরাং বাংলাদলে এই জামাই ক্রিকেটার যে নিজের ফর্ম ও পারফরমেন্সে যথেষ্ট পরিণত, ঘরোয়া তথা বাংলা ক্রিকেটে তার রানের বহর দেখে বোঝা যায়।

ব্যাটে বলে হলেই ছক্কা নয়তো জিজ্ঞাসা চিহ্ন এই রকম একটা ইমেজ নিয়ে মাঠে নামেন অশোক মালহোত্রা, ক্রিকেটে হাতে খড়ি হরিয়ানায়, হরিয়ানার হয়েই খেলেছেন। কিন্তু বাংলার ক্রিকেটে এক অদৃশ্য মোহ তাঁকে স্পর্শ করেছে গোপনে তাই তিনি ছুটে এসেছেন এই বাংলার ক্রিকেট শিবিরে। বাংলার ক্রিকেটকে দুর্দশা-মুক্ত করার বাসনায় তিনি অবিচল। বাংলার রঞ্জি-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে যে কজন অবাঙালি ব্যাটসম্যান নিজেদের সমস্ত যোগ্যতা উজাড় করে লড়েছেন অশোক মালহোত্রা তাঁদের অন্যতম। ফর্ম আর পারফরমেন্সের ব্যাপারে অশোক যথেষ্ট সচেতন কোন বিতর্কের মধ্যমণি না হয়েও বাংলা ক্রিকেটের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি এমন কি বহুবার বাংলাদলের ক্যাপ্টেনশিপ-এর বিষয়ে তাঁর নাম উঠেছে তাঁর কথায়-বাংলা ক্রিকেট প্রেমীদের উৎসাহ এবং বাঙালি স্ত্রী শীশিতার সহযোগিতা তাঁকে এই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। কর্মসূত্রে সস্ত্রীক থাকেন দিল্লিতে। তাঁর মন পড়ে থাকে এই বাংলা তথা কলকাতায়। সাময়িক হলেও কলকাতায় এসে থাকেন রিজেন্ট এস্টেটে, শ্বশুরমশাই এর ফ্ল্যাটে, নয়তো মোহনবাগান মেসে। তবে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসার চেষ্টা করছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলা ক্রিকেট শিবিরে অবাঙালি জামাই ক্রিকেটাররা এসে বাংলার ক্রিকেটের মান অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন বাংলার ক্রিকেট আজ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত তার পেছনে এঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে বাংলা ক্রিকেটাররা আজ ম্যাচ শুরুর আগে হেরে বসেন না যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। এখনকার এই টিমের প্রধান প্লাস পয়েন্ট হল টিম এফোর্ট। সম্মিলিত দলশক্তি এই জিনিসটা বাংলার ক্রিকেটে আগে ছিল না তারপর আরেকটা ব্যাপার ফাইটিং স্পিরিট, লড়াকু মানসিকতা ও অটুট মনোবল ফিল্ডিং-এর গুরুত্ব যে কতখানি তা আগে কেউ বুঝতে চাইত না দিলীপ দোশিই প্রথম অধিনায়ক যিনি দলের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেছেন সেই থেকেই বাংলা ক্রিকেট এগিয়ে চলেছে জামাই ক্রিকেটারদের কাঁধে ভর করে তাই বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীরা, সেদিন রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ান বাংলা দলের অবাঙালি ক্রিকেটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন- আপনারা সত্যি জামাই আদর পাওয়ার যোগ্য।

অমিতবিক্রম রানা

ছবি তাপস কুমার দেব

দেশ-বিদেশের হালফিল

হালহকিকৎ নিয়ে কার্টুনিস্টরা কিভাবে ভাবেন এবং ছকেন, আলোকপাত-এর নির্বাচনে
তেমন কিছু ব্যঙ্গচিত্র পাঠক সাধারণের জ্ঞাতব্যে
পরিবেশিত হল

হায়রে বালিকা বর্ষ!
····বৎসরান্তে বাপের তো
একটাই কেরামতি ··কথায়
বলে মেয়ে হলো ভগবানের
দান- -শত অবহেলাতেও
তার মরণ হয় না।

২৮ ডিসেম্বর শুক্রবার। নতুন দিল্লির ১৪ নং অশোক রোডের বাংলোয় সি পি এম সাংসদ হান্নান মোল্লা ও সৈফুদ্দিন চৌধুরীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বৈঠকে বসলেন ভি পি-ঘনিষ্ঠ দুই জাতপাতবাদী নেতা রামবিলাস পাশোয়ান এবং শরদ যাদবের সঙ্গে। উদ্দেশ্য সি পি এম–জনতা দলের বহুঘোষিত সমন্বয় কমিটির আত্মসমর্পণ আসলে ভি পি সিং মন্ত্রিসভা পতনের পর ভি পি চেয়েছিলেন সংসদে বামপন্থীদের নিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক ব্লক তৈরি করে তার সংসদীয় নেতা হতে। এরকম প্রস্তাব নিয়ে জ্যোতি বসুর কাছে এসেছিলেন ভি পির দূত অরুণ নেহরু। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিক জ্যোতিবাবু তাতে সাড়া দেননি অবশ্য এই সাড়া না দেওয়ার পিছনে সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জি ও সৈফুদ্দিন চৌধুরীরা ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, যেহেতু চন্দ্রশেখর সরকারকে কংগ্রেস সমর্থন করছে সেহেতু রাজীব গান্ধী সংসদে আর বিরোধী দলনেতা থাকতে পারবে না কিন্তু তখন ব্লক গড়লে তার সংসদীয় নেতা থাকার সুবাদে ভি পি-ই বিরোধী দলনেতা হয়ে যাবে। সেরকম ক্ষেত্রে একই ব্লকে থাকার দরুন সি পি এম সংসদে বেশি পরিমাণে বক্তব্য রাখার সুযোগ হারাবে এছাড়া ব্লক গড়লে ভি পি সিং এর ব্যর্থতার দায়ও সি পি এমকে বইতে হবে। কাজেই জ্যোতিবাবু পত্রপাঠ অরুণ নেহরুর প্রস্তাব খারিজ করলেন। সেই সঙ্গে ভি পি সিং এর হাত ধরে হিন্দি বলয়ে প্রভাব বাড়াতে কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব মারফৎ প্রস্তাব দিলেন বামপন্থী এবং জনতা দলের মধ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গড়তে যাতে তারা বিভিন্ন সমমনোভাবাপন্ন ইস্যুতে একই মঞ্চ থেকে, লড়াই ও প্রচার অভিযান চালাতে পারে। সেইমত ২৯ ডিসেম্বর সি পি এমের পলিটব্যুরো বৈঠকের পর রাষ্ট্রীয় মোর্চা ও বামপন্থীরা মিলে সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটি গড়লেন কমিটিতে রাখা হল জনতা দলের ভি পি সিং, জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ, এস আর বোম্মাই, ডি এম কে'র করুণানিধি, তেলেগু দেশমের রামা রাও, সি পি এমের হরকিষেণ সিং সুরজিৎ, সি পি আই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, ফরোয়ার্ড ব্লকের চিত্ত বসু এবং আর·এস·পির ত্রিদিব চৌধুরী কে. আর এই সমন্বয় কমিটিকে ঘিরেই প্রশ্ন তুললেন বিক্ষুব্ধ সি পি এমের ১৬টি গোষ্ঠীর

সি পি এমের রাজনৈতিক রুটবদল : ভি পি সিংকে ব্যাক করে সি পি এম ফেঁসে গেছে ?

ভিপি-ঘনিষ্ঠতা কিসের আশায়?

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পরামর্শে সি পি আই (এম) তার ৩০ বছর ধরে চালু রাজনৈতিক রুট বদল করতে শুরু করেছে জনতা দল নেতা ভি পি সিং-এর সঙ্গে সমন্বয় কমিটি গড়তে গিয়ে। দুই আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ ও তেলেগু দেশম এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খণ্ডী যারা আবার সম্প্রতি দেওঘরের শিবমন্দির মুক্ত করার সাম্প্রদায়িক ডাক দিয়েছে তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ও জাতপাতভিত্তিক রাজনীতিকে আশ্রয় করে এবার সি পি এম কতটা রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে পারবে? ভি পি সিং-এর প্রকাশ্য সংখ্যালঘু তোষণ এবং বি জে পির সঙ্গে গোপন সমঝোতার দ্বিমুখী ইমেজ সি পি এমকে কি পরিমাণ বিপন্ন করবে? যে আশায় সি পি এম, ভি পি-কে মদত করছে তা কতটুকু সফল হবে? রাজনৈতিক সুবিধাবাদের কবলে আত্মসমর্পণ করতে গিয়ে সি পি এম কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠছে। এই রাজনৈতিক রুটবদল কি সি পি এমের স্বঘোষিত 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' পরিপন্থী? পশ্চিমবঙ্গে, কেরালায়, ত্রিপুরায়, অসমে এবং হিন্দি বলয়ে সি পি এমের রাজনৈতিক রুট এমন পরস্পর বিরোধী কেন?—একটি তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণী প্রতিবেদন।

সবচেয়ে পরিচিত নেতা অনিমেষ মজুমদার বললেন, 'ক্ষমতালোভী গোষ্ঠী সিপিএম কে নিজেদের ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চোরা বালিতে আটকে ফেলেছে, তাই তেলেগু দেশম ও ডি এম কে–র মত আঞ্চলিকতাবাদী দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে গাঁটছড়া বাঁধল। যে রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে সি পি এম নেতারা সমন্বয় কমিটি গড়লেন তাতে ঝাড়খণ্ডী এবং অসম গণপরিষদের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রাদেশিকতাবাদীরা সামিল আর এই সি পি এম নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, প্রাদেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে। দেখবেন, আদর্শবাদকে ছেড়ে সুবিধাবাদের দিকে এই যে রাজনৈতিক রুটবদল ভবিষ্যতে সিপিএমের পক্ষে তা হবে আত্মঘাতী পদক্ষেপ।'

ভি পি'র নেতৃত্ব সি পি এম মানল কিসের আশায়?: জোনা জৈলে ভি পি সিং এর নাটকীয় পঞ্জাব সফরের সময় থেকে সি পি এমের পলিটব্যুরো সদস্য হরকিষণ সিং সুরজিৎ মান্ডার রাজার ঘনিষ্ঠ জন হয়ে উঠেছেন। যদিও এই সুরজিৎ–ই রাজীব জমানায় রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পার্টি লাইনে সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকায় ছিলেন ভিপির পঞ্জাব সফরে কংগ্রেস–বিরোধী শিখ সমাজের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন সিপিএম নেতৃত্বকে তার রাজনৈতিক রুট পরিবর্তনে বেনা প্রভাব ফেলে। সি পি এম তখনই বুঝেছিল ব্যক্তি ইমেজের রাজনীতি নির্ভর ভারতে কিছু করতে গেলে এমন কোন ন্যাশনাল লিডারকে ধরতে হবে যিনি সর্বভারতীয় ইমেজ বহন করেন সেটা এক নম্বরে ধরেন রাজীব গান্ধী কিন্তু সি পি এমের নিজের বেস যে তিনটি রাজ্যে সেই কেরল, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে রাজীব গান্ধীর দলই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ—তাই রাজীব গান্ধীর কাছাকাছি গিয়ে সিপিএমের কোন লাভই হবে না। দ্বিতীয় ইমেজটি মণ্ডল কমিশন ও বোফর্স কামানের কল্যাণে এখন রাজা মান্ডার তাই সিপিএম কেন্দ্রিয় কমিটির ধারণা, মান্ডার রাজা সাহেবের সঙ্গে থেকে সি পি এম তিনভাবে লাভবান হতে পারবে, (১) মণ্ডল রিপোর্টের সুবাদে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক অনগ্রসর উপজাতি হরিজন ভোট ভাঙা যাবে (২) ভি পি সিং এর হাত ধরে সাংগঠনিক দুর্বলতা পেরিয়ে হিন্দি বলয়ে প্রভাব বাড়ানো হবে (৩) অন্তর্দলীয় কোন্দলাকীর্ণ জনতাদলের মধ্যে সংগঠনহীন ভি পি সিংকে সাংগঠনিক শক্তি যুগিয়ে তাঁকে বাড়িয়ে তুলে সি পি এম–নির্ভরতার ফায়দা তোলা যাবে।

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে কেরলে সি পি এম ভয়ানকভাবে রাজনৈতিক মার খেয়েছে সে মারের ক্ষতিপূরণ করতে ভি পি সিং-এর মণ্ডল ট্রাম্প কার্ডের উপর সি পি এমকে এখন ভরসা করতেই হবে। নতুবা সেখানে সরকারি ক্ষমতায় থেকে কিছু না করার কারণে নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দেবে। তাই পলিটব্যুরোর ২৯ তারিখের মিটিং-এ স্বয়ং সম্পাদক নামবুদিরিপাদ ও পলিটব্যুরো সদস্য ই নায়নার কট্টর রাজীব–চন্দ্র বিরোধী লাইন নিলেন এবং ভি পির সঙ্গে সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব রাখলেন। ত্রিপুরার নৃপেন চক্রবর্তী বা দশরথ দেবের কংগ্রেস বিরোধী লাইন না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ত্রিপুরায় তাদের প্রতিপক্ষ কংগ্রেস–উপজাতি যুব সমিতি জোট একসময় নৃপেনবাবুর আব্দার রাখতে ভি পি সিং প্রধানমন্ত্রীত্ব কালিয়ে সরজমিন তদন্ত রিপোর্ট দিতে যশোবন্ত সিনহার নেতৃত্বে দলীয় প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ছিলেন। কাজেই একবাক্যে 'নায়নার-নামবুদিরিপাদ প্রস্তাব' সমর্থন করল ত্রিপুরা ইউনিট। ফলত জয় সূচিত হল হরকিষণ সিং সুরজিতের। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবু আবার ভি পি সিং-এর পরামর্শদাতা বলে খ্যাত। তিনি কিন্তু খানিক গাঁইগুঁই করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন কট্টর রাজীব-বিরোধী লাইন নেওয়া হোক, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে এখনই কোমর বেঁধে নেমে পড়ায় নয়, তাতে অন্তত এখনই কোন কেন্দ্রিয় আক্রমণের মুখে পড়তে হবে না পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকারকে। কিন্তু রাজ্য সি পি এমের তরুণ নেতৃত্ব বিমান বসু, বুদ্ধদেব

ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাসরা এতে একেবারেই নারাজ ভি পি সিং-এর রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে সমন্বয় কমিটি গড়তে একমাত্র বাধা এসেছিল অসমের নন্দেশ্বর তালুকদারের কাছ থেকে তিনি চাইছিলেন না, অসমীয়া উগ্রজাতিবাদের প্রতিভূ রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদের সঙ্গে এভাবে প্রকাশ্যে হাত মিলিয়ে অসম রাজনীতিতে নিজেদের সর্বনাশ করতে এখানে মুশকিল আসান করলেন জ্যোতি বসু তিনি ভি পি সিংকে বললেন, এখনই রাষ্ট্রীয় মোর্চার দুই শরীক অ গ প বা ঝাড়খণ্ডীদের প্রতিনিধিকে সমন্বয় কমিটিতে না রাখলেও চলে কারণ সি পি এম সর্বদাই ওই দুই দলের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও প্রাদেশিকতাবাদের প্রশ্রয়ের অভিযোগ করে এসেছে। তাই ওদের সঙ্গে এখনই একসারিতে বসা সি পি এমের পক্ষে সম্ভব নয় বরং গত নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে যেরকম গোপন সমঝোতা হয়েছিল এবার ওদের সঙ্গেও সেরকম কিছু করা যেতে পারে। তাতে নির্বাচনী সুবিধাও পাওয়া যাবে। অথচ স্ববিরোধিতার মধ্যে পড়তে হবে না। কিন্তু জ্যোতিবাবু পার্টির 'তাত্ত্বিক মুখরক্ষা'

জ্যোতিবসু দেবীলালের সঙ্গে। পাশে অসীম দাশগুপ্ত

করার সময় এটা খেয়াল করলেন না যে, অ গ প এবং ঝাড়খণ্ডীদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে অভিযোগ তা রাষ্ট্রীয় মোর্চার অপর দুই শরীক ডি এম কে এবং তেলেগু দেশমের মধ্যে বিদ্যমান। আর দুই শরীকই তাঁদের সমন্বয় কমিটির সদস্য

আসলে খেয়াল করার ব্যাপার নয়, জ্যোতিবাবুরা বেশ ভালভাবেই জানেন বিহার ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে একইসঙ্গে কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ঝাড়খণ্ডী দলগুলিকে ভোটসংগী চাই আবার অন্ধ্রপ্রদেশে দুচারটে লোকসভা আসন দখল করতে গেলে তেলেগু দেশমকে না হলে চলবে না। তেমনিভাবে তামিলনাড়ুতেও আসন পেতে হলে চাই ডি এম কে'র সমর্থন তাই রাজনৈতিক সুবিধা আদায়

সি পি এম-এর সম্মেলনে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব

কেরলে সি পি এমের ভোটপন্থী ধর্মীয় লাইন

কে... -এর মার্কসবাদী 'লেফট ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট'র (এল ডি এফ) বড় তরফ সি পি এম মনে করছে অবস্থা এখন সন্তোষজনক জাতীয় রাজনীতিতে প্রো-মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ভি পি সিং-এর জাতিবাদী মণ্ডল কার্ড বিক্রি করে এখানকার ই কে নায়নার ই এম এস নামবুদিরিপাদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা তাঁদের পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন

গত মাসে দিল্লিতে এল ডি এফ-এর একটি অগণতান্ত্রিক কাণ্ড-এর কথা জানা যায়। কেন্দ্রে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সুযোগে কেরলের জেলা কাউন্সিলের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হয়। কারণ গত লোকসভা নির্বাচনে সি পি এম নেতৃত্বাধীন এল ডি এফ, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ-এর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়। কেরলের মুসলিম ও খৃস্টান প্রধান ভোটাররা সি পি এম-এর দিক থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচনে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল এখন ক্যাপিটালিস্ট-দের কাছে চিন্তার বিষয় একটাই যে এখানকার প্রো– ভি পি সিং প্রভাব রাজ্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতখানি কার্যকর হবে ভি পি সিং-এর এবং অবশিষ্ট ন্যাশনাল ফ্রন্ট এখন মার্কসবাদী নেতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে.

ভি পি সিং এর সরকার ভেঙে যাবার আগে কেরল–এ পরিদর্শনের সময় সি পি এম তাঁর সঙ্গে যৌথ জনসভায় অসম্মতি প্রকাশ করেছিল কারণ তখন তিনি সদ্য সদ্য মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তারপর মার্কসবাদী নেতারা দেখলেন যে হিন্দু ওয়েভের সাম্প্রদায়িক ভূত এ রাজ্যের ঘাড়ে চেপে বসছে। তাঁরা তখন মণ্ডল কমিশনের স্বপক্ষে ভি পি সিং-এর হয়ে চিৎকার করতে শুরু করেন কিন্তু ভি পি সিং যখন তাঁর প্রিয়পাত্র হিসাবে সি পি এমকে একমাত্র আশা ভরসা বলে মনে করতে শুরু করেন, সি পি এম তখন স রক্ষণের স্লোগান দিয়ে বাড়তি নির্বাচনী সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করতে থাকে '২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে আগামী নির্বাচনে ১৭টি আসন পাব' বলে ১০ই ডিসেম্বর ভি পি সিং আবার কেরল-এ এলে মার্কসবাদী নেতারা তাঁকে এবার লালকার্পেট বিছিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং যৌথ জনসভায় যোগ দিয়ে ভি পি-র নেতৃত্বকে স্বীকার করে নেন এভাবেই শুরু হয় কেরল–সি পি এম-এর রাজনৈতিক লাইন বদলের কৌশলটি রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও ভি পি সিংকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে স্টেট গেস্ট ঘোষণা করা হয় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনও তাঁকে এই ধরনের উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয় নি, মুখ্যমন্ত্রী ই কে নায়নার থেকে শুরু করে সমস্ত নেতারাই ভি পি সিং-এর মিটিংগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। এমন কি সি পি এম-এর ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এবং সি পি আই নেতা এন ই বলরাম একাধিকবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলে ভি পি সিং, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে মার্কসবাদীদেরই সব থেকে নীতিবাদী বলে প্রশংসা করেন।

এখন মার্কসবাদী নেতারা আশা করছেন যে মুসলিমদের মধ্যে ভি পি সিং-এর নতুন জনপ্রিয়তা তাঁদের ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে। ঘটনাক্রমে বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমি ইস্যুতে চুপ করে থাকার জন্য কংগ্রেস (আই) এর উপর গোঁড়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ প্রসন্ন নয়। যদিও কেরলে মুসলিম লীগ এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে আছে এবং এখনও কট্টর সি পি এম বিরোধী অবস্থান তাদের। চন্দ্রশেখরের মন্ত্রিসভা গঠনের পর কংগ্রেস সমর্থন ঘোষণা করার আগেই লীগ সাংসদের তাঁকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে এই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। সিপিএম এখন মুসলিম লীগকে পাশে পাবার চেষ্টা করছে।

একইভাবে সি পি এম কেরালা কংগ্রেস-এর খৃস্টান নেতা পি জে জোসেফের মাধ্যমে প্রভাবশালী খৃস্টানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে কমিউনিস্টরা তাদের পার্টিকে কখনও সাম্প্রদায়িক মনভাবাপন্ন নয় বলে বারংবার ঘোষণা করেন, সেই পার্টি এখন একদিকে মুসলিম এবং অন্যদিকে খৃস্টানদের সপক্ষে টেনে আনতে চার্চ ও মসজিদের কর্তাদের কাছে নতজানু হতে চলেছে

মুসলমানদের সমর্থন পেতে ভি পি সিং-এর নাম ব্যবহার করলেও মার্কসবাদীরা খৃস্টান কমিউনিটির সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রে অন্য পন্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা বিশপদের সঙ্গে এমন কি ত্রিবান্দ্রমের বেনেডিকটমার জজোরিঅসের সঙ্গেও সরকারি সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরামর্শ করেন। এইভাবে নায়নার সরকার প্রাইভেট সেক্টরে তাদের হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল খোলার অনুমতি দেয়। কিন্তু কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী করুণাকরণ যখন ৯১টি বেসরকারি স্কুলকে অনুমোদন দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন বিরোধী নেতা নায়নার তাতে রাজি হন নি। কমিউনিস্টরা করুণাকরণকে ইউনিভার্সিটি থেকে প্রি ডিগ্রি কোর্সকে বিচ্ছিন্ন করার খৃস্ট ধর্মীয় উদ্যোগ স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়েছিলেন

সেই সময় রাজ্যের আর্থিক সংকটে মার্কসবাদীরা কিঞ্চিৎ প্রসন্নই হয়েছিল কিন্তু সম্প্রতি প্রাইভেট সেক্টরেই হাইডেল পাওয়ার প্রজেক্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পাঁচ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১৮০টি প্রজেক্টে প্রাইভেট সেক্টর তৈরি করার পরিকল্পনা কেরলে সরকারি ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে

শুধু ধর্মীয় লাইনের রাজনীতিও নয় 'পাইয়ে দেওয়া' লাইন অনুসরণ করে বিড়লা গোষ্ঠী এখন হয়তো তাদের নির্দিষ্ট জমিতে গোয়ালিয়র রেঅনস্ ফ্যাক্টরি তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকার এবং কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের সম্মতিস্বাক্ষর পেয়ে যাবেন। সি পি আই-এর রাজস্বমন্ত্রী পি পি এম শ্রীনিবাসন বিড়লার অধীনস্থ ফরেস্ট ল্যান্ডকে জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়ার নায়নারীয় সিদ্ধান্তের জন্য আক্ষেপ করেছেন। এটিও সি পি এম কথিত দীর্ঘদিনের টাটা-বিড়লা পুঁজিপতি বিরোধী রাজনীতির লাইন বদল

'কট্টর স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট দল সি পি এম কেরল রাজনীতিতে এখন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের ভূমিকা পালন করতে চাইছে। যদিও একদিকে খৃস্টান ও অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়কে 'সরকারি সুবিধা' পাইয়ে দেওয়ার নীতি অবলম্বন করে সি পি এম-এর চোরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কৌশল কেরলের মানুষ এখন ধরে ফেলেছে সর্বোপরি মণ্ডল কমিশনের রাজনীতি দিয়ে ভি পি সিং-এর আশ্রয়ে থেকে জাতপাতের যে নয়া রাজনীতি কেরলে সি পি এম শুরু করতে চলেছে তা কেরলের রাজনীতি সচেতন মানুষ মেনে নেবে না। সি পি এম-এর এই ভোটপন্থী আদর্শচ্যুতি দলের মধ্যে আবার বিপর্যয় আনবে।'— মন্তব্যটি কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির। কংগ্রেস নেতার এই মতামত কতটা সত্যিতে পর্যবসিত হবে তা এখনই জানা না গেলে বিজয় রাঘবনের মত মার্কসবাদী নেতার সি পি এম ত্যাগ এবং বিরোধী ফ্রন্টের সাহায্যে নির্বাচন লড়া কেরলের রাজনীতিতে অন্য কিছু ইঙ্গিত করে বই কি। তবে নায়নার-ভি পি-র জনসভায় লোকসমাগমের বহর দেখে ই এম এস নামবুদিরিপাদ বলেছেন, "আগামী লোকসভা নির্বাচনে কেরলের ২০টি আসনের মধ্যে আমরা ১৭টি আসন পাচ্ছিই" এখন আদর্শবাদ না সুবিধাবাদ কার জয় অপেক্ষা করছে কে জানে.

— রমাপ্রসাদ ঘোষাল

করতে বলি দেওয়া হল সি পি এমের বহুঘোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদী-বিরোধী লাইনকে।

কিন্তু ওপরের সব রাজ্যগুলিতে সি পি এমের অস্তিত্বরক্ষার জন্য দক্ষিণপন্থারতে এই রুটবদল হলেও হিন্দি বলয় এবং কেরলই তার আগামী নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সি পি এমের চাই ভি পি সিং-এর মদত। সেজন্য অবশ্য রাজনৈতিকতত্ত্বের আগমনও ঘটে গেছে এখন। সমন্বয় কমিটির পরবর্তী স্টেজ হল 'বাম-গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠন এবং তার কিছুকালের জন্য নেতা হবেন ভি পি সিং। কারণ ভি পি তো গত নির্বাচনের সময় বি জে পি কে পাশে রেখেও ঘোষণা করেছিলেন বামপন্থীরা আমার 'ন্যাচারল অ্যালাই'। সি পি এমের আশা হিন্দি বলয় থেকে যদি গোটা কুড়ি লোকসভা আসন পাওয়া যায় এবং কেরল থেকে এদিক ১০টিও পাওয়া যায় তাহলে আগামী দিনে বাকি রাজ্য মিলিয়ে তারা লোকসভায় ১০০ আসনের ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর গড়ে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোন দলই সিপিএমকে এড়িয়ে সরকার চালাতে পারবে না। সেজন্যই পলিটব্যুরোর বৈঠকের পর ২৯ তারিখ সি পি এমের কেন্দ্রিয় সম্পাদক ই·এম·এস· নাম্বুদিরিপাদ বলেন 'এবার কেরলে বামগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট অন্তত ১৭টি আসন পাবে। কারণ ভি পি সিং-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত যৌথ জনসভায় যে বিপুল জনসমর্থন দেখা গেছে তাতে এটাই প্রমাণ হয় আর বাকি সব রাজ্য মিলিয়ে সি পি আই (এম) এবার একাই ১০০টি আসন পাবে '

সি পি এম-এর পঃবঃ রাজ্য কার্যালয় আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের বৈঠকে জ্যোতিবসু, বিমান বসু, শৈলেন দাশগুপ্ত প্রমুখ

রাজ্যে রাজ্যে পার্টির মধ্যে স্ববিরোধী লাইন:

বিহারে সি পি এম দুটি আশ্চর্য লাইন নিয়েছে। একদিকে রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে আছে মণ্ডল কার্ড সফল হবার আশায়, অন্যদিকে কট্টর সি পি এম-বিরোধী মার্কসবাদী দল আই পি এফকে চাইছে বামফ্রন্টে আনতে। ৮০র দশকের বিহারে কংগ্রেস-বিরোধী যে দুটি শক্তি রাজ্য রাজনীতিতে পকেটওয়াইজ শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছে তার একটি হল আই পি এফ (ইণ্ডিয়ান পিপলস ফ্রন্ট) এবং অন্যটি হল ঝাড়খণ্ডীরা। এরাই দক্ষিণ বিহার এবং উত্তর বিহারে নির্ণায়ক শক্তি। সেজন্যই ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সি পি এম কেন্দ্রিয় কমিটির তরফ থেকে প্রকাশ করাতে এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় আই পি এফের সঙ্গে কথা বলার। কারাত সাহেব আই পি এফ কে বামফ্রন্টে যোগ দেবার প্রস্তাব রাখলেও আই পি এফ তা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে জানান আই পি এফ সম্পাদক দীপঙ্কর রায়। তিনি বলেন 'পিপলস ফ্রন্টের লড়াকু কমিউনিস্টরা একদিকে ভি পি সিং অন্যদিকে অ গ প তেলেও দেশদ্রোহের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সুবিধাবাদী লাইন কখনই মেনে নেবে না।'

অসম নিয়েই সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন তাত্ত্বিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে সি পি এম। অসমের রাজ্য কমিটি প্রাক্তন শাসকদল অসম গণ পরিষদের চূড়ান্ত বিরোধী অথচ কেন্দ্রিয় কমিটি রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে সমন্বয় কমিটি গড়ার সুবাদে মোর্চার শরীক অসম গণ পরিষদের সরাসরি বিরোধিতায় নেমে পড়তে রাজী নয় আবার রাষ্ট্রীয় মোর্চার আগামী নির্বাচনে সব রাজ্যেই যে নিয়ম অনুসরণ করবে সেটি হল 'যে রাজ্যে যে দল শক্তিশালী, মোর্চায় তাকেই সেই রাজ্যের নেতা বলে ধরে নেওয়া হবে।' সেক্ষেত্রে অ গ প অসমে নেতৃত্বের দাবীদার। আর সি পি এম যদি তার সর্বভারতীয় রাজনৈতিক লাইন (নির্বাচনী) মেনে নিয়ে অসম রাজ্য কমিটির কথা না শুনে অসমে রাষ্ট্রীয় মোর্চার সঙ্গে সমঝোতা করে তাহলে উত্তর পূর্ব ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব পড়বে বিশাল কট্টর অ গ প-বিরোধী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপজাতি ও বাঙালিরা তখন সরাসরি সি পি এম বিরোধিতায় নেমে পড়বে ফলে নির্বাচনী যুদ্ধে তার ছাপ পড়বে মারাত্মক। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের ভি পি· প্রস্তাব তিলমাত্রও কাজে লাগবে না বলে ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস।

সি পি এম পলিটব্যুরো সদস্য নৃপেন চক্রবর্তী

অসম বাদে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সি পি এম এর একমাত্র ঘাঁটি হল ত্রিপুরা পঞ্চাশের দশকে নৃপেন চক্রবর্তীর হাতে গড়া সংগঠন এখন রাজ্য কমিটির সম্পাদক দশরথ দেবের হাতে পড়ে পুরোপুরি উপজাতি নির্ভর হয়ে পড়েছে দশরথ দেব ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ গড়ে একসময় তুমুল অ উপজাতি বিরোধী জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এখন সেই বাহিনী সি পি এমের ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে। ত্রিপুরার নেতৃত্বের রাশ এখন নৃপেনবাবুর হাত থেকে নিয়ে উপজাতিনেতা দশরথ দেবের হাতে দেওয়া হয়েছে এই দশরথবাবুকে উপজাতিরা 'পাহাড়ি রাজা' আখ্যা দিয়ে থাকেন। দশরথবাবু দলীয় ক্ষমতায় এসে পার্টির শক্তি সংহত করছেন ত্রিপুরার গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে। অথচ ওনার পূর্বসূরী নৃপেন চক্রবর্তীর আমলে ত্রিপুরায় সি পি এম নির্ভর করত শহরে মধ্যবিত্তদের ওপর। দশরথবাবু রাজ্য কমিটির সম্পাদক হয়ে গ্রামের উপজাতি ক্ষেতমজুরদের মধ্যে পার্টির শক্তি সংহত করার মনোনিবেশ করলেন রাজনৈতিক বাত্যাবিক্ষুব্ধ ত্রিপুরায় নির্বাচনী সফলতার পক্ষে যা একান্ত সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু এই রাজ্যের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ উপজাতি সেজন্য প্রথম দিকে দশরথবাবুর দল এখানে মণ্ডল কার্ড খেলাতে চেয়েছিলেন। সরকারিভাবে সি পি এম ত্রিপুরায় মণ্ডল কমিশন রূপায়নের দাবীও জানিয়েছিল,

কিন্তু তাতে তেমন সাড়া মেলেনি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৩ বছর রাজ্য ক্ষমতায় থাকার ফলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ক্যারিসমায় এখন ভাটার টান এসেছে, এ রাজ্যে সি পি এমের সংগঠন বেশ মজবুত থাকলেও দলের ভোটক্যাচার এখনও পর্যন্ত জ্যোতি বসুই। সেই জ্যোতি বসুর এবং বিভিন্ন সি পি এম মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এখন প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ আনছেন জ্যোতি বসুরই বিশ বছরের কমরেড এবং বসুমন্ত্রীসভার প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। এইসৃব অভিযোগ এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দলীয় হঠকারীদের হাতে নারীনিগ্রহ, জনপ্রিয় কংগ্রেসনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে হত্যার চক্রান্ত শহরে মধ্যবিত্ত মানসে ব্যাপক ছায়া ফেলেছে। অথচ এ রাজ্যে সি পি এমের মেরুদণ্ডই হল মধ্যবিত্ত সমাজ। পার্টির কৃষক ফ্রন্টেই তো এখন ১৩ লক্ষ্য মধ্যবিত্ত। রাজ্যের ৯০ শতাংশ শাখা

সি পি আই-এর তাত্ত্বিক নেতা গোপাল ব্যানার্জী

কমিটি, লোকাল কমিটি, জেলা কমিটি এবং ফ্রন্টিয়াল অর্গানাইজেশনের নেতৃত্ব এখন মধ্যবিত্তদের হাতে। কারণ এ রাজ্যের রাজনীতিকে গত ৫টি দশক ধরে মধ্যবিত্তরাই কন্ট্রোল করেছে।

এ হেন মধ্যবিত্ত সমাজে হারানো ইমেজ পুনরুদ্ধার করতে রাজ্য সি পি এম দশটি পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে (১) বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরোধিতার ধুয়ো তুলে রাজ্যের সর্বস্ব মুসলিম গণমানসকে কংগ্রেসবিরোধী করতে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে সেসব সভায় বলা হচ্ছে যে, ভি পি সিং বাবরি মসজিদ রক্ষা করতে গিয়েই ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং এর জন্য সাধারণত দায়ী চন্দ্রশেখর হলেও আসল দোষী কংগ্রেস। সেইসঙ্গে মুসলিম মহল্লায় দলীয় জনপ্রিয়তা বাড়াতে সি পি এম নেতারা ব্যাপক শ্রীরাম-বিরোধী বক্তব্য রেখে যাচ্ছে। প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলছেন রামের অস্তিত্ব নিয়ে এর ফলে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা কট্টর রামানুরাগী নয় সেহেতু তাদের এই প্রচারে বিরূপ না হবার সম্ভাবনা একদিকে যেমন বেশি, তেমনি অন্যদিকে এর ফলে কট্টর মৌলবাদী মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে প্রিয় হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। (২) কেন্দ্রে বন্ধু সরকার ১১ মাস থাকার ফলে সি পি এম এ রাজ্যে তাদের চিরাচরিত লাইন 'কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন' শুরু করতে পারেনি। এখন পলিটব্যুরো কর্তৃক চন্দ্রশেখর-রাজীব গান্ধীকে 'দেশের শত্রু' ঘোষণা করায় রাজ্য পার্টির তীব্র কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয়ে পড়েছে। দৃশ্যতই রাজ্য কমিটির তরুণ নেতৃত্ব বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস ও শ্যামল চক্রবর্তীরা

ত্রিপুরার দুই সি পি এম নেতা, নৃপেন চক্রবর্তী এবং দশরথ দেব

ইদানিং প্রচারে নেমে পড়েছেন কেন্দ্র বিরোধিতাকে হাতে নিয়ে (৩) গত ১৩ বছরের শাসনে সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ বেকারকেও চাকরি দিতে পারেনি। সেজন্য পার্টির ভোটক্যাচার জ্যোতি বসু গোয়েঙ্কা, আম্বানি, টাটা, ডালমিয়া এবং বিড়লাদেরকে ধরে পেট্রোকেমিকেলস, কেমি-ক্যালস ডাউন স্ট্রিম, ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স প্রভৃতি ভারি শিল্প স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়ে 'কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তা আগামী দিনে আশাপ্রদ হবে' এ ধরনের বিশ্বাস জনমনে গড়ে তুলতে চাইছেন (৪) উপর্যুপরি লোডশেডিং বামফ্রন্ট সরকারকে এ রাজ্যে সবচেয়ে মলিন করেছে 'রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র' গড়বার আশা জাগিয়ে এবং কোলাঘাটে ও সাঁওতালডিতে ইউনিট বাড়িয়ে লোডশেডিং নির্ধারণে সরকার সচেষ্ট এরকম ইমেজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। (৫) রাজ্যের সি পি এম-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এখন দুভাগে বিভক্ত। একদিকে যতীন চক্রবর্তী ও বিক্ষুব্ধ সি পি এমের ১৬টি গোষ্ঠীসহ ১৩ পার্টির বামপন্থী জোট এবং অন্যদিকে কংগ্রেস। এরা ১৯৯০ সালে সি পি এমের অপশাসনের বিরুদ্ধে যথাক্রমে বাংলা বন্ধ এবং কলকাতা বন্ধ ডেকে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। তাই এই শক্তি দুটিকে কাহিল করে ফেলতে সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব দুটি পলিসি ঠিক করেছেন (ক) যেহেতু ১৩ পার্টির জোট বামভোট কেটে নেবে তাই এই জোটের সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল আই·পি·এফকে বামফ্রন্টে টেনে নিয়ে এই জোটকে দুর্বল করতে উদ্যোগ নিয়েছে সি পি এম। যদিও রাজ্য আই পি এফ তাতে রাজী হয়নি। (খ) কংগ্রেসের মধ্যে কিছু নেতাকে হাত করে কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার যে চেষ্টা সি পি এম শুরু করেছিল তা মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে নানা বিচ্ছিন্ন নেতাদের দৈনন্দিন বিবৃতি থেকে বেশ প্রতীয়মান হচ্ছে

৬) বিক্ষুব্ধ সি পি এমের ১৬টি গোষ্ঠী এখন রাজ্য সি পি এম নেতৃত্বের গলার কাঁটা। রাজ্যের ১৬টি জেলার বিভিন্ন পকেটে এরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সি পি এম-বিরোধী প্রচারাভিযানে সামিল হয়েছে এদের ঐক্যবদ্ধতা ভেঙে দিতে 'বিচ্ছিন্ন ও পুরনো সাচ্চা কমরেডদের পুনর্মূল্যায়ণ' শীর্ষক কর্মসূচীতে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করা হয়েছে জেলা কমিটির মারফৎ। (৭) কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারাই গ্রামে সংগঠন না গড়ে বিভিন্ন পদ আগলে প্রায় প্রতিদিন কাগজে বিবৃতি দিয়ে নেতৃত্ব জাহির করেন সি পি এমের কোন মাথাব্যথা নেই এদের নিয়ে। কিন্তু যে নেতাটি সি পি এম ক্যাডারদের অপকর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট গিয়ে প্রতিদিন দশবারটি প্রতিরোধ সংগঠিত করছেন সেই মমতা ব্যানার্জিকে প্রধান শত্রু চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা প্রচার, আন্দোলনে বাধাদান এবং ধামাধরা কংগ্রেসী নেতাদের দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিবৃতিদান এখন সি পি এম নেতৃত্বের দৈনন্দিন কৌশলে পরিণত হয়েছে। ৮) নির্বাচনী মেসিনারিকে আরও শক্তিশালী করতে বুথভিত্তিক কমিটি গঠন সি পি এম নবউদ্যোগে সেরে ফেলেছে। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য ভোটারলিস্টে ব্যাপক ভোটার করার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব ব্রাঞ্চে ব্রাঞ্চে সার্কুলার পাঠিয়েছে। ক্যাডাররা সেই সার্কুলারকে সফল করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে মাঠে। এখন রাজ্যের ভোটারলিস্টে ভূতুড়ে ভোটার এমন বেড়ে গেছে যে কংগ্রেসের দেওয়া নথি পেয়ে স্বয়ং নির্বাচন কমিশনার শেষণ সাহেব বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ৯) এতদিন পর্যন্ত রাজ্য পুলিশকে কব্জা করতে নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের মধ্যে 'নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি' গড়েছিল সি পি এম। এবার

তার লক্ষ্য হল আই পি এস অফিসারদেরকে কব্জায় আনা। তারজন্য পার্টির 'পছন্দের আই পি এস'দের আংকিক নিয়মে রদবদল ঘটিয়ে পোস্টিং করা শুরু হয়েছে। যাঁরা পেটোয়া হতে রাজী হননি তাদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হচ্ছে যেমন শিলিগুড়ির জনপ্রিয় সুপার নজরুল ইসলামকে বদলী করে এনে ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোয় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০) রাজ্য প্রশাসনকে কব্জা করতে আই এ এস অফিসারদের ভাগ্যেও আই পি এস অফিসারদের মত 'বদলি দাওয়াই' প্রয়োগ করা হচ্ছে। রাজ্য সি পি এমকে ভোটের মুখে সফলভাবে দাঁড় করাতে উপরোক্ত দশটি কর্মসূচী ছাড়াও রাজ্য নেতৃত্ব দলের অভ্যন্তরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'অ্যাকশন প্ল্যান' চালু করেছে। আসলে '১৩ বছর সরকারি ক্ষমতায় থাকার সুবাদে "সি পি এমের কর্মীদের একাংশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ শুরু হয়েছে'- মার্কা প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর যে অভিযোগ, তা জেলায় জেলায় এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে এবং সি পি এম নেতৃত্ব এটা বুঝতে পেরেছেন মধ্যবিত্তনির্ভর পার্টিতে যদি দুর্নীতির অভিযোগ একবার শেকড় গেড়ে বসতে পারে, তাহলে একদিন তা ধ্বংসকারী মহীরুহ হয়ে উঠতে বিলম্ব করবে না। সেজন্য যা করার তা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। তাই সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব কঠোর হাতে কোমর বেঁধে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণকারী বলে পরিচিতি পেয়ে যাওয়া লোক্যাল নেতাদের মধ্যে পার্জিং আরম্ভ করেছে। 'পার্টি বৃদ্ধির সমস্যা' আখ্যা দিয়ে এভাবেই সি পি এম নেতারা বিক্ষুব্ধহীন 'দলগত সংহতি'কে বাড়িয়ে নিতে চাইছেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার অভিযান-দশদফা কর্মসূচি'-র পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল? ১৯৮৩ সালেরই ১৪ মার্চের ৩ নং পার্টি চিঠিতে বলা হল, 'সাংগঠনিক সমস্যাগুলি পার্টিবৃদ্ধির সমস্যা। এই পটভূমিতেই আমাদের কর্মধারা নির্ধারণ করতে হবে।' ওই বছরই ২ মে ৬ নং পার্টি চিঠিতে প্রত্যেক জেলার সাংগঠনিক অবস্থার আলোচনা প্রকাশ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ওই পার্টি চিঠিতে বলা হয়েছে—'আমরা একবার ১৩ দফা, আবার ১০ দফা এবং ১৪ দফা সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করেছিলাম। কিন্তু আমরা তা লাগাতার পরিচালনা করতে পারছি না কেন?'

শুদ্ধিকরণের খোয়াব· এই পার্টি বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮২ সাল থেকে সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে কেরলের সংগঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা শুরু করেছে। ১৯৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারি সি পি এম এর রাজ্য কমিটি পার্টির সদস্যদের জন্য একটি চিঠি (নং—১/১৯৮৩) প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু আত্মতুষ্টি হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সালকিয়া প্লেনামের সিদ্ধান্তগুলি পর্যালোচনা করে ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় পার্টি চিঠি নং—৫/৮০ কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয় নি ১৯৮২ সালের ১৫, ১৬ আগস্ট এবং ১৬ সেপ্টেম্বর—এই দুটি রাজ্য কমিটির অধিবেশনে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের উপস্থিতিতে ঠিক হয়—'সাংগঠনিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত পর্যালোচনা করে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলির সমাধানের নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতেই হবে এ কাজ ফেলে রাখলে খুবই গুরুতর আকার ধারণ করবে।' এরপর ১৯৮২ সালের ২৫ নভেম্বর ও ১৭ ডিসেম্বর দুটি অধিবেশনে দশ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাতে সম্পাদকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'পার্টির কর্মীরা দুর্নীতিপরায়ণ ও বুর্জোয়া প্রভাব যুক্ত হতে পারেন নি।' ১৯৮৩ সালে ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি বিনয় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ ও এম বাসবপুন্নাইয়ার উপস্থিতিতে রাজ্য কমিটির সভা বসে বাসব পুন্নাইয়া ওই সভায় দশ দফা শুদ্ধিকরণ অভিযান কিভাবে চালাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন

'মার্কসবাদের বিশুদ্ধতা রক্ষার অভিযান-দশদফা কর্মসূচি'-র পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল? ১৯৮৩ সালেরই ১৪ মার্চের ৩ নং পার্টি চিঠিতে বলা হল, 'সাংগঠনিক সমস্যাগুলি পার্টিবৃদ্ধির সমস্যা। এই পটভূমিতেই আমাদের কর্মধারা নির্ধারণ করতে হবে।' ওই বছরই ২ মে ৬ নং পার্টি চিঠিতে প্রত্যেক জেলার সাংগঠনিক অবস্থার আলোচনা প্রকাশ করা হয়। ১৯৮৭ সালের ওই পার্টি চিঠিতে বলা হয়েছে—'আমরা একবার ১৩ দফা, আবার ১০ দফা এবং ১৪ দফা সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালনা করেছিলাম কিন্তু আমরা তা লাগাতার পরিচালনা করতে পারছি না কেন?' ওই কর্মসূচির রূপায়ন সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ৩১/৮৭ নং নোটের মাধ্যমে কর্মসূচি রূপায়নে জেলা কমিটিগুলির অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হয় এরপর ১৯৮৮ সালের ৯ মার্চ সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলীর নোট নং ১২/৮৮ মারফত জেলা কমিটিগুলির কাছ থেকে লিখিত রিপোর্ট চাওয়া হয়, কিন্তু তখনও পর্যন্ত কয়েকটি জেলা থেকে লিখিত রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। যে কয়েকটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে সাংগঠনিক কাজের ধারায় অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রায় সর্বস্তরেই কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষণ আছে। এর ফলে গণ সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে দুর্বলতা আরও বেশি চোখে পড়ে। ওই পার্টি চিঠিতে 'পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পটভূমি' শিরোনামে কিছু তথ্য দিয়ে বর্তমান পার্টি ও প্রার্থী সদস্যের সংখ্যা পর্যালোচনা করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়—১৯৭৭ সাল এবং পরবর্তী সময়ে পার্টিতে আসা সদস্যের সংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশি। ওই সমস্ত পার্টি কর্মী পার্টিতে দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত। এরা এমন এক সময়ে পার্টিতে এসেছেন যখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। অতীতে গণ আন্দোলন সংগঠিত করতে পার্টিকে রাজ্য সরকারগুলির যে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা আজ একেবারেই নেই জাতীয় অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান সংকট সম্বন্ধে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি একাংশের সদস্যদের মধ্যে এখনও গড়ে ওঠে নি। একন্যই পার্টিতে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান কিছুটা থেকে গিয়েছে।

১৯৮৫ সালে একটি প্রবন্ধে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিমান বসু লিখেছেন—বেশ কিছু সুবিধাবাদী মনোভাবাপন্ন মানুষ আমাদের পার্টিতে ঢুকেছে আজকাল আদর্শের জন্য পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীর জীবনযাপন করতে অনেকে উৎসাহী হন না বলে অভিযোগ শোনা যায়। অভিযোগ সকল

ক্ষেত্রে সত্য কি মিথ্যা তা যাচাই না করেই এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে অতীতে যেভাবে পার্টির সাধারণ সভ্য ও সমর্থকদের সামনে পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে ভাবমূর্তি ও আদর্শ তুলে ধরা সম্ভব হত, বর্তমানে সকল ক্ষেত্রে তা আর সম্ভবপর হচ্ছে না এছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত পার্টির কমরেডদের গাড়ি, পরিবার বা পার্টি নেতাদের ব্যবহার করা, কমরেডদের মজা করে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি প্রসঙ্গেরও তিনি উল্লেখ করেন।

এই ধরনের নেতারা সভা মঞ্চে বলার সময়, লেখার সময় অনেক কথাই বলেন, পার্টির বর্তমান অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে যারা দল ছাড়ছেন তাঁদের বাছা বাছা মার্কসীয় পদ্ধতিতে গালাগাল দিতেও এরা পিছপা নন। কিন্তু পার্টি শুদ্ধিকরণের কাজ? ওকথা বোধহয় প্রকাশ না বলাই ভাল। কারণ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা সম্ভব নয়।

সি পি এমের নয়া রাজনৈতিক লাইন নিয়ে তাত্ত্বিক বিরোধ : বামফ্রন্টের মেজ শরীক এবং সি পি এমের আদি সংগঠন সি পি আই-এর প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক গোপাল ব্যানার্জি সম্প্রতি এক পুস্তিকা লিখে কমিউনিস্ট মহলে হইচই ফেলে দিয়েছেন। 'পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ৪০ পাতার এই পুস্তিকাটি গোপালবাবু নিজ উদ্যোগে প্রকাশ করে বলেছেন, খোলাখুলি বিতর্কসৃষ্টি করতেই তিনি এই পুস্তিকাটি লিখেছেন। ওই পুস্তিকায় তিনি 'কংগ্রেসের সঙ্গে সহমত ও সহযোগিতা'র কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে বামফ্রন্টকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এই সহযোগিতা সম্ভবপর হলে চরম দক্ষিণপন্থী দল, হঠকারী সামন্তপ্রভুত্ব ও উগ্রপন্থী শক্তির প্রভাব খর্ব করা যাবে।' গোপালবাবুর এই মতে বিজেপি, নকশালপন্থী ও জাতপাতবাদীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে সহমত ও সহযোগিতা গড়ার ডাক সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বর্তমান ভি পি পন্থী রাজনৈতিক লাইনের সরাসরি বিরোধিতা এই মতামত লিখিতভাবে জানাবার পরেও গোপালবাবু কিন্তু পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হননি। গোপালবাবু ভারতের রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে করেছেন, চরম দক্ষিণপন্থী দল বিজেপির আজকের উত্থানের জন্য দায়ী ভি পি সিং। এছাড়া জাতপাতের রাজনীতিকে উসকে দিতে ভি পি সিং এর মণ্ডল-উদ্যোগকেও তিনি অন্য চোখে দেখছেন। তাঁর মতে, এখন বামশক্তি যদি ভি পি র কবলে চলে যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে জাতপাতের আবর্তে তলিয়ে যেতে হবে। বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা গোপাল ব্যানার্জির এই মতামতের সঙ্গে প্রকাশ্যে একমত না হলেও জ্যোতি— নাম্বুদিরিপাদ— সুরজিতের ভিপিপন্থী লাইন পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় তীব্র দলীয় সমালোচনার মুখে পড়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গ জনতা দলের সভাপতি সমর গুহ এবং ত্রিপুরা জনতা দলের সভাপতি অরুণ ভৌমিক যখন নিজ নিজ রাজ্যের সি পি এম রাজ্য কমিটিকে সর্বভারতীয় স্তরে সমন্বয় কমিটির আদলে রাজ্য স্তরেও সমন্বয় কমিটি গড়ার প্রস্তাব দেন, তখন সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক শৈলেন দাশগুপ্ত এবং ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক দশরথ দেব 'রাজ্যে সমন্বয় কমিটি গড়ার মত কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, এখানে দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে এবং সাম্প্রদায়িক দানবকে মোকাবিলা করতে বামফ্রন্টই যথেষ্ট' বলে জনতা দলের প্রস্তাব বাতিল করে দেন অসমে ভি পি পন্থী সমন্বয়ের লাইন পুরো রাজ্য কমিটির তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে। সি পি এমের রাজ্য নেতারা কোন অবস্থাতেই অ গ প'র সঙ্গে যেতে রাজী নয় সি পি এমের অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদক নন্দেশ্বর তালুকদার এ প্রসঙ্গে বলেন, "রাষ্ট্রীয় মোর্চার শরীক দলগুলিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সমন্বয় কমিটি গড়া হলেও এরাজ্যে চূড়ান্ত প্রাদেশিকতাবাদী অসম গণ পরিষদের সঙ্গে মিলেমিশে চলার জন্য কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব আমাদের কোন নির্দেশ দেননি। এছাড়া গত বছরগুলিতে অ গ প সরকারের যে 'সংখ্যালঘু উপজাতি বিরোধী নীতি' আমরা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলন গড়ে তুলেছি। এ অবস্থায় অ গ পর সঙ্গে সমন্বয় কমিটি তো দূরের কথা ন্যূনতম সম্পর্ক রাখাও মুস্কিল। আমরা তো জনগণের ভরসা হারাবার রিস্ক নিতে পারি না।'

সি পি এমের কট্টর আদর্শবাদী নেতারা প্রো-ভিপি কিংবা প্রো-রাজীব কোন লাইনই মেনে নেবেন না। ৩০ নভেম্বর এসপ্লানেড ইস্টে আহূত সি পি এমের ১৬টি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রকাশ্য জমায়েতে অনিমেষ মজুমদার ও সুধীর ভট্টাচার্যরা সি পি এমের বর্তমান রাজনৈতিক লাইনের তীব্র নিন্দা করেন। অনিমেষবাবু বলেন, 'জ্যোতি বসু হরকিষণ সিং সুরজিৎরা মান্ডার রাজার কাছে এবং জাতপাতবাদী মণ্ডল-ধান্দার কাছে গোটা পার্টিটাকে বিকিয়ে দিয়েছেন। এসব ওরা করছেন শুধুমাত্র ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করার জন্য। নইলে তেলেগু দেশম ডি এম কে, অ গ প, ঝাড়খণ্ড পার্টির মত কট্টর বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে! আর এসবই সি পি এমের প্রকৃত রাজনৈতিক লাইনের পরিপন্থী। দেখুন, আজকের জমায়েত। শাসক গোষ্ঠীর ওই আপোষকামী ভোটপন্থী মনোভাবই দলে দলে আদর্শবাদী সি পি এম কর্মীদের এই বিক্ষুব্ধ প্ল্যাটফর্মে টেনে এনেছে। শাসক গোষ্ঠীর এই রাস্তা দলকে ভেঙে চুরমার করে দিতে শুরু করেছে। এখন এই দলকে ওরা পরিণত করেছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে। লেজুড়বৃত্তি করে বামপন্থী বা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়া যায় না '

ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ

তপন সিকদার

ভিপিকে ব্যাক করে কোথায় সিপিএম ফাঁসছে ?

১৯৯১ সালে প্রথম যে পথসভাটি সিপিএম দক্ষিণ কলকাতায় করে, তার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিপিএম লোক্যাল কমিটির সেক্রেটারি যে কথাটি উচ্চারণ করলেন তা জবাবদিহি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে জবাবদিহির বয়ানটি হল—"১১ মাসের বন্ধু সরকার আমাদের রাজ্য উন্নয়নে হয়তো সরাসরি কিছু দিতে পারেনি কিন্তু তারা যখন দেবার উদ্যোগ নিয়েছিল তখনই দেশের শত্রু কংগ্রেস এবং চন্দ্রশেখর সেই সরকারকে ভেঙে দিল। নতুবা হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স সবই পাওয়া হয়ে যেত।" সম্পাদক মহাশয় সর্ব-

ভারতীয় লাইন মেনে চলতে গিয়ে এটা কিন্তু বলতে পারলেন না যে, ভি পি সিং সরকারই এ রাজ্যের চালের বরাদ্দ ৩৪ হাজার মেট্রিকটন, ৮ শতাংশ কেরোসিন এবং ১০ শতাংশ রেপসিড-এর বরাদ্দ রাজ্য সরকারকে কোন কিছু না জানিয়ে আচমকা কমিয়ে দিয়েছিলেন কেন? কেনই বা বর্ধমানের হিন্দুস্থান পিংকিলটন এবং কলকাতার বেঙ্গল পটারিজ প্রথমে খুলব বলেও পরে শিল্পমন্ত্রী অজিত সিং ঘোষণা করলেন যে এত লোকসান করে এসব খোলার কোন মানে হয় না -- ভি পি সিংকে সমর্থন করতে গিয়ে এবার সিপিএম নেতৃত্বকে সাধারণ মানুষ তো বটেই ক্যাডারদের কাছেও এসবের জবাবদিহি করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জি বললেন,— 'গত লোকসভা নির্বাচনের সময় সিপিএম কলকাতা কমিটির প্রকাশ্য সমাবেশে তখনকার মেয়র কমল বসুকে দিয়ে বলিয়েছিল যে রাজীব সরকার কলকাতার জন্য প্রয়োজনীয় ১০০০ কোটি টাকা দিচ্ছে না। ভিপি সিং এর বন্ধু সরকার কায়েম হলে সে টাকা আমরা পাব এবং তা দিয়ে কলকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করে গড়ে তোলা হবে কিন্তু হায় ১১ মাসের বন্ধু সরকার ১১ পয়সা বরাদ্দ করেনি কলকাতার জন্য। বৃহত্তর কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও দুই চব্বিশ পরগণার জনজীবনকে গতিশীল করতে জলনিকাশী খাল সংস্কার, গঙ্গার পলি-উদ্ধার এবং রেল পথ বৃদ্ধিতে বাড়তি বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল বন্ধু সরকারের কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটি জনসভা করা ছাড়া আর কিছুই করেন নি ভিপি সিং তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য। ভোটের সময় সিপি এম বলেছিল, ভি পি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে কলকাতাকে তার ৩০০ বছর উদ্‌যাপনের সময় 'জাতীয় শহর' ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ৩০০ বছর পূর্তি উৎসব শেষ হয়ে গেলেও ভিপি সিং কোন ঘোষণাই করে উঠতে পারেন নি। আসলে ভিপি সিং তার ১১ মাস ব্যস্ত ছিলেন দলের কোন্দল মেটাতে। তিনি কাজ করবেন কি করে?'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি তপন শিকদারের কণ্ঠেও সিপিএমের প্রো-ভিপি লাইনের তীব্র সমালোচনা শোনা গেল,—'সিপিএম এখন ভিপি সিং খপ্পরে পড়ে ভোট কামাবার মৌলবাদী রাজনীতি শুরু করেছে। এ রাজ্যের সাম্প্রতিক জনসভাগুলি দেখুন, ওরা মৌলবাদী মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য প্রতিটি জমায়েতে রামমন্দির-বাবরি বিতর্কের রেশ টেনে বলছে 'বাবর ছিলেন এটা ঐতিহাসিক সত্য, রাম জন্মেছিলেন বলে কোন প্রামাণ্য সত্য নেই'। এভাবেই ওরা মৌলবাদী মুসলিম তোষণ করে ভিপির ভোট ভিক্ষার লাইনে হাঁটছে। ভিপি সিংকে সমর্থন করতে গিয়ে সিপিএম নিজেদেরকে অ্যান্টি-হিন্দু বলে চিহ্নিত করে ফেলেছেন তার ফল তো তাদেরকে বহন করতেই হবে রাজ্যের সিপিএম অধ্যুষিত দুজায়গায় দাঙ্গা লাগানো হল। মুসলিমদের উসকে দিতে কারসাজি করে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো শুরু হল প্রচার মাধ্যমে আর হিন্দু সমাজকে জাতপাতে ভাগ করে দেওয়ার জন্য ভিপি সিং যে মণ্ডল রিপোর্টের অস্ত্র ব্যবহার করলেন সিপিএমকেও এখন তার দায়ভার বহন করতে হবে"

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ভি পি সিং সরকার এ রাজ্যের চালের বরাদ্দ ৩৪ হাজার মেট্রিকটন, ৮ শতাংশ কেরোসিন এবং ১০ শতাংশ রেপসিড-এর বরাদ্দ রাজ্য সরকারকে কোন কিছু না জানিয়ে আচমকা কমিয়ে দিয়েছিলেন কেন? কেনই বা বর্ধমানের হিন্দুস্থান পিংকিলটন এবং কলকাতার বেঙ্গল পটারিজ প্রথমে খুলব বলেও পরে শিল্পমন্ত্রী অজিত সিং ঘোষণা করলেন যে এত লোকসান করে এসব খোলার কোন মানে হয় না –ভি পি সিংকে সমর্থন করতে গিয়ে এবার সিপিএম নেতৃত্বকে সাধারণ মানুষ তো বটেই ক্যাডারদের কাছেও এসবের জবাবদিহি করতে হবে।

বোফর্স তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে এখন এ রাজ্যে যে দলটি সরব বিস্ময়কর হলে সে কংগ্রেস। '৮৯ এর লোকসভা নির্বাচন ও তার পূর্ববর্তী সময়ে সিপিএম ক্যাডাররা ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ দেওয়াল লিখনে 'রাজীব গান্ধী বোফর্সের ঘুষ খেয়েছে'—মার্কা প্রচারে ভরে দিয়েছিল তখনকার নির্বাচনী সমাবেশে ভিপি সিং অটলবিহারী বাজপেয়ীর পাশে বসে জ্যোতি বসু ঘোষণা করেছিলেন 'কংগ্রেস বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় আনলে বোফর্স রহস্যের সুতো সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে।' - কিন্তু ১১ মাসের বন্ধু সরকার একবারের জন্য সে রহস্য খুলতে পারেননি তাই কংগ্রেসনেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী বলেন—'আগামী নির্বাচনে সিপিএমকে জবাব দিতে হবে বোফর্স নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারাভিযানে কেন ভিপি সিং-এর সুরে সুর মিলিয়ে জনসাধারণকে ওরা বিভ্রান্ত করেছিল ওরা তখন বলেছিল ভিপিকে ক্ষমতায় আনলেই নাকি 'রাজীব গান্ধীর কামান কেনার টাকা' উদ্ধার করা হবে। ১১ মাস ক্ষমতায় থেকেও কেন ওরা কিছু করতে পারেন না? না, জবাব্ দেবার মত কিছুই অবশিষ্ট নেই ওদের। তাই এবারের নির্বাচনে সিপিএম নামক গোয়েবলসদের বিচার হবে।'

কংগ্রেস বা বিজেপি নেতাদের কথা মেনে না নিলেও ভিপি পন্থী লাইনে হাঁটার জন্য সিপিএমের বিশেষ বিপদ অন্য জায়গায় এতদিন সিপিএম না করা বামপন্থীরা নিজস্ব প্রার্থী না থাকায় বাধ্য হয়ে বামপন্থী ভেবে নিয়ে সিপিএমকেই ভোট দিত। কিন্তু এখন তাঁরা মনে করেন 'ভিপি কিংবা রাজীব হল বুর্জোয়া মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ' তাই ভিপির সঙ্গে থাকা সিপিএম এই সোসিও ডেমোক্রেটিক বুর্জোয়াজির সঙ্গে সমঝোতাপন্থী লাইনকে তারা কখনই সমর্থন করবে না। নকশালপন্থী দলগুলি, এস-ইউ-সি এবং অন্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি সিপিএমকে যে মেকী বামপন্থী মনে করে একথা রাখঢাক না করেই জানিয়ে দিয়েছে। আর এই মনোভাবের প্রভাব শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিহার, অসম, ত্রিপুরা, কেরল এমন কি অন্ধ্রপ্রদেশেও পড়বে। এমন কি সিপিএমের কট্টর ক্যাডারদের মধ্যেও এই চিন্তার প্রভাব পড়তে পারে। এখন এইসব প্রভাবকে দমন করে ভিপির সঙ্গে থাকার স্রেফ ফায়দাটি সিপিএম বুদ্ধিমান নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগের জোরে তুলে নিতে পারে কি না —সেটাই দেখার।

— কৃষ্ণাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি অশোক বসু, বিকাশ চক্রবর্তী, কাজী আব্দুল মোহিদ, প্রবীর দাস

ন্যাশনাল ফিল্ম ডিভিশন কর্পোরেশন-এর আর্থিক সাহায্যে তৈরি বিশিষ্ট ও প্রতিভা সম্পন্ন পরিচালকদের নতুন ধারার ছবিগুলি দেশে বিদেশের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে হারে পুরস্কার আনছে এদেশে চলচ্চিত্রমোদী দর্শক তৈরি করতে ততোধিক ব্যর্থ তারা। কেন?

সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার শিল্পসম্মত ভাল ছবির কথা বলতে গেলে আজ স্বভাবতই এন·এফ·ডি·সি–র কথা এসে পড়ে। আজ , র দেশে বিগত চার দশকে যত শিল্পসম্মত এবং সিরিয়াস ছবি তৈরি হয়েছে তার বেশির ভাগই আমরা পেয়েছি এন·এফ·ডি·সি–র আনুকূল্যে। এই রাষ্ট্রীয় ফিল্ম বিকাশ নিগম আংশিকভাবে নয়ত শতকরা একশ ভাগ টাকা জুগিয়ে প্রগতিশীল চলচ্চিত্র পরিচালকদের শিল্পসম্মত ও বাস্তবধর্মী যে সব ছবি তৈরি করতে সাহায্য করছে আজ সে–সব ছবিকেই আমরা বলছি 'সমান্তরাল সিনেমা'। এই সমান্তরাল সিনেমার আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে এন-এফ·ডি·সি ও এরই পূর্ববর্তী সংস্থা এফ·এফ·সি·র ভূমিকা নিঃসন্দেহে আলোচনার দাবী রাখে

এন এফ ডি·সি গড়ে উঠেছিল ১৯৮০ সালের ১১ এপ্রিল এফ·এফ·সি ১৯৬০ সালে এফ·এফ·সি অর্থাৎ ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার একসপোর্ট কর্পোরেশন একত্রে মিলেই সংস্থার নাম হয়েছিল ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন। সংক্ষেপে আমরা যাকে বলি এন এফ ডি·সি।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার চলচ্চিত্রের বিকাশে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে সুপারিশ জানাবার জন্যে ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির ছিল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ: ১) চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা এবং পঠন-পাঠনে সাহায্য করার জন্যে দেশ-বিদেশের ভাল ছবি সংগ্রহ করে এক ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ গড়ে তোলা ২) ফিল্ম তৈরির কলাকৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ যোগানোর জন্যে এক ফিল্ম ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা ৩) দেশে শিল্পসম্মত ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ভাল ভাল ছবি যাতে প্রতিভাবান পরিচালকেরা তৈরি করতে সমর্থ হন তার জন্যে তাঁদের অর্থ যুগিয়ে সাহায্য করা।

এই তৃতীয় সুপারিশ অনুযায়ীই চলচ্চিত্র তৈরি করতে অর্থ সাহায্য যোগানোর জন্যে গড়ে তোলা হয়েছিল ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন। সংক্ষেপে এফ·এফ·সি ফিল্ম অত্যন্ত ব্যয়বহুল এক মাধ্যম ছবিতে শিল্পীর ধ্যানধারণা এবং সমাজ ও পরিবেশ থেকে উদ্ভূত তাঁর চিন্তাধারাকে রূপ দেবার জন্যে বহু টাকার প্রয়োজন প্রকাশের এক মাধ্যম হিসাবে এখানেই সিনেমার সবচেয়ে বড় অসুবিধা। শিল্পীদের পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় আত্মপ্রকাশের এক মাধ্যম হিসাবে চিত্রকলা, ভাস্কর্য আর সাহিত্য রচনায় শিল্পীকে এমন অর্থের দুঃশ্চিন্তায় ভুগতে হয়না।

সিনেমার জন্মকাল থেকেই এই শক্তিশালী জনমাধ্যমকে টাকার জোরে বগলদাবা করে পৃথিবীর সব দেশেই সিনেমার ব্যবসায়ীরাই লাভবান হচ্ছিলেন ধনী ব্যবসায়ীরাই দীর্ঘদিন এই মাধ্যমে প্রভুত্ব করেছেন টাকা ঢেলে টাকা কামাতে গিয়ে এঁরা সিনেমায় এনেছেন চমকপ্রদ স্পেকটাকেল, রোমাঞ্চকর ও আবেগধর্মী গল্প সিনেমার শৈশবকালে বাস্তবতার চেয়ে ইল্যুসানের দিকেই ঝোঁকটা ছিল বেশি সিনেমাকে জীবনের দর্পণ করে তোলার ব্যাপারে সিনেমার ব্যবসায়ীদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিলনা। এই ব্যবসায়িক ধারার বিরুদ্ধেই একদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন সমাজ ও শিল্প সচেতন চলচ্চিত্রশিল্পীরা ফরাসী দেশে নিউওয়েভ ফিল্ম মেকাররা এনেছিলেন এক নতুন ধারা জীবনকে দেখানোই হয়ে উঠেছিল ওঁদের মূলমন্ত্র।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে আমাদের দেশেও চিন্তাশীল ও সমাজ সচেতন শিল্পীরা সিনেমার মাধ্যমে তাঁদের মানসভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হতে চাইলেন এর জন্যে যে তাঁরা বুঝতে পারলেন আধুনিক যুগে কম্যুনিকেশনের ব্যাপারে

এন এফ ডি সি–র অর্থে তৈরি 'সাহেব সাহেব'

গোবিন্দ নিহালনীর ছবি 'পার্টি'

সিনেমাই সবচেয়ে ব্যাপক আর কার্যকরী মাধ্যম এঁরা কেউই ধনীর দুলাল ছিলেন না। তাই ছবি করতে গিয়ে অর্থের জন্যে শরণাপন্ন হলেন প্রথমে এফ·এফ·সি এবং পরে এরই নবরূপ এন এফ ডি·সি–র কাছে। এইভাবে সরকারি এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে জন্ম নিয়েছিল সমান্তরাল সিনেমার আন্দোলন।

আজ এন·এফ·ডি·সি একজন চিত্র পরিচালকের স্বপ্ন সিদ্ধির জন্যে সবচেয়ে বেশি হলে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে সাহায্য করছে এফ·এফ·সি·র আমলে ৫-৬ লাখ টাকাই সাধারণত দেওয়া হত। তেমন ভাল স্ক্রিপ্ট আর ভাল পরিচালক হলে এখন এন·এফ·ডি সি ছবির মোট খরচের ১০০ ভাগ খরচই বহন করে সে ছবি প্রযোজনাও করছে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এফ·এফ·সি এবং এন·এফ·ডি·সি·র আংশিক অর্থ সাহায্যে ভারতের প্রায় সব কটি প্রধান ভাষায় ভাল ছবি তৈরি হয়েছে প্রায় ১৫১টি। আর এই সংস্থার প্রযোজনায় ছবি তৈরি হয়েছে এ পর্যন্ত ২১টি। এছাড়া দিল্লি দূরদর্শনের সঙ্গে যৌথভাবেও এন·এফ·ডি সি ছবি তৈরি করছে। যেমন মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি 'একদিন অচানক'। সুধীর মিশ্রের 'ম্যায় জিন্দা হুঁ'। মণি কাউলের 'নজর', কুমার সাহানীর 'কসবা', সুরীন্দর সিং–এর পাঞ্জাবী ছবি 'মারহী দা দীবা' ইত্যাদি।

ভারতের সমস্ত ভাষার সমান্তরাল সিনেমার প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট পরিচালকই এই সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ছবি করেছেন বাংলা ভাষায় এই সংস্থার আর্থিক সাহায্যে এ পর্যন্ত ছবি তৈরি হয়েছে প্রায় ২০টি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল 'যুক্ত ভাঙার গান', 'সাত পাকে বাঁধা', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'চারুলতা', 'পঞ্চশর', 'কাঁচ কাটা হীরে', 'নায়ক', 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন', 'বিলেত ফেরত', 'পদী পিসির বর্মী বাক্স', 'পদাতিক', 'একটি জীবন'। ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো', এন·এফ·ডি·সি·র আংশিক আর্থিক সাহায্যেই তৈরি হতে পেরেছিল।

শতকরা ১০০ ভাগ খরচের টাকা যুগিয়ে এন·এফ ডি·সি· এ পর্যন্ত যে কটি বাংলা ছবি তৈরি করতে সাহায্য করেছে সেগুলো হল সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ও 'গণশত্রু', গৌতম ঘোষের 'অন্তর্জলি যাত্রা' আর অপর্ণা সেনের 'সতী' বাঙলার সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, গৌতম ঘোষ, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, রাজা মিত্র প্রভৃতি শিল্পসম্মত ভাল ছবির প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট পরিচালকই এই সংস্থার আর্থিক সহায়তা নিয়ে ছবি করেছেন মৃণাল সেনের প্রথম যে ছবি সারা ভারতকে চমকে দিয়েছিল হিন্দি ভাষায় সেই 'ভুবন সোম' ১৯৬৯ সালে তৈরি হয়েছিল এফ·এফ·সি–র আর্থিক সহায়তায়। বাসু চ্যাটার্জী চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় তাঁর অসাধারণ যে-ছবি নিয়ে প্রথম হাজির হয়েছিলেন সেই 'সারা আকাশ' ও এফ·এফ·সি·র আর্থিক সাহায্যেই তৈরি হয়েছিল বাসু ভট্টাচার্য 'অনুভব' তৈরি করেছিলেন ১৯৭১ সালে। সে-বছর এটিই ছিল দেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি এই ছবিও এফ·এফ·সি–র আংশিক আর্থিক সহায়তায়। অপর্ণা সেনের সারা জাগানো ইংরেজি ছবি 'থারটি সিক্স চৌরঙ্গী লেন', যে ছবি করে তিনি পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ান, তাও এই সংস্থারই আর্থিক সহায়তা লাভ করে হিন্দি 'দেবশিশু' করে সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সমর্থন হন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী। 'দেবশিশু' এন·এফ·ডি·সি·র প্রযোজিত ছবি।

ভারতের অন্যান্য ভাষার সমান্তরাল সিনেমার যে সব বিশিষ্ট পরিচালকেরা এই সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ভাল ভাল ছবি উপহার দিতে পেরেছেন তাঁরা হলেন, মালয়ালমে আদুর গোপালকৃষ্ণণ, জন শঙ্করমঙ্গলম, জি অরবিন্দন, শাজী এন করুন, অসমীয়া ভাষায়, মানু বরুয়া, কন্নড় ভাষায় গিরীশ কাসারাবল্লী ও সদানন্দ সুবর্ণ, গুজরাতীতে কেতন মেহতা, কুন্দন শাহ ও পারভেজ মেরওয়ানজী, মারাঠী ভাষায় বিজয়া মেহতা, ওড়িয়া ভাষায় মনমোহন মহাপাত্র, হিন্দি ভাষায় অবতার কাউল, কুমার সাহানী, মণি কাউল, গোবিন্দ নিহালনী, সৈয়দ মীর্জা, সুধীর মিশ্র প্রমুখ এবং পাঞ্জাবী ভাষায় সুরিন্দর সিং। এমন কি সংস্কৃত ভাষায়ও একটি ছবি প্রযোজনা

এন এফ ডি সি প্রযোজিত 'দস্তনজী'

করেছে এন-এফ-ডি-সি। ছবিটির নাম 'আদি শঙ্করাচারিয়া'। এই ছবিটি ১৯৮৪ সালে শ্রেষ্ঠ ফিচার ফিল্ম হিসাবে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছিল।

প্রতি বছর ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় সমকালীন শ্রেষ্ঠ ২১টি ভারতীয় ছবি নিয়ে যে ইন্ডিয়ান প্যানোরমার আয়োজন করা হয় তাতে এন-এফ-ডি-সি প্রযোজিত বা আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত কিম্বা দূরদর্শনের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি ছবিগুলোই ক্রমশ বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হচ্ছে যেমন, ১৯৯০ সালে ভারতীয় প্যানোরমার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যে ১৮টি ছবি নির্বাচিত হয়েছিল তার মধ্যে ১০টি ছবিই এন-এফ-ডি-সি–র আংশিক সাহায্যে, নয়ত সম্পূর্ণ আর্থিক সাহায্যে প্রযোজিত ছবি। ছবি-গুলোর ও পরিচালকদের নাম 'গণশত্রু' (সত্যজিৎ রায়), 'সতী' (অপর্ণা সেন), অসমিয়া 'বনানী' (জাহ্নু বরুয়া), মালয়ালম 'আ্যালি সিত্তে অন্বেষণম' (টি-ভি- চন্দ্রন), মালয়ালম 'পিরাভী' (সাজী এন- কারুন) কান্নাড়া 'কুবি মাত্তু ইয়ালা' (সদানন্দ সুবর্ণ), হিন্দি 'সেলিম ল্যাংড়ে পে মাত রো' (সৈয়দ মীর্জা), 'একদিন আচানক' (মৃণাল সেন), গুজরাতি 'পার্সি' (পরভেজ মেরওয়ানজী) এবং পাঞ্জাবী 'মারহী দা দীবা' (সুরিন্দর সিং)।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রেও ইদানিং এন-এফ-ডি-সি–র সাহায্যপুষ্ট এবং প্রযোজিত ছবিরই জয়জয়কার। পুরস্কার লাভের ব্যাপারে এই জয়যাত্রা এন এফ-সি–র আমল থেকেই বিগত চার দশকে নানান দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে যে–সব ভারতীয় ছবি পুরস্কার জিতেছে তার প্রায় ৯০ ভাগ ছবি হয় এন এফ-ডি-সি র আর্থিক সাহায্যে তৈরি, নয়ত এই সংস্থার প্রযোজিত, কিম্বা অন্য সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি। এখানে কয়েকটি বিশেষ ছবির নাম উল্লেখ করছি। 'সাত পাকে বাঁধা' বাংলা ছবিটি ১৯৬৩ সালে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ১৯৬৫ সালে বার্লিন ফেস্টিভ্যালে পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। 'নায়ক' ১৯৬৬ সালে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালে পেয়েছিল শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস প্রাইজ। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' ১৯৬৯ সালে ভেনিস ফেস্টিভ্যাল থেকে নিয়ে এসেছিল স্বর্ণপদক। গুজরাতী ছবি 'কাঙ্কু' ১৯৭০ সালে চিকাগো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে লাভ করেছিল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার। অবতার কাউলের '২৭ ডাউন' ছবিটি ম্যানেহাইম ফিল্ম ফেস্টিভালে ডাকাট পুরস্কার লাভ করেছিল ১৯৭৪ সালে। 'দুবিধা' ছবিটির জন্যে মণি কাউল দেশে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান পেয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ১৯৭৫–এ এই ছবি চিকাগো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পেয়েছিল ব্রোঞ্জ হুগো পুরস্কার ১৯৮১তে হিন্দি ছবি 'চক্র' লোকার্নো ফেস্টিভ্যালে পেয়েছিল গোল্ডেন

পাঞ্জাবী ছবি 'মারহি-দা-দীবা'

লেপার্ড। ওড়িয়া ছবি 'মায়ামৃগ' ১৯৭৪–এ গ্রাঁপ্রি পুরস্কার পেয়েছিল ম্যানেহাইম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। অপর্ণা সেনের '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' ১৯৮২ সালে শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে 'গোল্ডেন ঈগল' জিতে নিয়ে আসে ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে। সাজী কারুনের অসাধারণ ছবি 'পিরাভী' আন্তর্জাতিক নানান উৎসব থেকে এত পুরস্কার লাভ করেছে যে তার পুরো লিস্ট দিতে গেলে বেশ কিছু জায়গা লেগে যাবে। এন এফ-ডি-সি র কো-প্রোডাকশন মীরা নায়ার পরিচালিত 'সালাম বোম্বে' এবং রিচার্ড এ্যাটেনবরো পরিচালিত 'গান্ধী' যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অজস্র পুরস্কার লাভ করেছে একথা আজ অনেকেই জানেন

সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার শিল্পসম্মত ভাল ছবির জন্ম সম্ভব করতে এভাবে পরিচালকদের শুধু অর্থ যুগিয়ে সাহায্য করাই এন-এফ-ডি-সি র একমাত্র কাজ নয় চলচ্চিত্রের প্রসারে আজ এই সংস্থার কার্যকলাপ বহুবিধ। এন-এফ-ডি-সিই বিদেশে ভারতীয় ফিল্ম রপ্তানী করছে, বিদেশ থেকে ভাল ছবি এনে তা দর্শকদের দেখিয়ে তাদের ফিল্ম বোঝার মান উন্নত করছে, দেশে ভাল দর্শক তৈরির জন্যে সিনেমা-থিয়েটার গড়ে তুলবার এবং তাতে শিল্পসম্মত ভাল ছবি দেখাবার পরিকল্পনা নিয়েছে, দর্শকদের রুচি উন্নত করার জন্যে রিজিওন্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিকল্পনাও নিয়েছে, কাঁচা-ফিল্ম বিদেশ থেকে এনে বন্টনের ব্যবস্থা করছে, উন্নত ধরনের সাজ সরঞ্জাম এনে ফিল্ম টেকনলজির উন্নতিতে সাহায্য করছে, রুচিশীল ভাল মানের ভি ডি ও ক্যাসেট তৈরি করে বাজারে ছাড়ছে এন এফ-ডি সি–র বার্ষিক রিপোর্টে এই সংস্থার এমন বহুবিধ কর্মসূচীর বহর দেখে সাধারণ মানুষের মনে হবে, সত্যি দেশে ফিল্মের প্রসারের জন্য এই সংস্থা যথাসাধ্য করছে।

হ্যাঁ, কিছু ভাল ছবির জন্ম এন এফ-ডি-সি নিঃসন্দেহে সম্ভব করেছে। কেরালার আদুর গোপালকৃষ্ণণ থেকে আসামের জাহ্নু বরুয়া পর্যন্ত সমান্তরাল সিনেমার নতুন নতুন চলচ্চিত্রসাধকদের ভাল ছবি তোলার সাধনা সফল করতে এই সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। যে–টাকা এই সংস্থা এ পর্যন্ত চলচ্চিত্র পরিচালকদের ঋণ হিসাবে দিয়েছে, সেই এফ এফ-সির আমল থেকে, তার পরিমাণ হল ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। এর মধ্যে টাকা ফেরত পাওয়া গেছে ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৭৫ হাজার। অপ্রাপ্যবোধে পাওনা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা। পরিচালকদের কাছ থেকে এখনও পাওনা বাকি ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। তাই অর্থকরী দিক থেকে চিত্রটা তেমন আশাপ্রদ নয়। পরিচালকদের কাছে থেকে ঋণের টাকা এখনও অনেক বাকি, এজন্যই এঁদের অনেকেই ছবি নিয়ে দর্শকদের কাছে পৌঁছোতে পারছেন না। এন-এফ-ডি-সি ফিল্ম তৈরির জন্যে পরিচালকদের অর্থ যুগিয়ে সাহায্য করছে। তবে এসব ছবি এবং নিজেদেরও প্রযোজিত ছবি চিত্রগৃহে পৌঁছানোর জন্য এদের কার্যকরী কোনো বন্টন ব্যবস্থা নেই। এই অক্ষমতার কথা এন এফ ডি-সি র বার্ষিক রিপোর্টেও স্বীকার করে বলা হয়েছে, 'বাণিজ্যিক মার্কেটে ভারতীয় ছবির ডিস্ট্রিবিউশনই এন এফ-ডি-সি–র এখনও সবচেয়ে দুর্বল দিক এই ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব না দিলে ভাল ছবি তৈরি করে জনগণের কাছে পৌঁছোনো যাবেনা '

বাজারের ডিস্ট্রিবিউটারদের এন এফ-ডি-সি এবং এই সংস্থার অর্থ সাহায্যে তৈরি সমান্তরাল সিনেমার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ নেই। কারণ তাঁরা

জানেন যে এসব ছবির তেমন দর্শক নেই। দর্শক তেমন নেই বলেই, হল মালিকরাও এ ধরনের ছবি বিশেষ দেখাতে আগ্রহী হন না।

এন·এফ·ডি·সি–র নিজেদের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক জোরদার করে তুলতে দরকার দেশজুড়ে নিজেদের কিছু আর্ট-থিয়েটার গড়ে তোলা। সমান্তরাল ছবির পরিচালকেরা দীর্ঘদিন ধরে এর ওপর জোর দিয়ে আসছেন। তাঁদের কেউ কেউ এই প্রতিবেদককে এমনও বলেছেন যে, এন·এফ·ডি·সি–র উচিত আপাতত কিছুদিন ফিল্ম তৈরির জন্যে অর্থ দেওয়া বন্ধ করে সেই টাকায় দেশের বড় বড় শহরে ৩০০-৪০০ আসনের মিনি-থিয়েটার গড়ে তোলা, যাতে সমান্তরাল ছবির পরিচালকেরা সে সব থিয়েটারে তাঁদের ছবি দর্শকদের দেখাতে পারেন। বড় শহর, তাঁদের মতে, দু-তিনটি করে মিনি থিয়েটার গড়ে তুলতে পারলেই অনেকটা কাজ এগিয়ে যাবে। তখন আর কমার্শিয়াল ডিস্ট্রিবিউটার আর একজিবিউটারদের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। তবে প্রশ্ন হল, বড় বড় শহরে মিনি থিয়েটার গড়ে তুললেই কি সমান্তরাল সিনেমার ভাল ছবির দর্শক পাওয়া যাবে? আমাদের এই গরীব দেশে খেটে খাওয়া কোটি কোটি অশিক্ষিত মানুষের কাছে সিনেমা এখনও বিনোদনের এক মাধ্যম বৈ কিছু নয় এর থেকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা একটাই 'ফ্যান্টাস্টিক এন্টারটেনমেন্ট,' যা মুখরোচক তেলেভাজার মত যুগিয়ে চলেছে হিন্দি বাণিজ্যিক ছবিগুলো কী বিপুল এসব ছবির আয়োজন: স্বল্পবসনা সুন্দরী নারীর দেহবল্লরীর উদ্দামতা, রোমাঞ্চকর খুন খারাবি, কথায় কথায় মারদাঙ্গার উত্তেজনা, চোখ ধাঁধানো সেট নয়ত লোকেশন, কোমর দুলিয়ে নায়ক নায়িকার নাচ, বৃষ্টিতে নায়িকার দেহ ভিজিয়ে শরীরের ভাঁজকে প্রকট করে তোলা, মাদকতা সৃষ্টির জন্যে কী নেই এসব ছবিতে। কোটি কোটি টাকায় তৈরি এসব জমকালো ছবিই হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে সিনেমা। খারাপ সিনেমা খারাপ দর্শকই সৃষ্টি করে।

এন এফ ডি-সি টাকা জুগিয়ে ভাল ছবি তৈরি করতে সাহায্য করছে ঠিকই, তবে এই সংস্থার ভাল দর্শক তৈরি করার কর্মসূচীগুলো সফল হতে পারেনি যেমন ধরুন, মূলত দর্শকদের চলচ্চিত্র-বোধ উন্নত করে তোলার জন্যই এন এফ·ডি·সি বছরে ৫০-৬০টি বিদেশী ছবি আমদানী করছে। সংস্থাটি গড়ে ওঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বিদেশী ছবি এই সংস্থা আমদানী করেছে–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া–এসব বড় বড় দেশ থেকে আবার হংকং আর তুরস্কের মত ছোট দেশ থেকেও। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, এর ৯০ ভাগ ছবিই বাণিজ্যিক বিনোদনের এর কারণও আছে পয়সা খরচ করে ফিল্ম এনে দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা না তুলতে পারলে এন-এফ·ডি সিরই বা অস্তিত্ব বজায় থাকবে কি করে? দর্শক নেয়না বলেই, আমদানী করার সময় শিল্পসম্মত ভাবোদ্দীপক ছবির চেয়ে সস্তা বাণিজ্যিক ছবি আমদানী করে এন·এফ·ডি·সি কাগজে কলমেই তাদের দায়িত্ব পালন করছে দর্শকদের মান এতে উন্নত হচ্ছেনা বিন্দুমাত্রও

মিনি থিয়েটার গড়লেই যে ভাল দর্শক পাওয়া যাবেনা বা যাচ্ছেনা এই বাস্তব সত্যটাও ইদানিং এন·এফ ডি·সিরই কিছু কর্মসূচীতে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বোম্বাইতে আকাশবাণীর এক মাঝারী থিয়েটারে এন·এফ·ডি সি প্রযোজিত, আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বিদেশ থেকে আমদানী করা ভাল ভাল ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তবে কয়েকবছর পর সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হয় স্রেফ দর্শকের অভাবে। পরে, আরেকটু সুবিধাজনক এলাকায় 'মুম্বাই সাহিত্য সংঘ'র মঞ্চে নিয়মিত শিল্পসম্মত ছবি দেখাবার পাকাপাকি আয়োজন করা হয়। 'ম্যাডাম সোৎসুকির' মত ভাল ছবিটি

নবেন্দু ঘোষের 'তৃষাগ্নি'

নিয়ে এই মঞ্চে ফিল্ম দেখানো শুরু করা হয় বেশ সাড়ম্বরে। তবে এখানেও ক্রমশ দর্শকের সংখ্যা কমতে থাকায় সেই ব্যবস্থা তুলে নিতে হয় এরপর এন এফ-ডি সি বেশ ঢাক ঢোল পিটিয়ে বোম্বাইয়ের আরও বেশি সুবিধাজনক এক এলাকায় 'সচিনাম' নামে একটি মিনি থিয়েটার পাকাপাকিভাবে সংগ্রহ করে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর পুরস্কৃত ছবি 'বাঘ বাহাদুর' নিয়ে ভাল শিল্পসম্মত ছবি দেখানো আবার শুরু করে দেয় তবে দুর্ভাগ্যবশত এই থিয়েটারেও ভাল ছবির পৃষ্ঠপোষকতায় দর্শকরা তেমন সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন না কলকাতার নন্দন কমপ্লেকসে শিল্প সম্মত ভাল ছবি দেখিয়েও তেমন দর্শক টানা যায়নি একই হাল দেশের অন্যান্য শহরেও

দেখা যাচ্ছে, দেশে শিল্পসম্মত ভাল ছবি তৈরি হলেও, ভাল ছবি দেখার মন তৈরি হচ্ছে না দর্শকদের। সিনেমা যে মূলত এক শিল্পমাধ্যমও হতে পারে বা হওয়া উচিত এমন বোধ দর্শকদের মধ্যে গড়ে উঠছে না শুধু খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরাই নন, অনেক শিক্ষিত মানুষও এসকেপিস্ট বাণিজ্যিক সিনেমার ছবিই পছন্দ করছেন।

ভাল ছবির আন্দোলনের তাহলে ভবিষ্যৎ কি? দর্শক তৈরির সমস্যার সমাধান হবে কি করে? এন এফ·ডি·সির কাজ চলচ্চিত্রের প্রসার। তাই এই সংস্থাকেই এই সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। তবে রুটিনমাফিক কাজ করা ছাড়া এই সমস্যা নিয়ে এন·এফ·ডি·সি কর্তৃপক্ষ খুব একটা ভাবছেন বলে মনে হয় না এই প্রতিবেদক এন·এফ·ডি·সি র বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রবি গুপ্তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'শুধুমাত্র মিনি থিয়েটার গড়ে তুলেই ভাল দর্শক যখন তেমন পাওয়া যাচ্ছে না তখন ওঁরা অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবছেন কিনা? এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর মিঃ গুপ্তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রতিবেদকের বিশ্বাস, স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন কোর্সের ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়ে ভাল রুচিশীল দর্শকের এক নতুন প্রজন্ম তৈরি করতে পারলেই সমান্তরাল সিনেমা বাঁচবে সিনেমা যে এক শিল্প মাধ্যম, সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার ছবিই যে ভাল ছবি–এই চেতনা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে গড়ে তোলার জন্যে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডি সেন্টার গড়ে তোলার এক পরিকল্পনা নিয়েছিলেন নানান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডি সেন্টার কি সত্যি গড়ে উঠেছে? উঠলেও, লক্ষ্য ঠিক রেখে সেভাবে কি কাজ হচ্ছে? না, হচ্ছেনা। আমাদের দেশে এরকম হামেশাই হয়। অনেক সৎ চিন্তা, শুভ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কাগজে কলমেই থেকে যায়। এই পরিকল্পনাকে ব্যাপকভাবে কার্যকরী করতে এন·এফ·ডি·সি কি সহায়তার হাত বাড়াতে পারে না?

বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানী করার কার্যক্রমও এন এফ·ডি·সি·র আছে। সমান্তরাল সিনেমার অনেক ছবিই বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। অনেক ছবি পুরস্কারও নিয়ে এসেছে চিত্রগৃহের মাধ্যমে দেশের দর্শকদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছেনা বলে নবধারার বেশির ভাগ পরিচালকেরই এখন প্রধান লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে বিদেশের সম্মান। আর বড় জোর, টিভির মাধ্যমে ছবির এক ছাড়পত্র সংগ্রহ করা।

তবে কোনো আন্দোলনই জনগণকে বাদ দিয়ে সফল হতে পারে না। সমান্তরাল সিনেমাকে বাঁচাতে হলে জনগণকে সঙ্গে নিতে হবে, জনগণের কাছে পৌঁছোতে হবে কি করে তা সম্ভব তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকেই ভাবতে হবে এন এফ·ডি·সি–কেও।

দিব্যেন্দু গুহ

সিনে সেন্ট্রালের রজত জয়ন্তী বর্ষের অঙ্গ হিসেবে কলকাতা শহরে টানা ২১ দিন ধরে চলল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। প্রদর্শিত হল ৩০টি দেশের মোট ১৫৬টি ছবি। বেসরকারি উদ্যোগের এই চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয় মৃণাল সেনের 'জেনেসিস' ছবিটি দিয়ে। সিনে সেন্ট্রাল এই বর্ণময় কুশলী পরিক্রমায় চলচ্চিত্র কর্মী ও রসিকদের মনে স্থায়ী আসন নিয়ে নিচ্ছে।

সিনে সেন্ট্রালের পঞ্চম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

২ ডিসেম্বর ১৯৯০ সাংবাদিকে ঠাসা 'নন্দন' অডিটরিয়ামে দীর্ঘদেহী মানুষটির কথাগুলি একেবারে হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসছিল। "হ্যাঁ এ অস্ট্রেলিয়ায় থাকি বটে, কিন্তু নিজেকে আন্তর্জাতিক মানুষ মনে করি। পাশপোর্টের পরিচয়ে আমি বিশ্বাস করি না। আর এ জন্য কখনোই আমার ছবির বিষয়সার দেশকালের সীমায় আটকে থাকে নি। না, রাজনৈতিক ভঙ্গিতে আমার তেমন আস্থা নেই আমি ভাবি মানবীক সম্পর্ক নিয়ে, আমার ছবিতে রয়েছে তারই স্পষ্ট 'প্রতিফলন' বক্তব্যটি অস্ট্রেলিয়ার প্রোথিতযশা স্বকীয় ঘরাণার চলচ্চিত্র নির্মাতা পল কক্সের কলকাতায় নিজের প্রথম রেট্রোসপেকটিভ এর উদ্বোধনী সভায় তাঁর কণ্ঠ ছিল আবেগঘন মঞ্চে তাঁর পাশে ছিলেন, বাংলার খ্যাতিমান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অস্ট্রেলিয়া দূতাবাসের প্রথম সচিব জুবালস্কি, এবং সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীমতী জালা। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিজয়ী পল কক্স তখনও বলে যাচ্ছিলেন, "হলিউডে গিয়ে ছবি আমি করব না। আমি দেখাতে চাই ভাল ছবি বাইরে থেকেও করা সম্ভব। আমি আমার জীবন ও কাজের প্রতি সব চাইতে বেশি অনুরক্ত আমি সব সময় মানুষের সুখের মুহূর্তগুলি আমার ছবিতে ধরতে চাই।"

সুখের মুহূর্তগুলিকে সেলুলয়েডে ধরে রাখার সার্বিক প্রয়াস যিনি চালিয়ে যাচ্ছেন সেই চিত্রনির্মাতা পল কক্স কিন্তু জন্মসূত্রে ডাচ। অথচ তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সৃজনশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। আবার অস্ট্রেলিয়ার চিত্রপরিচালক হলেও ভারতের সঙ্গে তাঁর হার্দিক সম্পর্ক অবিসংবাদিত, কলকাতার সঙ্গে তো বটেই। কলকাতাকে নিয়েই ১৯৭০-এ তিনি তৈরি করেছেন তথ্যচিত্র 'কলকাতা' ঠিক একদশক বাদে ভারতেই তুলেছেন 'দ্য কিংডম অব নেক চান্দ'-এর মত তথ্যচিত্র। 'দ্য লোনলি হার্টস, ম্যান অব ফ্লাওয়ারস, মাই ফার্স্ট ওয়াইফ, ক্যাকটাস, ভিনসেন্ট আইল্যান্ড এবং গোল্ডেন ব্রেড'র কুশলী এই চিত্র পরিচালকের রেট্রোসপেকটিভ করার দুর্লভ আয়োজন করেছিলেন কলকাতার বৃহত্তর ফিল্ম সোসাইটি সিনে সেন্ট্রাল এর উদ্যোক্তারা ১৯৯০—তাঁদের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন বর্ষ, রজত

সিনে সেন্ট্রালের উদ্যোগে
পঞ্চম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে
আগত ছবিগুলির কোলাজ

উৎসবে প্রদর্শিত ছবির দৃশ্য

জয়ন্তীবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শুধু পল কক্সের মত বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক-এর রেট্রোসপেকটিভ করাই নয়, ২৩০০ সদস্যের সিনে সেন্ট্রাল আয়োজন করেছিলেন ৫ম কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবের কোনরকম সরকারি আর্থিক সাহায্য ছাড়া এরকম বিপুল আয়োজনের কথা সহসা কল্পনা করা না গেলেও সিনে সেন্ট্রাল অতীব কুশলতার সঙ্গে সেই কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে শুরু করলেন। অনেক উদ্দেশ্য-এর মধ্যে এই কর্মযজ্ঞ পরিচালনের অন্যতম উদ্দেশ্য—সিনে সেন্ট্রালের কর্মী, ফিল্ম টেকনিশিয়ান্স, শিল্পী এবং চলচ্চিত্র কর্মীদের জন্য একটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড তৈরি করা

সিনে সেন্ট্রাল আয়োজিত এই কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবে পল কক্স এর রেট্রোসপেকটিভ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জেমস পেরিজের রেট্রোসপেকটিভ, সাম্প্রতিক জাপানী ছবির উপর বিশেষ স্মারক প্রদর্শনী এবং ইতালিয়ান 'নিও রিয়ালিস্ট' সিনেমার উপর চিত্র উপস্থাপনার কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২৫ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবে সিনে সেন্ট্রাল দেখায় ৩০টি দেশের ১৫৬টি ফিচার ফিল্ম এবং ৫১টি স্বল্পদৈর্ঘের ছবি। উৎসব চলে ৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎসবের ছবিগুলি দেখানো হয় যথাক্রমে গ্লোব, চ্যাপলিন হল, বিদ্যামন্দির, যমুনা, নন্দন এবং সরলা রায় মেমোরিয়াল কম্যুনিটি হল।

একক উদ্যোগে সিনে সেন্ট্রাল কলকাতার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে সবাইকে চমকে দিলেও সিনে সেন্ট্রালের নাম তাদের কর্মধারা সম্পর্কে কলকাতাবাসী মাত্রই অবহিত, এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সালে দর্শকদের যাতে বিশ্বের চলচ্চিত্র বিষয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হয় এবং প্রয়োজনে গবেষণা নির্ভর কাজ করতে পারেন সিনে সেন্ট্রালের উদ্যোক্তারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন স্থির করেছিলেন এতদিন সেই উদ্দেশ্য তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছেন। এঁরাই টাইগার প্রেক্ষাগৃহে চার্লি চ্যাপলিনের উপর রেট্রোসপেকটিভ আয়োজন করেছিলেন এ বছরের জানুয়ারি ১২ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত।

এপ্রিল ১৯৯০ কলকাতার তখনকার মেয়র কমল বসু সিনে সেন্ট্রালের আমন্ত্রণে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে চ্যাপলিন সেন্টেনারি একজিবিশনের উদ্বোধন করেন। গায়িকা-নায়িকা কিংবদন্তী কানন দেবী, চার্লি পোশাক পরিহিত শিশুশিল্পীদের সঙ্গে 'ওয়াক ফর বেটার সিনেমা' মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন, সিনে সেন্ট্রালের আমন্ত্রণে

৫ ম কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসবে প্রদর্শিত ভারতীয় ছবির তালিকা

১) মাঝি পহচা (ওড়িয়া, নির্দেশক–মনমোহন মহাপাত্র)
২) হালোধিয়া ছোবায়ে বায়োধন খাই (অসমিয়া, নির্দেশক জহনু বরুয়া)
৩) জেনেসিস (হিন্দি, নির্দেশক মৃণাল সেন)
৪) সিংহাসন, (মারাঠী, নির্দেশক জব্বর প্যাটেল)
৫) দামুল (হিন্দি, নির্দেশক প্রকাশ ঝা)
৬) তরঙ্গ (হিন্দি, নির্দেশক কুমার সাহানি)
৭) স্পর্শ (হিন্দি, নির্দেশক সাই পরাঞ্জপে)
৮) ভাবনি ভবাই (গুজরাটি, নির্দেশক কেতন মেহতা)
৯) পিরাভি (মালয়ালম, শাজি এন করুন)

চলচ্চিত্র নির্মাতা পল কক্স

এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শুভ উদ্বোধন করলেন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ৯ ডিসেম্বর, গ্লোব সিনেমায় তাঁর ছবি 'জেনেসিস' ছিল উৎসবের প্রথম প্রদর্শিত ছবি। এদিন সিনে সেন্ট্রালের সভাপতি কল্পতরু সেনগুপ্ত মৃণাল সেনের হাতে পথের পাঁচালি পুরস্কার তুলে দেন।

সিনে সেন্ট্রালের সাধারণ সম্পাদক অলক চন্দ্র জানালেন, রজত জয়ন্তী বর্ষে তারা ১০টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কলকাতায় তাঁরা একটি আর্ট থিয়েটার স্থাপন করবেন। প্রত্যেক বছরই তাঁরা একটি করে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব করবেন কলকাতায়। আগামী বছরের ফিল্মোৎসব হবে নভেম্বর '৯১ তে। এবার থেকে সিনে সেন্ট্রালের প্রকাশনা মাসিক 'চিত্র-বীক্ষণ' পত্রিকাটিকে নিয়মিত করবেন এবং চলচ্চিত্রের উপর একটি ইংরাজি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন।

সিনে সেন্ট্রালের সদস্যদের জন্য একটি পাঠগৃহ তৈরি করা হবে। তাছাড়া সিনে সেন্ট্রালের ২৫ বছর এর উপর একটি স্বল্প পরিসরের ছবি তৈরি হবে। প্রত্যেক মাসেই ফিল্মের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে। সিনেমার টেকনিশিয়ান্স শিল্পী এবং সিনেমাকর্মীদের জন্য একটি ওয়েলফেয়ার ফান্ড তৈরি করা হবে। প্রত্যেক বছরেই বিশ্বচলচ্চিত্রে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য গুণীজনকে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হবে। একটি কম্যুনিটি হল তৈরি করা হবে প্রত্যন্ত গ্রামে যাতে সিনেমার প্রচার সম্ভব হবে, তাছাড়া ফিল্ম সোসাইটির সদস্য টেকনিশিয়ান্স শিল্পী সিনেমা কর্মীদের জন্য একটি হলিডে হোম তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

সিনে সেন্ট্রালের সদস্য অমিতাভ ব্রহ্মচারি বললেন, 'আমরা ২৩০০ সদস্য রয়েছি এই সংস্থায়। সকলেই যে যার কাজ গুছিয়ে করি। এখানে যুক্ত রয়েছেন কল্পতরু সেনগুপ্ত, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ গুণীজনও। আমরা এবারকার মত আগামী দিনেও চলচ্চিত্র ভাবনার একটি স্রোত বইয়ে দিতে চাই কলকাতায়।'

—এবারকার উৎসব কি প্রতিযোগিতা মূলক?

—না, প্রতিযোগিতা মূলক নয়।

—আগামী বছরও কি আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব করবেন?

মোটামুটিভাবে ঠিক আছে অনুষ্ঠান নভেম্বরে করা হবে

কলকাতায় প্রত্যেক বছরই এখন একটি করে আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব উপহার দেবেন সিনে সেন্ট্রাল। ফি–বছর শীতের মরসুমে এমন উপভোগ্য আনন্দ–উত্তাপের সংবাদে কলকাতাবাসী উল্লসিত হবেন বইকি!

গুরুপ্রসাদ মহান্তি ছবি কাজী আব্দুল মোমিত

১৯৯০ : সংবাদ শিরোনামে কারা ছিলেন ?

উনিশশো নব্বই–এর চাকা পালটে একানব্বই শুরু হলেও দেশ-দশ-বিশ্বের নিরিখে সংবাদ শিরোনামের মানুষজন তেমনভাবে পাল্টান নি। কারা ছিলেন ১৯৯০–এর সংবাদ শিরোনামে? ১৯৯১–এও কি তাঁরা সংবাদ শিরোনামে থাকবেন? পরিবেশিত হল আলোকপাতের মনোনয়ন।

সাদ্দাম হোসেন

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বকে যিনি রুদ্ধশ্বাসে রেখেছেন তিনি হলেন ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসন নিয়ে গত বছরের শেষদিকে তিনি যেভাবে আলোচ্য হয়ে উঠেছিলেন নিজের 'গোঁ' বজায় রেখে, এ বছরের শুরু থেকে সাদ্দাম হোসেন ত্রাসে বিশ্ববাসী ভুগছে আমেরিকাসহ অন্য দেশগুলির হুমকিকে অগ্রাহ্য করে ইরাকের লক্ষ্য এখন কেমিক্যাল ওয়ার "তেলের খনি" আরব দেশের তল–সম্ভার ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি সারা বিশ্বকে কোথায় দাঁড় করাবে এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য আগামী প্রজন্মের কাছে কি জবাব দেবেন ইরাকী সেনানায়ক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন?

নেলসন ম্যাণ্ডেলা

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা দীর্ঘ সাতাশ বছর শ্বেতাঙ্গ সরকারের কারাবন্দী থেকে বাইরের আলোকে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর থেকে সারা বিশ্ব জুড়ে তাঁকে নিয়ে আলোড়নের অন্ত নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের ওপর শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে সারা বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন নেলসন। কলকাতাবাসীও সাদরে এই মহান মানুষটিকে দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর শৌর্যময় ব্যক্তিত্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান আগামী প্রজন্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মিখাইল গোরবাচেভ

রাশিয়া তথা সারা বিশ্বে পেরেস্ত্রৈকা নিয়ে যে মানুষটি ঝড় তুলেছিলেন তিনি হলেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মিখাইল গোরবাচেভ। সর্বকালের সেরা ও বিতর্কিত মানুষদের তালিকায় এই মুহূর্তেও তাঁকে বসানো যায়। পূর্ব ইওরোপে সোভিয়েত রাশিয়া যে আলোড়ন তুলেছিল তারও মূল হোতা গোরবাচেভ। সারা বিশ্বে আলোড়ন তুললেও গোরবাচেভ এই মুহূর্তে নিজের দেশে প্রবলতম বিতর্কিত। সোভিয়েত রাশিয়ায় খাদ্য সংকট থেকে নিয়ে সুপ্রীম সোভিয়েতেও তাঁর নেতৃত্বের খোলাখুলি সমালোচনা গোরবাচেভকে এই মুহূর্তে ভাবিয়ে তুলেছে। গত বছরের সংবাদ শিরোনামের এই মানুষটি এবছরও সংবাদ শিরোনামে থাকবেন — একথা সহজেই অনুমেয়।
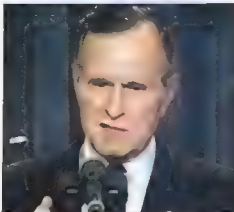
জর্জ বুশ

কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসনের জন্য যদি সাদ্দাম হোসেন-কে নায়ক চিহ্নিত করে সারা বিশ্ব, সেক্ষেত্রে ইরাককে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য অবিসংবাদী মানুষ চিহ্নিত হবেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তবে দেশের মাটিতে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য জর্জ বুশকে চাপ দেওয়া হলেও বুশ অনমনীয় ইরাকের বিদেশ-মন্ত্রী ও আমেরিকান বিদেশমন্ত্রীর আপোষ আলোচনা বাধা হওয়ায় বুশ তার অনমনীয় মনোভাবের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এখন দেখার বিষয় ১৯৯১-এ জর্জ বুশ কুয়েতে ইরাকী আগ্রাসনের সঠিক সমাধান খুঁজে আনতে পারেন কিনা

মার্গারেট থ্যাচার

একটি মানুষের সাথে সাথে একটি যুগের অবসান। ব্রিটেনের 'লৌহমানবী' মার্গারেট থ্যাচার দীর্ঘ ১১ বছর ক্ষমতায় থেকে সরে গেছেন ব্রিটেনের শাসন ক্ষমতা থেকে তাঁর জায়গায় এসেছেন 'থ্যাচারপন্থীদের' অন্যতম জন মেজর ব্রিটেনের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা রাজনীতিক ও শাসকদের মধ্যে মার্গারেট থ্যাচার সর্বাগ্রগণ্যা জন মেজরের অভি-ষেকে থ্যাচারিজমের ইতি হবে কিনা বলা মুশকিল হলেও এটুকু অবশ্যই বলা যায়, মার্গারেট থ্যাচার বিশ্ব রাজনীতিতে সর্বকালের সেরা মহিলা রাজনীতিকদের অন্যতমার আসন-টি অবশ্যই দাবি করতে পারেন।
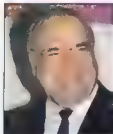
হেলমুট কোল

অবশেষে সেই মিলনাত্মক দৃশ্য প্রাচীর ভেঙে একসূত্রোয় বাধা পড়ল পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী। চ্যান্সেলার হেলমুট কোল নির্বাচিত হয়েছেন সংযুক্ত দুই দেশের কর্ণধার দুটি দেশের ভিন্ন আর্থ-সামাজিকতার সমস্যা থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারাকে এক সুতোয় আনতে গিয়ে রীতিমত হিমসিম খেতে হলেও এই শতকের ইতিহাসে হেলমুট কোল অবশ্যই প্রধানতম আলোচিত মানুষদের অন্যতম হয়ে থাকবেন, তিনি আশা করেন অচিরেই জার্মানরা নিজেদের এক ছত্রছায়ায় এনে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবে

বেনজির ভুট্টো

পাকিস্তান রাজনীতিতে যেমন হঠাৎ করে সাড়া জাগিয়ে উঠে এসেছিলেন ভুট্টো-তনয়া বেনজির ঠিক ততোধিক আলোড়িত হল তাঁর প্রস্থানপর্ব। সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কর্মতৎপরতা পাকিস্তানে বেনজিরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে ঢেকে দেয়। তবে তুখোড় রাজনীতিক হিসেবে বেনজির সত্যিই বে-নজির। জিয়ার একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়েই বেনজির ক্ষান্ত হন নি, বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারেও পাকিস্তান বিশ্ব রাজনীতিতে জায়গা করে নিচ্ছিল নির্বাচনে 'কারচুপি'র অভিযোগ আসায় পরাজিতা বেনজির কিন্তু এবছরও দমে থাকবেন না। বরাবরের মত এবছরও সংবাদ শিরোনামে উঠে আসতে পারেন।

লে ওয়ালেশা

পোলিশ সলিডারিটির নেতা নোবেল পুর-স্কার জয়ী লে ওয়ালেশা এখন পোল্যান্ডের জন-গণের আশা-ভরসা-ভবিষ্যত গত বছর বিপুল জনমতে দেশের শাসন-ক্ষমতা লাভ করে ওয়ালেশা এখন পোল্যান্ড পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত পোল্যান্ডের ডক শ্রমিক আন্দোলনে যে মানুষটি সারা বিশ্বকে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য করিয়েছিলেন সেই লে ওয়ালেশা এ বছরেও সংবাদে থাকবেন বলে আশা করা যায়

ভি পি সিং

মার্গারেট থ্যাচার এগারো বছর ক্ষমতায় থেকেও দলের আস্থা হারানোর সম্ভাবনায় ইস্তফা দিয়ে বিরল নজির সৃষ্টি করলেও এগারো মাসের শাসক ভি পি সিং কিন্তু সে পথ অনুসরণ করেন নি। বিগত বছরটিতে তাঁকে নিয়ে এদেশের রাজনৈতিক মঞ্চ সরগরম ছিল। ভি পি সিং মানেই সংবাদ। সেক্ষেত্রে সংবাদ শিরোনাম হওয়া একরকম তার নিত্যনৈমিত্তিক রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী চেয়ারে বসে রাজীব সরকারের বিরুদ্ধে বোফর্স থেকে নিয়ে সুইস ব্যাঙ্ক কেলেংকারি তথা গত বছর ধরে মণ্ডল কমিশনের জন্য ভি পি সিংকে নিয়ে অধিকাংশ সময়েই মেতে থেকেছে দেশীয় সংবাদ মাধ্যম। বর্তমানে নতুন বছরে তাঁর কর্মপন্থার নিরিখে সহজেই অনুমান করা যায় ক্ষমতাচ্যুত হলেও এই মানুষটিকে সংবাদ শিরোনাম-চ্যুত করা সম্ভব নয়।

সমাধানে তিনি কি করেন এখন জনগণের দেখার সময়। গত বছর আকস্মিক সংখ্যালঘু সরকারের প্রধান হয়ে যেমন চমক সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি পেছন থেকে কংগ্রেসের সমর্থনে এ বছর দেশকে কোথায় এগিয়ে দেবেন কিংবা ভি পি সিং, আদবানীদের নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলির সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে কি রণনীতি অনুসরণ করে দল ও দেশের মানুষদের হিতকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন উনিশশো একানব্বই-এ সে জবাব পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে এবছরও তাঁর সংবাদ শিরোনামে থাকার কথা।

চন্দ্রশেখর

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজীব গান্ধীর পর চন্দ্রশেখরই এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি কোন মন্ত্রিসভার সদস্য না হয়েও সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছেন। একদার 'তরুণ তুর্কী', এখন বিভিন্ন সমস্যার চক্রব্যূহে লড়াকু মেজাজ নিয়ে লড়ে চলেছেন। রাম মন্দির বাবরি মসজিদ বিবাদ থেকে নিয়ে অসম পঞ্জাব, ক্ষুদ্রতর সমস্যার আসু

রাজীব গান্ধী

চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী তৈরি করা থেকে নিয়ে গত বছরের দেশীয় রাজনীতির 'পর্দার পেছনের' নায়ক হিসেবে যে মানুষটিকে চিহ্নিত করা হবে তিনি আর কেউ নন রাজীব গান্ধী। ভি পি সরকার পতনের পরে অনেকেই আশা করেছিলেন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দল হিসেবে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দিল্লির শাহী মসনদে বসবে কিন্তু আদপে তা হল না। সংখ্যালঘু সরকারের প্রতিনিধি করে চন্দ্রশেখরকেই রাজধানীর রাজপাট তুলে দিলেন এই রাজীব গান্ধী। এর পিছনের অভিসন্ধি সাধারণের কাছে তেমন ভাবে পরিষ্কার না হলেও চরণ সিং সরকারকে রাজীব মাতার গাছে চাপিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার বিরল নজিরটি ভোলেন নি অনেকেই। তবে রাজীব চন্দ্রশেখরের সঙ্গে হয়তো তেমনটি করবেন না বরং নিজেদের জিত জমিয়ে নির্বাচনে ফিরে আসার জন্য এ বছর রাজীব গান্ধীর দিকে সংবাদ মাধ্যম মুখ উঁচিয়ে থাকবে।

জ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতির একচ্ছত্রবাদি উদ্দাম মানুষ জ্যোতি বসু গতবছর মুহূর্তে সংবাদ শিরোনামে এসেছেন

বি · শে · ষ · র · চ · না

এবছরও ভি পি সিং কে সমর্থন তথা রাজ্য রাজনীতির পরিস্থিতির নিরিখে সংবাদ শিরোনামে থাকবেন। তিনি শুধু রাজ্য রাজনীতিতে নয় সারা দেশের নেতৃবর্গের পুরোধা নেতা হিসেবে যেমন চিহ্নিত ছিলেন এবছরও ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে কোন রদবদলে হলে জ্যোতি বসুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই থাকবে

লালকৃষ্ণ আদবানী

সোমনাথ থেকে অযোধ্যা অভিমুখে রাম রথযাত্রা করার পর থেকে নিয়ে গত বছরের শেষ তিনটি মাস যিনি সংবাদ শিরোনামে নিজেকে 'বহাল তবিয়তে' রেখেছিলেন তিনি বি জে পি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। গত বছরে অক্টোবর ও নভেম্বরে অযোধ্যায় 'কারসেবা'র হিড়িক নিয়ে বি জে পি দেশীয় রাজনীতিতে প্রবল-ভাবে প্রকাশ করার যে সম্ভাবনা তৈরি করেছিল এবছর খানিকটা স্তিমিত মনে হলেও অযোধ্যা সমস্যা নিয়ে যেমন তারা সরকারকে নাকাল করতে পারে তেমনি বিতর্কিত মথুরা কাশী মন্দির নিয়েও নতুন আন্দোলনের মোড় নিয়ে আসতে পারে। এর পেছনে লালকৃষ্ণ আদবানীর ঝানু রাজনৈতিক 'বুদ্ধিমত্তা' তাঁকে সংবাদ শিরোনামে বজায় রাখতে পারে

মমতা ব্যানার্জি

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আন্দোলনকে আরও জোরদার করার প্রয়াসে যুবনেত্রী মমতা ব্যানার্জির নাম সর্বাগ্রগণ্য। লালু আলমের হামলায় আহত হওয়ার পর থেকে মমতা ক্রমশ রাজ্য রাজনীতিতে অনন্যতমা হয়ে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই মমতা সেখানেই সংবাদ। সি পি এম তথা বাম রাজত্বে মুহুর্মুহু ঝড় তুলতে সদাব্যস্ত মমতা এবছরও প্রবল বিক্রমে আলোড়ন তুলবেন এবং সংবাদ শিরোনামে নিজের স্থানটি বজায় রাখবেন বলেই বিজ্ঞমহলের ধারণা

রেখা

চিত্রাভিনেত্রী রেখা গত বছরে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিলেন তবে অভিনয়ের জন্য নয় বাস্তব জীবনের 'অভিনয়'-এর জন্যই রেখা এখনো বিতর্কিত নাম। হটলাইনের মালিক মুকেশ আগরওয়ালকে হঠাৎ করে বিয়ে করে যেমন হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন তেমনি আকস্মিক মুকেশের আত্মহত্যাও রেখাকে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছিল। সিনেমার পর্দায় এবছর রেখার বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পাবে। সেগুলির বাজারদরের জন্য হঠাৎ করে স্টারডম যেমন কাঁপাতে পারেন তেমনি ব্যক্তি জীবনেও নতুন 'গুঞ্জন' তৈরি করে নিজের 'বিতর্কিত' আসনটি ধরে রাখলে সংবাদ মাধ্যমের মানুষজনদের বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

অমিতাভ

বোফর্স কেলেঙ্কারী থেকে মুক্তি পাওয়া থেকে নিয়ে বক্স অফিসে 'আজ কা অর্জুন' এর সাফল্য সুপার স্টারকে 'এবছরের অর্জুন'ও করে রাখতে পারে। রুপালী পর্দায় এবছরে বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পাবে অমিতাভের এই বছরটি তাঁর কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সলমন, আমীরদের 'রোমান্টিক' ধারার পাশে 'অ্যাংরি মিডল এজ ম্যান' কিভাবে নিজের সুপারস্টার রথ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতে পারেন দর্শকদের রায়ে তাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হতে পারে বলে বোদ্ধামহলের ধারণা। তাই সুপার-স্টার অমিতাভ যেখানে সেখানেই চলবে ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক ক্লিক।

শচীন তেন্ডুলকার

সানি গাভাসকারের প্রস্থানে ক্রিকেটের বোদ্ধারা লিটল মাস্টার-এর অভাব পূরণ হবে না ধরেই নিয়েছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারের আগমনে তাঁদের হতাশা বোধহয় খানিকটা প্রশমিত হতে পারে। গত বছরে কেরিয়ারের শুরু থেকে নিয়ে এবছরেও যেভাবে ব্যাট হাতে মাঠ সরগরম করছেন শচীন তাতে গত বছরের মত এবছরেও তিনি সংবাদ শিরোনামে নিজেকে রাখতে পারলে ভারতীয় ক্রিকেটে সানি গাভাসকার-এর অভাববোধ খানিকটা প্রশমিত হল বলে স্বস্তি অনুভব করতে পারেন

- সমীর ধর

মুসলিম দলগুলির মিছিল

মুসলমানদের হালহকিকৎ

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থা কি–সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে তারই তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ

স্বাধীনতা উত্তরকালের পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের হাল ক্রমাগতই অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও রাজা বদল করতে নির্ভরতা বাড়ানো হচ্ছে মুসলমানদের ভোটের উপর। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের প্রতি চরম সরকারি উদাসীনতা শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি রাজনীতি এমন কি সরকারি ও আধা সরকারি চাকরি প্রতি ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে আজ মুসলমানদের এই হাল কেন্দ্রের পালাবদলে সরকার যেমন এই সম্প্রদায়ের কোন সঠিক মূল্যায়ন করেন নি, তেমনি বর্তমানের রাজ্যে অধিষ্ঠিত বামে সরকার একই কৌশলে তাদের বঞ্চিত করছে ন্যায্য পাওনা থেকে।

সরকারি আধা সরকারি চাকরিতে এখনও পর্যন্ত মুসলমানরা শতকরা দু'ভাগের বেশি নয়। অথচ সেই মুসলমানরা সারা পশ্চিমবাংলার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ আই এ এস, আই পি এস, ডব্লু বি সি এস, ডাক্তারি, ইঁজিনিয়ারিং এবং উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের উপস্থিতি এত নগন্য যা হাস্যাস্পদ। যদিও সংবিধানে সংখ্যালঘুদের উন্নতি সাধনের জন্য সমস্ত রকম দায়িত্ব কর্তব্য, সুযোগ সুবিধার দিক থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শাসক গোষ্ঠীকে নজর রাখার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা আকাশ-কুসুম কল্পনার সামিল। জর্জরিত, পিছিয়ে পড়া এই সম্প্রদায়ের জন্য বহুবার বহুভাবে আয়োজিত হয়েছে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, জনসভা, গড়ে তোলা হয়েছে আন্দোলনমুখী মুসলিম যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কমিটি। দেওয়া হয়েছে ডেপুটেশন, সংগঠিত করা হয়েছে মিছিল মিটিং। কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। বরং আরও জটিল, ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে প্রতিনিয়ত তাই এই রাজ্যে নানা অপরাধে বন্দী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্ববর্তী ঝুপড়ী এলাকার চোলাই মদের ঠেকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এই মুসলমান সম্প্রদায়ের ৮০ ভাগ মানুষ। সাট্টা, জুয়া, ওয়াগন ব্রেকার, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই রাহাজানি, মেয়ে পাচারকারি সব অপরাধেই এদের নজিরবিহীন রেকর্ড আসলে এই অবক্ষয়ের পিছনে কি কারণ তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন কেউ বোধ করেন নি। শুধুমাত্র গদির মোহে স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী রাজনীতিজ্ঞরা পরিস্থিতি মত এই অবাঞ্ছিতদের মাঝে মধ্যেই কাজে লাগিয়ে থাকেন তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের প্রয়োজন

হাসানুজ্জামান

মেট্রোতে। কিন্তু ব্ল্যাক লিস্টের এইসব মার্কামারা অপরাধীদের ওপর প্রশাসন সুযোগ পেলেই দাঁত বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। কখনও সখনও রফা হয় মোটা অংকের নজরানায়। আবার এই অবৈধ মদ, সাট্টা এবং ওয়াগান ব্রেকারদের মত অপরাধীদের সঙ্গেও একটা মাসিক বা সাপ্তাহিক চুক্তি করে নেয় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা। সরকার মহোদয়ের এইসব তথ্য অবগতির মধ্যেই। কিন্তু দোসর যদি চটে যায় সেই কারণেই প্রত্যক্ষভাবে এই অপরাধের মোকাবিলা করার সাহস দেখান না। তাই দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে অপরাধের প্রবণতা

সাতচল্লিশের দেশভাগের এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতির উদ্দেশ্যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিখ্যাত 'ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনি' বক্তৃতা অনেকের স্মরণে থাকতে পারে। তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের সংখ্যালঘুদের জাতীয় নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে চলতে। সংখ্যালঘু বলতে মূলত তিনি ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। দেশের মাটির প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও কিছুটা ভাগ্যের উপর ভরসা রেখে মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ রয়ে গেলেন এপারে। নানা ঘাত প্রতিঘাত প্রতিকূল অনুকূল এবং আশা নিরাশার মাঝে দুলতে দুলতে স্বাধীন ভারতের মাটিকে বেছে নিয়েছিলেন বেঁচে থাকার পবিত্র স্থান হিসাবে। তারপর এক এক করে চার দশকেরও বেশি অতিক্রান্ত হল। গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে কত জল বয়ে গেল। কিন্তু আজ হিসেবের খাতাটা ওলটাতে গিয়ে স্বাধীন ভারতের একজন মুসলিম যুবক যদি দেখেন প্রাপ্তির খাতে শূন্যতা ছাড়া কিছুই নেই, তবে রবিঠাকুরের ভাষায় তিনি কি বলে উঠবেন 'কি পাইনি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি'? অথবা সোনার তরীর সেই লাইন দুটি 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী/আমার সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'? স্মরণ করা যেতে পারে ধর্মনিরপেক্ষ বিশাল ভারতবর্ষের সোনার তরীতে চাকরি, শিক্ষা, আবাসন, ব্যবসার অবাঞ্ছিত সংখ্যালঘুদের ঠাঁই নেই। সত্যকে স্বীকার করতে যদি কোনরকম কুণ্ঠা না জাগে তাহলে অকপটে স্বীকার করতে হয় দেশভাগের ভয়ংকরতম শিকার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ। আর দেশভাগের ৪৬ বছর পর আজকের দিনের পশ্চিম-বঙ্গের মুসলমানদের সেই ভয়ংকর ক্ষতির বোঝা বয়ে চলতে হচ্ছে।

এখানে একটা কথা স্বীকার করে রাখা ভাল দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য হন। সাধারণ মুসলিম সমাজ যাঁরা দেশান্তরকে শ্রেয় মনে করেননি, তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন ভীত, সন্ত্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত। এই সময় থেকে পশ্চিমবাংলার সরকারি চাকরিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নগণ্য হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই। যদিও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, তবুও মুসলমান মাত্রই নাকি 'দেশদ্রোহী' এই কথা মনে করতেন অনেকে। সরকারি গোপন সার্কুলার জারি করা হয়েছিল কোন মুসলমানকে পুলিশ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিযুক্ত না করার জন্য। সাধারণ সরকারি চাকরিতেও মুসলমানদের প্রবেশ অলিখিতভাবে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল সেই সময়। অগত্যা নিজভূমে পরবাসী পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত মুসলমান সন্তানরা গ্রামে গঞ্জে স্কুল-মাস্টারির দিকে ঝুঁকেছিলেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এক, একাত্তরে পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী উদ্বাস্তু এদেশে আসতে থাকে। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট চাপের সৃষ্টি হয়। তখন এপারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদও দখল করতে শুরু করে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জায়গাটা আরও সংকুচিত হয়ে যায় সংখ্যালঘুদের জন্য। দ্বিতীয়টি হল এপারের বাঙালি মুসলমানদের মানসিকতায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন শুরু হয়। '৭১-এ বাংলাদেশ হয়ে যাবার পর তাঁরা নতুনভাবে বুঝতে শুরু করেন ওপারের দিকে তাকিয়ে থেকে বোধহয় লাভ হবে না। তখন তাঁরা নাগরিক অধিকার নিয়ে এখানেই বেঁচে থাকার কথা ভাবতে থাকেন। পশ্চিমবাংলার বাঙালি মুসলমানরা তখন থেকে আরও নিবিড়ভাবে দেশের মাটিতে তাঁদের আত্মবিকাশের পথ খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। সেদিক থেকে একাত্তর সালকে বিভাগোত্তর মুসলিম সমাজের পক্ষে 'টার্নিং পয়েন্ট' বলা যেতে পারে।

এই সময় অর্থাৎ একাত্তরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলিম সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। পশ্চিমবাংলায় রাজনীতির টালমাটাল অবস্থায় মুসলমানরা খানিকটা ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'ব্যালান্স অফ পাওয়ার' রাজনীতির প্রমাণ রাখেন এবং মুসলিম লীগের সভাজন এম এল এ পরিবর্তিত হয়ে (১৯৭১) কংগ্রেসের সঙ্গে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্বল্পস্থায়ী এই মন্ত্রিসভার লীগমন্ত্রীরা মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চাকরির জন্য দাবী রাখেন এবং এজন্য ক্যাবিনেটেও প্রস্তাব পাশ হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্যাবিনেট প্রস্তাবের ৭ নং ধারাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে

'শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী (এ কে এম হাসানুজ্জামান) সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদশ্রেণীর জন্য অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি তোলেন। আলোচনার শেষে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হয় যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি উপজাতি, মুসলমান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, খৃস্টান, বৌদ্ধ, নেপালী প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের কি পরিমাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা ঠিক করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস ও প্রাক্তন মুখ্যসচিব শ্রী কে এস তালুকদারের নেতৃত্বে এক সদস্যের কমিটি গঠন করা হবে। তিন মাসের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। সরকারি দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে উপরোক্ত গোষ্ঠীসমূহ সরকারি চাকুরিতে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পায়।'

কংগ্রেস আমলে চাকরির ব্যাপারে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মন্ত্রিসভা কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন সরকারের সিদ্ধান্তকে যদিও কার্যকর করেন নি, তবুও এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন যে মুসলমান সমর্থন আদায়ের জন্য কিছু চাকরি তাদের দেওয়া প্রয়োজন। স্বীকার করতে হবে এই সময় এই প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলিম যুবক বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি পায়। যদিও আনুপাতিক বিচারে তা ছিল খুবই নগণ্য। আর উচ্চপদস্থ সরকারি মহলে অবস্থা তথৈবচ। ১৯৬৭-৭৫ সালের সিভিল লিস্ট থেকে কয়েকটি উচ্চ সরকারি পদের তুলনামূলক তালিকার চোখ রাখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে (সারণী ২ দ্রষ্টব্য)।

শুধুমাত্র উদাহরণ হিসেবে এই সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল। বস্তুত সরকারি চাকরির প্রায় সব বিভাগেই একই অবস্থা। উপরোক্ত তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে সিদ্ধার্থশংকরের আমলে নিম্ন পর্যায়ে কিছু মুসলমান যুবক চাকরি পেলেও উচ্চ সরকারি পদে সংখ্যালঘু অবস্থানের বিশেষ কোন হেরফের হয় নি। তাই বহু প্রত্যাশা নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর রদবদল-এর কথা চিন্তা করলেন। সংখ্যালঘু বেকারীর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুস্থ চিন্তা ভাবনার প্রতি মর্যাদা দেওয়ার অধিকার নিয়ে তৎকালীন বিরোধী গোষ্ঠী সোচ্চার হয়। ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল আন্দোলনে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। উপেক্ষিত সংখ্যালঘুরা বিশেষ করে মুসলমান সমাজ নতুন আলোর দিশারী হিসাবে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যকে মনেপ্রাণে স্বাগত জানাল। অবশ্যই শতকরা ১০০ ভাগ মুসলমান নয়, বিকল্প শক্তি বাম ঐক্যের জয় জয়কারও হল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হল বামফ্রন্ট। এখানে বোধহয় পরিষ্কার করে বলতে হবে না যে এই জয়ের পিছনে মুসলমানদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। বিধানসভায় ১৯৭৮ সালের ৬ এপ্রিলের প্রশ্ন-উত্তর সভায় এ কে এম হাসানুজ্জামানের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু স্বীকার করলেন 'নানা ঐতিহাসিক কারণে মুসলমান ভাই বোনেরা পিছিয়ে পড়ছে।'

সারণী : ১

সরকারি পদ	১৯৭৭ (৩১·৮·৭৭ হিসেবে) মোট পদ	মুসলিম	১৯৮৮ (১·১·৮৮ হিসেবে) মোট পদ	মুসলিম
আই এ এস (পঃবঃ ক্যাডার)	২৬৪	২	২৯১	২ (বর্তমানে ১)
আই পি এস	২০৪	৫	২০৬	৯
ডবলিউ বি সি এস (প্রশাসনিক)	১৫৭৫	৩৮	১৫৮৩	৮০
পঃবঃ হায়ার জুডিসিয়াল	৮০	২	১৮৬	৬

সারণী : ২

সরকারি চাকরির পদ	১৯৬৭ মোট পদ	মুসলিম	১৯৭৫ মোট পদ	মুসলিম
আই এ এস (পঃবঃ ক্যাডার)	১৭৮	১	২৫২	২
আই সি এস (পঃবঃ ক্যাডার)	১০২	০	১১০	৪
পঃবঃ হায়ার জুডিসিয়াল সার্ভিস	৪৯	০	৯৬	১
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি ক্যালেক্টর	৪৯১	০	৬০০	৯
সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর	৪৩৬	৯	৬৫৫	১৯
পঃবঃ উচ্চ আবগারি পদ	৫	০	৬	০
পঃবঃ নিম্ন আবগারি পদ	৯৮	০	১২৯	৭

সূত্র পশ্চিমবঙ্গ সিভিল লিস্ট

সারণী : ৩

সরকারি পদ	১৯৮৭-৮৮ সাল মোট নিয়োগ	মুসলিম	১৯৮৮-৮৯ সাল মোট নিয়োগ	মুসলিম
পঃবঃ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর	৫৫	০	১২২	০
পঃবঃ পুলিশের কনস্টেবল	১৬৮৯	৭৬	১৩৯২	১৪৩
কলকাতা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর	৩৬	৪	৪৭০	৪
কনস্টেবল	৭৬৪	৩৯	৭৫৪	৮৫

সেই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মুসলিম ভাই বোনেদের এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তার আসল চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যাবে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে ১৯৭৭ থেকে '৮৮ পর্যন্ত দুটি তালিকা থেকে বামফ্রন্ট রাজত্বে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলিতে মুসলিম সমাজকে এগিয়ে আনার সরকারি প্রয়াসের কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক (সারণী ১ দ্রষ্টব্য)

এছাড়াও ১৯৮৩-র ৩১ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ছিল এই রকম. স্টেট রেজি সার্ভিস মোট ২০১, মুসলিম ২ (১%), স্টেট ভেটারিনারি সার্ভিস মোট ৮২৯, মুসলিম ২৭ (৩·২৩%); জুডিসিয়াল সার্ভিস মোট ৩০৫৫, মুসলিম ৪১ (১·৩৪%); স্টেট এ্যাকাউন্ট এ্যাণ্ড অডিট সার্ভিস মোট ৩০৩, মুসলিম ২ (০·৬৬%), স্টেট এ্যাকাউন্ট এ্যাণ্ড অডিট সার্ভিস মোট ৩০৩, মুসলিম ২ (০·৬৬%), ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলায় পুলিশ বিভাগে কর্মচারী ছিল ৬৩,১০৩ জন, এর মধ্যে মুসলিম ৪২৩০ এক প্রশ্নের উত্তরে ২১·৪ ৭৮ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছিলেন পুলিশ বিভাগে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। এরপর ১৯৮৮ সালে বিধানসভার প্রশ্নোত্তর থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে সেটি এইরকম.- মোট সাব রেজিস্টার ১২১, মুসলিম ৪০; জেল ওয়ার্ডের ২৫৮৩, মুসলিম ১০৮; বনবিভাগের অফিসার ও কর্মচারী ৯২৭০, মুসলিম ৩১৬; পরিবেশ দপ্তরে সরকারি অফিসার ৮, কর্মচারী ৬৬, মুসলমান একজনও নেই। বেসরকারি অফিসার ২৭, কর্মচারী ৩৬০, তার মধ্যে মুসলিম ২৩ জন। মুন্সেফ ২৫২, মুসলিম ২১। এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ ১২০, মুসলিম ১ জন। কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা অফিসার ১৩৫, মুসলিম নেই; কর্মচারি ১৩,৮৬৩, মুসলিম ৫০২, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থায় অফিসার আছেন ১৬ জন, মুসলিম নেই, কর্মচারী ৪,৬৫৯, মুসলিম ২৬৬, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার অফিসার ১৬ জন, মুসলিম নেই; কর্মচারী ১,২৯২, মুসলিম ৫৮

এরপর ১৯৮৯ সালের বাজেট অধিবেশনের প্রশ্নোত্তরে পাওয়া গত বারো বছরের মুসলিম নিয়োগের কিছু তথ্য তুলে ধরা হল

জুলাই '৭৭ থেকে জানুয়ারি '৮৯

বিভাগ	পর্যন্ত মোট নিয়োগ	মুসলমান
পর্যটন দপ্তর	১৭৩	৪
মৎস্য দপ্তর	৯৩২	২৮
খাদ্য বিভাগ অফিসার	১০৭	৬
কর্মচারী	৪৩৩৪	২০৫
পরিবহন বিভাগ	৪৩৩	৩৩
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ	১০৮১ .	২৬

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশ বিভাগের মুসলিম নিয়োগ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্য বিধান সভায় পেশ করেন (সারণী ৩ দ্রষ্টব্য)।

তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যোগ্যতার কারণে সরকারি পর্যায়ে চাকরি পাচ্ছেনা। কিন্তু সাধারণ পিওন, কনস্টেবল বা তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হতে কি যোগ্যতা লাগে? এইসব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের অবস্থান কোথায় তা নিচের তালিকা দেখে এক নজরে বুঝতে অসুবিধে হবে না।

সাল	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিতে নিয়োগ	মুসলিম	অন্যান্য সংখ্যালঘু
১৯৮৫	৮৯৮৭	২১৪	৭৬
১৯৮৮	১০,২৮৪	৪০৯	৮২

(বিধানসভায় মুসলিম লীগের একমাত্র প্রতিনিধির লিখিত প্রশ্ন নং ১৩০ অনুমোদিত প্রশ্ন নং ১৯১৩ তাং ১৭ ৪ ৮৯ এর পরিসংখ্যান মত) উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চাকরিতে ছিটেফোঁটা যা মুসলিম নিয়োগ করা হয়েছে তা সবই তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদে। উর্দ্ধতন অফিসার পদে কাউকে নিয়োগ করা হয় নি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম সমাজে সত্তরের দশকের গোড়া থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ ও চেতনা বাড়লেও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা খুবই সীমিত। প্রথমত, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে বিদ্যালয়ের অভাব। স্কুলের গন্ডী ডিঙিয়ে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যারা উচ্চশিক্ষার জন্যে আসেন সেখানে ভর্তির নানারকম প্রতিবন্ধকতা, আবার ভর্তি হলেও মফঃস্বলে ছাত্রদের হোস্টেলে সমস্যা, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিদারুণভাবে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ তো সাংঘাতিকভাবে কম এবং কষ্টসাধ্য গত সাত বছরে আই টি আই-তে ৭৪৩৫ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে। তার মধ্যে মুসলিম ছাত্র ১৫০ জন অর্থাৎ ২·০৭%। ১৯৭৭ থেকে '৮১-র মধ্যে ২২৬৫ জন ছাত্র মেডিক্যালে ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে ৪২ জন অর্থাৎ ১·৮৫% মুসলিম। ১০,৪০০ জন ছাত্রী নার্সিং-এ সুযোগ পেয়েছে কিন্তু মুসলিম ছাত্রী সুযোগ পেয়েছে মাত্র ৬৪ জন। ১৯৭৭-৮৩ কৃষিবিদ্যায় ১৫১ জন ছাত্রছাত্রী স্কলারশিপ পেয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ২ জন মুসলিম আর একটি তথ্য থেকে পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪৩ জন অধ্যাপকের মধ্যে মাত্র ১৭ জন মুসলমান। এই অনগ্রসরতা দূর করতে অনেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস, উপযুক্ত মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এবং আসন সংরক্ষণের কথা বলে থাকেন। নিজেদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এ

সন্তোষ রাণা (সি পি আই এম এল)
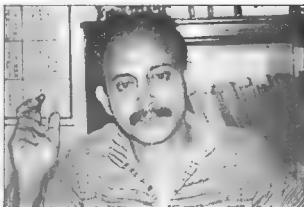
ব্যাপারে মুসলিম সমাজের গুরুদায়িত্ব তো আছেই, সরকারকেও কিন্তু এ ব্যাপারে মূল উদ্যোগী হতে হবে। কারণ বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় তদারকির সীমা আমাদের দেশে এমন পর্যায়ে রয়েছে সরকার বিরূপ বা অনাগ্রহী হলে কোন জনগোষ্ঠীর পক্ষে পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠা একরকম অসম্ভব শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম ছেলেদের উপস্থিতি সংকুচিত তবু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও বা ছেলেদের দেখা যায়, মুসলিম মেয়েদের প্রায় দেখাই যায় না বললে চলে। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি সুযোগের অভাব আবাসনের সমস্যা, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা

বিশিষ্ট নকশাল নেতা সন্তোষ রানার মতে, পৃথিবীর বহু দেশে এবং ভারতবর্ষেরও নানা প্রদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা রয়েছে এটা স্বীকৃত যে, কোন একটা প্রশাসন গণতান্ত্রিক কি না অথবা কতখানি গণতান্ত্রিক তার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সেই প্রশাসন সংখ্যালঘুদের প্রতি কি রকম আচরণ করে থাকে সেই বৈশিষ্ট্যটি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতরকম ফ্যাসিবাদী শক্তি দেখা গেছে তাদের প্রায় সকলেরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর দমন পীড়ন। জার্মানিতে হিটলার ইহুদী নিধনের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের সূচনা করেছিলেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের উপর দমন পীড়ন, জারতন্ত্রী রাশিয়া জাতিগত সংখ্যালঘুদের নির্মমভাবে দমন করত, আজকের রাশিয়াও সেই নীতি অনুসরণ করছে

এখনকার সর্ববৃহৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হচ্ছেন মুসলমানরা সরকারি লোকগণনা মতে এ রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা ২৬ জন হচ্ছেন মুসলমান, অনেক দায়িত্বশীল মহলেরই ধারণা সংখ্যালঘুদের প্রকৃত সংখ্যাটা অনেক বেশি লোকগণনার সময় প্রকৃত তথ্য চেপে যাওয়া হয়েছে। মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলাভাষী, বিশেষ করে যাঁদের বাস মূলত ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও প: দিনাজপুর জেলাতে। কলকাতার মুসলমানদের মধ্যে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী উভয়েই রয়েছেন। অন্য দিকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারি কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রাম ও শহরের দিকে তাকালেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মুসলমানরা হচ্ছেন পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশ। গ্রামাঞ্চলে তাঁদের অধিকাংশ হচ্ছেন ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষক। আবার শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের বেশির ভাগ রাজমিস্ত্রীর কাজ, হকারি, রিক্সাচালনা, কুলিগিরি করে জীবিকা অর্জন করেন। কলকাতার পাতাল রেলের মজুরে যে শ্রমিকরা অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করছেন তাঁরা অধিকাংশই হয় ঝাড়খন্ডী নয়তো মুসলমান। এর পাশাপাশি অশিক্ষিত একাংশ জুয়া, সাট্টা, চুরি, ডাকাতি এরকম নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে রয়েছে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গের এক চতুর্থাংশের বেশি হওয়া সত্ত্বেও অবস্থা এই রকম দাঁড়াল কেন এই প্রসঙ্গেও সন্তোষবাবু খুবই স্পষ্টবাদী। এখানে মুসলমানেরা বৈষম্যের শিকার। রাষ্ট্র ও প্রশাসনে উচ্চবর্ণ হিন্দুদেরই আধিপত্য। মুসলমানদের ক্রীতদাসত্বের অবস্থায় আবদ্ধ রাখার নীতি তারা সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করে। অর্থনৈতিক জীবনে এই বৈষম্য

বিচারপতি এস·এ·মাসুদ

বজায় রাখার স্বার্থেই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা হয়। বামফ্রন্টের শাসনেও সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানে হিন্দু আচার বিধি পালিত হয় বামফ্রন্টের মন্ত্রী, এম এল এ· রা নিজেরাই এখন দুর্গাপূজা, কালীপূজার উদ্বোধন করেন। কিন্তু ঈদের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী এই যুক্তিতে হাজির হন না যে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যাবে। সবিনয়ে বলতে চাই যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্যের এই অঙ্গরাজ্যের থানার মধ্যে এখনও অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা। গড়ে ওঠে শিবমন্দির। এ কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নমুনা?

সংবিধানের ১৬ (৪) ধারা অনুসারে কর্ণাটক ও কেরালা সরকার মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে কিছু সংরক্ষণ দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার সেটুকুও করতে রাজি নন। কংগ্রেস আমল থেকেই বহু মসজিদ, ঈদগা ও কবরস্থান বেদখল হয়ে আছে। সেই প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত আছে।

মুসলমান বিরোধী দাঙ্গা এখানে খুব বেশি হয়নি, কিন্তু সবদাই দাঙ্গার ভীতির মধ্যে তাঁদের বাস করতে হচ্ছে ইদানিং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গার পর বামফ্রন্ট রাজত্বে দাঙ্গা হয় না–এ দাবীও আর করা চলে না।

১৯৭৭ সাল। পশ্চিমবাংলার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন প্রধান শরিক সি পি এম–এর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। শাসন ক্ষমতার ঐতিহাসিক পরিবর্তন পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু মুসলমান, আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের মনে নতুন এক আশা প্রত্যাশা সৃষ্টি করে দারিদ্র, বঞ্চনা, নিপীড়নের ঘটনাগুলো কাজে লাগিয়ে তাঁরা মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। ফলে পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ কংগ্রেসকে ছেড়ে বামফ্রন্টের আর এস পি, সি পি আই এবং সি পি এম এর সমর্থক হয়ে ওঠেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনেই যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের পিছনে মুসলমানদের ব্যাপক সমর্থন এক বড় ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট তথা সি পি এম রাজ্যে যে অভূতপূর্ব ভোট–সাফল্য পায় তার পেছনে যে মুসলমান ও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজিদের অখণ্ড সমর্থনই ছিল মুখ্য–একথা বাম–অ–বাম সব পর্যবেক্ষকই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই আশার এক দশমা-অংশও ফলবতী হয়নি

১৯৮১ সালের সরকারি লোকগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা এক কোটি সতের লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুশো উনোষাট (১, ১৭, ৪৩, ২৫৯) শতকরা হিসাবে মোট জনসংখ্যার ২১·৫১ ভাগ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা এখন শতকরা ২৫ ভাগ বলে বর্ণনা করেন তবুও ১৯৮১র পরিসংখ্যান মত পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি হল

জেলা	মুসলিম	শতকরা হার
মুর্শিদাবাদ	২, ১৬৯, ১২১	৫৮·৬৬
মালদহ	৯৯৯, ৯৯৮	৪৫·২৭
পশ্চিম দিনাজপুর	৮০৭, ৭৯৭	৩৬·৫৮
নদীয়া	৭৯৩, ৭৭৬	২৪ ৫৭
চব্বিশ পরগণা	২, ৫৬৩, ৭৫১	২৩·৮৭
কোচবিহার	৩৬৮, ৯৭৬	২০·৭৮
হাওড়া	৫৯৮, ৪৪৮	২০ ১৭
বর্ধমান	৮৫০, ৯৮১	১৭·৫৯
কলকাতা	৫০৬, ৯৪২	১৫·৩৩

এছাড়াও মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে বীরভূম জেলাতে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষের মত হবে এই ব্যাপক সংখ্যক অনগ্রসর মুসলমানরা বামফ্রন্টের ধর্মনিরপেক্ষ রাজত্বে আশাবাদী ছিল অন্তত চাকুরি ও রুজিরোজগারের ক্ষেত্রগুলিতে মুসলিমদের আনুপাতিক হার বাড়বে এবং বঞ্চনার কালো দিনগুলির অবসান ঘটবে এই ভেবে কিন্তু পরিসংখ্যানে যে নগ্ন বাস্তব ফুটে উঠছে তা খুবই হতাশজনক। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় 'মুসলিম আন–এমপ্লয়মেন্ট' নিয়ে কিছু ইস্যু তুলেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন যেখানে মোট জনসংখ্যার ২১% মুসলমান সেখানে কেন মাত্র ২% চাকরি পাবে?

পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৫টি। ১) মুসলমান ২) খৃষ্টান ৩) শিখ ৪) বৌদ্ধ ৫, পার্শি এবং এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিধানসভার প্রতিনিধি এ কে এম হাসানুজ্জামান জানালেন, একদিকে শাহী ঈমাম সাম্প্রদায়িক মোকাবিলায় রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিবাহিনী চেয়েছেন অন্যদিকে রাজ্য সরকার চাপ দিচ্ছেন মুসলমানদের সব রকমের দাবী দাওয়া মেনে নিতে। কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের মোট মুসলমানদের সংখ্যা ১২ থেকে ২০ কোটি বলে দাবী করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবাংলায় প্রায় দেড় কোটি। সংবিধানের ১৫ (৪), ১৬ (৪), ১৬ (৫), ২৯ এবং ৩০ ধারায় মুসলিমদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না গত বছর দশ জন এম এল এ–কে নিয়ে মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীকে। তাতে উনি বলেছিলেন, 'হিন্দু মুসলমান আলাদা করে দেখা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, চাকরি পাচ্ছে না বলে মুসলমানদের ব্যাকওয়ার্ড ঘোষণা করা উচিত হবে না '

৬ দফা দাবীর মধ্যে অন্যতম শিক্ষা ও চাকুরি ছিল, সংবিধানের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আনেন জামাল সাহেব বি জে পি বলে সংখ্যালঘুদের বিশেষভাবে দেখতে তাঁরা নারাজ জ্যোতি বসুও মার্কসবাদী চিন্তাধারায় বোধহয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। অন্যদিকে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না। পরিসংখ্যানে দেখা যাবে নানা চাকরিতে এমন কি আই এ এস, আই পি এস, ডব্লু বি সি এস ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে মুসলিমরা সিডিউল কাস্টদের থেকে নিচে পড়ে আছে। সংখ্যালঘুদের-উন্নতির জন্য পনের পয়েন্ট প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল তা আজও বাস্তবায়িত হয় নি হয়নি স্পেশাল ট্রেনিং বা কোচিং এর পরিকল্পনা। এইভাবেই যদি ভারত তথা রাজ্য জুড়ে অব্যবস্থা চলতে থাকে তাহলে পরিণতি আরও ভয়াবহ হবে সন্দেহ নেই। বর্তমানে মুসলমানরা ঠিকঠাক বেঁচে থাকার নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। পশ্চিমবাংলায়ও এই ঢেউ লেগেছে এরজন্যে হাসানুজ্জামান সাহেব হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে সরকারকেও দায়ী করলেন।

সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের গুরুত্ব সংবিধানের সঠিক প্রয়োগের স্বার্থেই প্রয়োজন। তাই সংখ্যালঘু কমিশনের দাবী কোন সাম্প্রদায়িক দাবী নয়।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস এ মাসুদ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার জন্য যেমন মুসলিম ভাইবোনেদের দায়ী বলে মনে করেন একইভাবে সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং পরিকল্পনাহীন পদক্ষেপও এই অবক্ষয়ের আর একটি কারণ। পাহাড়সমান সমস্যা কিন্তু সমাধানের বিজ্ঞানভিত্তিক কোন পরিকল্পনা নেই শুধু ভোটের রাজনীতি। সারা দেশ জুড়ে চলছে এক ভয়াবহ অবস্থা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না অনগ্রসর এই সমাজ। শিক্ষা, চাকুরি, সংস্কৃতি, সভ্যতা সব দিক থেকে এ জাতির শেষ কোথায় কে জানে।

আবদুল কাইউম

ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী, তপন কুমার সেন, তৃপ্তিময় চৌধুরী

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না

আশ্চর্য, প্রায় অসম্ভব ৬টি বাস্তব কাহিনীর সরজমিন প্রতিবেদন।

দ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না, এমন অবিশ্বাস্য অভাবনীয়, বিরল ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত কাণ্ড কারখানার কথা পত্র পত্রিকায় খবর হয় অথবা গিনেস বুক অব রেকর্ডে স্থান পায়। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তেই এই ধরনের কাণ্ড কারখানা হচ্ছে, এর মধ্যে ক'টি প্রকাশিত হয়? অধিকাংশই প্রচার বা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। শুধু মানুষই নয়, সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি কীট পতঙ্গ যে সব কাণ্ড কারখানা করে বসে তা গিনেস বুক অব রেকর্ডে স্থান পাবার যোগ্য প্রকৃতিও এ ধরনের কাজ করে বসে নিজের খেয়ালে কিন্তু এইসব অভাবনীয় কাণ্ড কারখানার সব কিছুই গিনেসে স্থান পেলে প্রতিদিনই মহাভারতের সাইজের একটি করে রেকর্ড বুক তৈরি করা যেত কিন্তু তা স[illegible] নয়। যাই হোক, আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রেকর্ড বুকের চরিত্র নিয়ে নয়। বর্তমান প্রতিবেদনে আমরা কয়েকটি বিচিত্র ঘটনা বা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা অনায়াসেই রেকর্ড বুকে স্থান পেতে পারে। আর এই সব ঘটনা যদি পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতেরই কোন রাজ্যে ঘটে থাকে তবে তা যে বাড়তি কৌতূহল সৃষ্টি করবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসুন, আমরা মুখবন্ধ ছেড়ে মূল বিষয়ের দিকে যাই।

খাদ্য যখন খাদক হয়

একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি খুব বড় সাইজের ব্যাঙ প্রমাণ সাইজের একটি সাপকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছে। কথায় আছে কুকুর মানুষকে কামড়ালে খবর হয় না, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে খবর হয়। তাই সাপের স্বাভাবিক খাবার ব্যাঙকে সাপ খেলে খবর হয় না কিন্তু ব্যাঙ যদি সাপ খায় আর সে সাপ যদি রীতিমত হিংস্র হয় তবে তা খবরের শিরোনামে উঠতে বাধ্য। খাদ্য খাদককে খাচ্ছে, বুঝুন ব্যাপারটা। এ ব্যাপারে কি কোন দ্বিধা আছে যে ব্যাঙটির কথা কোন রেকর্ড বইতে স্থান পাবে না। এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়েছে কৃষ্ণ প্রেমে ডুবুডুবু নদীয়ার এক ব্যাঙ নদীয়া শহরের কিছুটা দূরে এক ভদ্রলোকের ঝোপেঝাড়ে ঢাকা এক বাগানে সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে সংবাদে প্রকাশ, একটি প্রমাণ সাইজের বিষধর কাল কেউটে নিয়মিত ব্যাঙটির ছেলেপুলে, আত্মীয়স্বজনকে নির্বিবাদে হজম করে দিচ্ছিল। লিডার ব্যাঙটি তার আপনজনদের এক উটকো সাপের ভোজ্যবস্তু হতে দেখে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুঁসতে লাগল। তার কর্কশ, তীব্র ডাকই অঞ্চলের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ব্যাঙটি অসম্ভব চোটে আছে ব্যাঙটি শুধু সুযোগের অপেক্ষা করে রইল। অবশেষে একদিন সে সুযোগও এল। সাপটি গুটি গুটি একটি ছোট্ট ব্যাঙের দিকে এগিয়ে চলছে যখন তখনই কালান্তক যমের মত লিডার ব্যাঙ লাফ মেরে দাঁড়াল তার সামনে সাপটি পরিস্থিতি বুঝতে তার মুখ তুলতেই ব্যাঙ বিশাল মুখ ব্যাদন করে চকিতে সাপের মাথা পুরে নিল তার মুখের মধ্যে. স্থানীয় একটি লোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ওই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক এক করে তার পাশে জড়ো হতে লাগল আরও অনেক লোক। এদিকে সাপ শুরু করেছে মরণ বাঁচন লড়াই। ব্যাঙও মরিয়া, তার কাছে ব্যাপারটা ইজ্জতের সাপ ব্যাঙের মুখ থেকে মুক্তি পেতে সারা শরীর শুদ্ধ ব্যাঙকে নিয়ে যত ঝাপটাতে থাকে ব্যাঙের কামড়ও তত কঠোর হতে থাকে। এক সময়ে সাপের দম বন্ধ হয়ে যায় আস্তে আস্তে সে নিস্তেজ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে শত্রু নিধন হয়েছে বুঝে মুখ থেকে সাপটিকে বার করেই বিজয় উল্লাসে ব্যাঙটি গলা ফাটিয়ে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ ডাক শুরু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার পাশে জড়ো হয় অসংখ্য ব্যাঙ হয় ঐকতান এরপর শুরু হয় ঝিরঝিরে বৃষ্টি দর্শকেরা ব্যাঙ বাবাজীকে সেলাম জানিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যায়। এক সুযোগ-সন্ধানী চিত্র গ্রাহক কিন্তু ওই রোমহর্ষক দৃশ্যটি তাঁর ক্যামেরায় বন্দী করতে ভোলেন নি

গরীবের জন্য

ছবির চশমাটিতে কোন অভিনবত্ব নেই বলেই মনে হচ্ছে কিন্তু চশমার ফ্রেমটি কিসের তৈরি বলুন তো? স্টিল, ফাইবার গ্লাস, প্লাস্টিক বা অন্য কোন ধাতু বা সিন্থেটিক জিনিসের? যে কোন জিনিসের নামই বলুন না কেন, উত্তর মিলবে না। কারণ যে জিনিস দিয়ে চশমার ফ্রেমটি তৈরি হয়েছে, তা আপনাদের কল্পনার ধারে কাছেও আসবে না। কারণ এটি স্রেফ বেত দিয়ে তৈরি করা। উত্তর শুনে ভ্রূ কুঞ্চনের প্রয়োজন নেই বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করারও কিছু নেই। কারণ গুণগত মানের দিক দিয়ে যে কোন ফ্রেমের চাইতে বেতের ফ্রেমের চশমা কোন অংশেই ছোট নয়। বছর খানেক আগেই কেন্দ্রিয় সরকারের টেকনোলজি মিশনের প্রধান শ্যামপিত্রোদা এই বেতের চশমার ফ্যাক্টরি করা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। কেন্দ্রে সরকার বদল হওয়ায় ব্যাপারটি ধামা
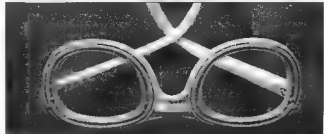
চাপা পড়ে। চশমার এই বেতের ফ্রেমের আবিষ্কর্তা হলেন ত্রিপুরার উদয়পুরের সরকারি হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিয়দেব রায়। ত্রিপুরায় বছরে অন্তত ১০ হাজার মানুষের চোখ নষ্ট হয় মূলত পুষ্টির অভাবে। এছাড়া সাধারণ একটি চশমা কিনতে ৮০–৯০ টাকা খরচ পড়ে। ফলে গরীব মানুষ চশমা পরতে পারে না। ব্যাপারটা ডাঃ দেব রায়ের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। সস্তায় কিভাবে গরীব মানুষকে চশমা দেওয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। হঠাৎই তাঁর বেতের কথা মনে হয়। ত্রিপুরায় অঢেল বেত, তাই শেষ পর্যন্ত ডাঃ দেব রায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা বেতেই সীমাবদ্ধ হয়। অনেক পরিশ্রম করে তিনি বেতের ফ্রেম তৈরি করে চশমা শিল্পে বিস্ময় সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। একটি বেতের চশমা ও [illegible] কিনতে খরচ পড়ে মাত্র ৪ টাকা।

বর্তমানে ত্রিপুরায় স্থানীয় ভাবে বেতের ফ্রেম তৈরি হচ্ছে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, সারা দেশে যাতে গরীব মানুষ বেতের তৈরি চশমার ফ্রেম ব্যবহার করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে ডাঃ দেব রায় টেকনোলজি মিশনের প্রধান শ্যাম পিত্রোদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। শ্যাম পিত্রোদা এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখিয়ে বোম্বাইতে একটি ফ্যাক্টরি করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পটি অর্পীতত ধামা চাপা পড়লেও ডাঃ দেব রায় এখনও হাল ছাড়েন নি। তিনি নিজেও বেতের ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করেন।

প্রকৃতির খেয়াল

হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাতা গুল্ম আচ্ছাদিত কোন তাল গাছ। কিন্তু বাস্তবে এটি প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ফ্লাওয়ার ভাস। কিন্তু ব্যাপারটি কি করে ঘটল তা জানতে সাধারণ মানুষের কৌতূহল হবেই। যেটি ফ্লাওয়ার ভাস হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে সেটি প্রায় ৪০ বছর আগে পরিত্যক্ত হুগলী–চুঁচুড়া পুরসভা অঞ্চলের প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু একটি চিমনি। এই চিমনিটিতে মাটি পড়ে এবং তাতে লতাগুল্ম ও বনফুলের নানান বীজ পড়ে একটি ফ্লাওয়ার ভাসের চেহারা নিয়েছে। দূর থেকে এটিকে ফ্লাওয়ার ভাস বা ফুলদানী ছাড়া কিছু ভাবা সম্ভব নয়। অতীতে গঙ্গার জল পরিস্রুত করার কাজে এই চিমনিটিকে লাগান হত। বর্তমানে গঙ্গা থেকে জল সরবরাহ করার কাজে লাগান হয়েছে বিদ্যুৎ চালিত মোটরকে। বাষ্পচালিত চিমনির তাই প্রয়োজন নেই। কিন্তু চিমনিটি বোধহয় অকেজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না। তার ভাবটা যেন এই রকম–চুপচাপ মৌনী বাবা হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে স্থানীয় মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য একটা কিছু করি। চিমনিটি তার শরীর দিয়ে তৈরি করে ফেলেছে পৃথিবীর উচ্চতম ফ্লাওয়ার ভাস। উচ্চতম বলা হচ্ছে এই কারণে এখনও পর্যন্ত গিনেস বুক অব রেকর্ডে ৩৫ ফুট তো দূরের কথা ১২–১৪ ফুট উঁচু কোন ফ্লাওয়ার ভাসের খবর পাওয়া যায় নি। তা সে প্রকৃতির খেয়ালেই হোক বা মানুষের হাতে তৈরি করাই হোক।

ব্যতিক্রম

এই মূর্তিটি বিশ্ব বরেণ্য বাঙালী বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর। কিন্তু কোন পদার্থ দিয়ে এটি তৈরি না বললে বোঝা সম্ভব নয়। যাই হোক, মূর্তিটি প্রায় ৬ ফুট উঁচু। তৈরি হয়েছে ফাইবার গ্লাস দিয়ে। ফাইবার গ্লাস দিয়ে নানান জিনিস তৈরি হয়। হয় মানুষের মূর্তিও। কিন্তু তার একটা মাত্রা থাকে। কারণ ফাইবার গ্লাস দিয়ে বড় কিছু তৈরি করতে গেলে তা ফেটে যাওয়া বা বিকৃত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু ফাইবার গ্লাস দিয়েই বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ৬ ফুট বা তার চেয়ে উঁচু মূর্তি নির্মাণে যে ব্যক্তিটি সফল হয়েছেন তিনি হলেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের তাপস সরকার। আপাতত পৃথিবীতে

এত বড় ফাইবার গ্লাসের মূর্তি নেই। তাপসবাবু ফাইবার গ্লাস দিয়ে নির্মাণ করেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ সি ভি রমন, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখের মূর্তি। তাপসবাবু আপাতত ফাইবার গ্লাস নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবাক করে দিতে পারেন। তাপসবাবুর কৃতিত্ব বিভিন্ন মহলে আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছে।

যন্ত্র যখন বশে

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙার মহম্মদ জামালুদ্দিন সম্প্রতি ২০০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে মহাকরণে এসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে। সাইকেলে ৪০০-৫০০ মাইল যাতায়াতের ব্যাপারটা ডাল ভাতের মত। কিন্তু জামালুদ্দিনের ব্যাপারটা অভিনব, কারণ তিনি

যে সাইকেলে এসেছিলেন তাতে বেল, সিট, ব্রেক, চেন নেই। চেন ছাড়া সাইকেলে অন্তত এক মাইল ভ্রমণের কথাও এ পর্যন্ত শোনা যায় নি। জামালুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এই সাইকেলে স্পীড উঠবে কি করে? ৩৫ বছরের জামালুদ্দিন জবাব দিয়েছিলেন, আপাতত ঘন্টায় ৫-৬ মাইল স্পিডে এই সাইকেলটি চালালেও ভবিষ্যতে তিনি ১০-১২ মাইল স্পিডে চালাবার আশা রাখেন যা একটি সাধারণ সাইকেলের স্বাভাবিক গতি। জামালুদ্দিন শুধু বিভিন্ন বিপজ্জনক রাস্তাই নয়, এমন কি ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে এই সাইকেল চালিয়ে এসেছিলেন। কিভাবে এই উদ্ভট সাইকেলে চাপার পরিকল্পনা মাথায় এল, এ প্রশ্ন করতেই জামালুদ্দিন জবাব দিলেন, 'একবার আজমীর শরিফে গিয়ে হঠাৎই সাইকেলের চেনটা ছিঁড়ে যায়। সারা রাত কোন উপায় ছিল না। বাধ্য হয়ে চেন ছাড়াই সাইকেল চালাবার একটা উদ্যোগ নিতে হয়। বেশ কয়েক ঘন্টা কসরৎ করার পর আল্লার কৃপায় উদ্দেশ্য সফল হয়।' এরপর তিনি বাড়ি ফিরে এসে চেন, ব্রেক ও সিট ছাড়াই সাইকেল চালানোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করে সফল হন। সাইকেলে নানান

কসরৎ দেখানোই জামালুদ্দিনের পেশা। দেশের বাড়িতে বিবি ও এক বাচ্চা মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। সাইকেলের খেলা দেখাতে গিয়ে তাঁকে বছরের মধ্যে ৬ মাসই বাইরে থাকতে হয়। ইতিমধ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে চম্বলে। বছর খানেক আগে তিনি সাইকেল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চম্বলের দুর্ধর্ষ ডাকাত অমর সিং-এর ডেরার কাছে এসে পড়েন। অমর সিং-এর সহযোগীরা তাঁকে পুলিশের চর মনে করে অমর সিং-এর ডেরায় ধরে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে হত্যা করা। সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ হয়েছে, প্রায় ৬০ জন ডাকাত সহযোগী নিয়ে অমর সিং বিশ্রাম করছে, এই সময় জামালুদ্দিনকে অমর সিং-এর ডেরায় হাজির করা হল। অমর সিং জামালুদ্দিনকে এই অঞ্চলে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। জামালুদ্দিনের সহজ সরল কথাবার্তায় অমর সিং খুশি হল এবং সে সত্যিই সাইকেলের খেলা দেখাতে বেরিয়েছে এ কথা বিশ্বাস করল। এরপর জামালুদ্দিন সাইকেলের নানা খেলা দেখিয়ে অমর সিং ও তাঁর সহযোগীদের মুগ্ধ করল। ওই অমর সিং সেই রাতটা জামালুদ্দিনকে তার ডেরায় থাকতে বলে পরের দিন ২০০ টাকা পুরস্কার দিয়ে দুজন সাগরেদকে নির্দেশ দিল তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে। যাবার সময় জামালুদ্দিনকে অমর সিং বলল, পথে কোন ডাকাত তাকে আটকালে সে যেন অমর সিং-এর লোক-এই পরিচয় দেয়। জামালুদ্দিন নিরাপদে তার বাড়ি ফিরে এলেন।

উদ্ভট কাজেই আনন্দ

মহঃ সেলিম। বয়স ৩১। ছোট্ট ব্যবসায়ী। নিবাস হায়দ্রাবাদ। উদ্ভট কাজকর্মেই সেলিমের আনন্দ। যাকে সেলিম হবি বলেন। আপাতত তিনি যে কর্মটি করছেন তা হল মুড়মুড় করে টিউব লাইট ও বাল্ব চিবিয়ে খাওয়া। গত এক বছরে মহঃ সেলিম অন্তত শ'দুই টিউব লাইট ও বাল্ব চিবিয়ে খেয়েছেন। এক চুমুক চায়ের সঙ্গে আমরা যেমন বিস্কুট বা পাঁপড় ভাজা খাই ঠিক সেভাবেই ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মুড়মুড় করে সেলিম চিবিয়ে খান একটি টিউব লাইট ও একটি বাল্ব। সেলিমকে দেখতে শান্ত গোবেচারা হলেও স্বভাবে বেশ বেপরোয়া। একবার তিনি ঘন্টায় ৪৮ কাপ চা খেয়েছিলেন আর একবার একদমে ৩ ঘন্টা কথা বলেছিলেন। ইংল্যান্ডের জর্জ হার্ট ও পুনের ধনঞ্জয় কুলকার্নীর কাঁচ খাওয়ার কথা শুনে সেলিম টিউব লাইট বাল্ব ইত্যাদি খাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম প্রথম কিছুটা অসুবিধা হলেও আপাতত কাঁচ খাবার ব্যাপারটা তাঁর রপ্ত হয়ে গিয়েছে তবে তিনি জানিয়েছেন, আর বেশিদিন কাঁচ খাবেন না। কারণ এ নিয়ে তার বিবির সঙ্গে ইদানিং প্রায়শই খিটিমিটি লাগছে। কাঁচ খাবার জন্য কেউ কি আর বিবিকে হারাতে চায়?

– রুস্তম নিয়োগী

Regd. No. AD-5:2 Lic. No. U/AD-1
ALOKPAAT February 1991
RNI No. RN 42171/86 Rs. 7.00 Per Copy